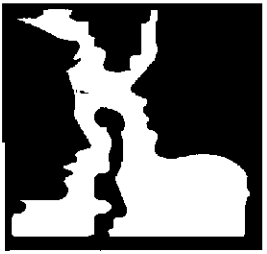

আলোর গন্ধ

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

'Even after all this time
The sun never says to the earth,
"You owe Me"

Look what happens with
A love like that,
It lights the Whole sky'

জোনাথনদাদু কফির কাপটা নামিয়ে বলল, 'জানিস মালি, কত রকম যে সম্পর্ক হয় পৃথিবীতে! মানুষকে যে কত রকমের সম্পর্ক পেরিয়ে আসতে হয় জীবনে! আমি দেখেছি, মানুষ ভালবেসে বিয়ে করে তারপর দু'জন দু'জনকে কষ্ট দেয়। আবার এ-ও দেখেছি, দু'জন দু'জনকে সারা জীবন ভালবাসলেও কাছে আসতে পারে না। স্পর্শ করতে পারে না। শুধু দূর থেকে ভালবেসে যায়। অনেকটা পৃথিবী আর সূর্যের মতো। দু'জন দু'জনকে ছাড়া থাকতে পারে না, কিন্তু দেখ, কাছেও আসতে পারে না। পৃথিবী ছাড়া এই সৌরমণ্ডলের কি সেই ম্যাজিক থাকবে? থাকবে না। আর উল্টোদিকে সূর্য না থাকলে তো পৃথিবীরও অস্তিত্ব থাকত না। একে অন্যকে কী অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে রাখে। কিন্তু দেখ, কাছে আসতে পারে না তারা, এক হতে

পারে না। তাই না?'

মালিনী উত্তর দিল না কোনও। আসলে উত্তর দেওয়ার কিছু নেই। জোনাথনদাদু উত্তর পাওয়ার জন্য সব কথা বলে না। এমনিই বলে। ছোটবেলা থেকেই দাদুকে দেখে এসেছে মালিনী। প্রায় কুড়ি বছর হয়ে গেল। চুলের রং সাদা হওয়া ছাড়া আর কিছু পাল্টায়নি লোকটির। সেই একই রকম ভঙ্গিতে কাঠের বারান্দায় বসে থাকা। সেই একইভাবে বারান্দায় হেলিয়ে রাখা ম্যান্ডোলিন। সেই একই সন্ধের মুখে হাতে ধরা কফির কাপ।

মালিনী এখন আর এখানে থাকে না। ছুটিতে ঘুরতে আসে মাঝে মাঝে। ওদের চা-বাগানের এক দিকটায় কাঠের বাড়িতে থাকে জোনাথনদাদু। সঙ্গী বলতে একটি ল্যাব্রাডর আর হুড খোলা জিপ।

জোনাথনদাদু সম্পর্কে কিচ্ছু জানে না ওরা। জোনাথনদাদু নিজে কক্ষনও কিছু বলে না, জিজ্ঞেস করলে শুধু হাসে। বলে, 'আমি ভুলে গিয়েছি সব কিছু। আমার আর কিচ্ছু মনে নেই। বোধহয় অ্যামনেশিয়া হয়েছে।' বলে, 'আর তোরাই বা জানতে চাস কেন? আমি মানুষটাই কি যথেষ্ট নয়?'

অফিস থেকে ছুটি পেলে শিলিগুড়ির বাড়িতে এক-দু'দিন থেকেই রাবাংলার এই চা-বাগানে চলে আসে মালিনী। কলকাতায় থাকতে থাকতে ওর আর শহর ভাল লাগে না। এত মানুষ, গাড়ি, লম্বা স্কেলের মতো বাড়িঘর, ছাই রঙের আকাশ, চিৎকার, হুল্লোড়—একদম ভাল লাগে না ওর। দমবন্ধ হয়ে আসে মালিনীর। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় আচমকা। মনে হয় কে যেন চেপে ধরছে ওর গলা। শ্বাস নিতে পারছে না। মালিনী ঘরের জানলা খুলে দেয়। এসি বন্ধ করে ফ্যান চালিয়ে দেয়। তবু শ্বাস নিতে পারে না যেন। ও পালাতে চায় তখন। সব কিছু ছেড়ে পালাতে চায়। কিন্তু তবু পারে না। রাতের কলকাতা তাড়া করে ওকে। ছাইমাখা চাঁদ তাড়া করে। ওকে তাড়া করে সেই মুখটা।

তবে মালিনী এবার আর কলকাতায় ফিরবে না। যাবে চন্ডীগড়। কলকাতা ওকে কষ্ট দিয়েছে খুব।

মালিনী পাহাড়ের দিকে তাকাল। আগস্টের তেরো তারিখ আজ। বর্ষা চলছে। সারাদিন বৃষ্টির পর এখন একটু শান্ত হয়েছে আকাশ। দূরে মেঘও ভেঙেছে কোথাও কোথাও। আর সেইসব ভাঙা জায়গা দিয়ে সূর্য তার আলোর চাদর মেলে দিয়েছে। চায়ের পাতলা লিকারের মতো আলোয় ডুবে আছে চারদিক। বারান্দার পাশের অর্কিডের পাতা চুঁইয়ে টপ্‌টপ্ শব্দে জল পড়ছে। ঝিঁঝিরাও ক্রমশ জেগে উঠছে একে একে।

এখানে এলে মালিনীর মনে হয় যেন তাড়া নেই কোনও। যেন যেতে হবে না কোথাও। মনে হয়, এখানে সারা জীবন বসে থাকা যায়। মনে হয়, জীবনে কিছু না হলে কী-ই বা এসে যায়।

মালিনী জানে, এ সবই ক্ষণিকের চিন্তা, অবাস্তব চিন্তা। শহর তার মুখ খুলে রেখেছে। শহর তার পেটের ভেতরের মণি-মাণিক্য আছে দেখিয়ে ডাকছে সকলকে। সেই বিশ্বজোড়া 'হাঁ'-এর ভেতর মাথা গলাতেই হবে মানুষকে।

অবশ্য, শুধু এটুকুই নয়। পাহাড়ও পাল্টাচ্ছে দ্রুত। এই যে নিস্তব্ধতা মালিনী দেখছে চারদিকে, তাও তো সারা জীবন থাকবে না। এই যেমন এখনই তো তার হাওয়া লেগেছে। গত দশ মাস আগে শেষবার যখন মালিনী এসেছিল, তখন দেখেছিল এখানে ফ্যাক্টরি তৈরি হচ্ছে।

সেই ফ্যাক্টরির প্রস্তুতি এবারে এসে সম্পূর্ণ হয়েছে দেখেছে মালিনী। ওই উঁচু জলের রিজার্ভার, রাক্ষসের মাথার মতো টিনের শেড, বৃদ্ধ নাবিকের চুরুটের মতো চিমনি—পাহাড়ের স্কাইলাইন বদলে ফেলেছে অনেকটা। চারদিকে কোলাহল বেড়েছে। ফ্যাক্টরির ভোঁ বাজছে। চিমনি দিয়ে বুড়ির চুলের মতো ধোঁয়াও বেরোচ্ছে।

'কী রে মালি, কী চিন্তা করছিস? তোর মনখারাপ?'

'কই না তো!' মালিনী হাসল।

'সত্যি বলছিস?' জোনাথনদাদু ঝুঁকে বসল চেয়ারে, 'তোকে ছোট থেকে দেখছি। আগে তো বকবক করে মাথা খারাপ করে দিতিস। আর এখন কেমন যেন অন্যমনস্ক থাকিস! কেন? বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?'

'ধ্যাৎ, আমি বুঝি খুব ঝগড়ুটে?'

'না রে, তোর চোখ দুটো কেমন হয়ে গেছে। তাই বলছিলাম।' জোনাথনদাদু ফাঁকা কাপটি বারান্দায় কাঠের রেলিংয়ের ওপর রাখল, 'নাকি, অন্য কেউ দুঃখ দিয়েছে তোকে? কী রে, কেউ দিয়েছে দুঃখ?'

'সত্যি, তুমি না...' মালিনী বেতের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। আচমকা বহু দূরের একটা মুখ ঝলসে উঠল চোখের সামনে। একটা পাথর বাঁধানো বৃষ্টির রাস্তা ঝলসে উঠল, ঝলসে উঠল ডান গালের লাল তিল। নিজের অজান্তেই মোবাইলের দিকে চোখ গেল ওর। অপদার্থ, ঠান্ডা একটা যন্ত্র। নিস্তব্ধ একটা যন্ত্র। মালিনী জানে আর কোনওদিন ফোন আসবে না।

মালিনী বলল, 'বুড়ো হলে সত্যিই ভীমরতি ধরে মানুষের। আর নিজের কথা কিছু বলবে না, শুধু অন্যের সব কথা শুনে নেওয়ার চেষ্টা, না? বাদ দাও, আর এক কাপ কফি হবে নাকি?'

'আর এক কাপ?' জোনাথনদাদু মাথার স্ট্র হ্যাটটা খুলে চুলে আঙুল ডোবাল, 'হয়ে যাক, যখন বলছিস। তবে চিনিটা কম দিস। তোর হাত এমনিতেই এত মিষ্টি যে, চিনির প্রায় দরকারই পড়ে না।'

'হুম, এই বয়সেও খুব কথা বলো তুমি! মেয়েদের মন ভেজাতে ওস্তাদ। যখন ইয়ং ছিলে, কত মেয়ের যে মাথা চিবিয়েছ!' মালিনী হাসল।

'আমি এখনও ইয়ং,' জোনাথনদাদু চোখ পাকাল, 'আয়্যাম সেভেনটি ফাইভ ইয়ারস ইয়ং। আর মাথা খাওয়া? তুই জানিস না আমি নিরামিষাশী!'

'খালি কথা! দাঁড়াও আমি কফি করে আনছি।' বারান্দার রেলিং থেকে কাপটা তুলে ঘরের ভেতরে চলে গেল মালিনী।

এ বাড়িটা একতলা। কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি। বারান্দা থেকে ঢুকলেই বসার ঘর। তার দেওয়ালে নানা দেশের মুখোশ ঝোলানো। সেই ঘর পেরিয়ে স্টাডি আর তার পাশেই কিচেন। সুন্দর ছিমছাম ভাবে সাজানো।

মালিনী দু'কাপ কফি তৈরি করে কিচেন থেকে বেরোতেই বারান্দায় কথা শুনতে পেল। আরে, এরই মধ্যে কারা এল? কুলিবস্তির কিছু মানুষজন জোনাথনদাদুর কাছে আসে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা করাতে। তারা এল কি? নাকি বাচ্চারা এল গল্প শুনতে? কিন্তু বাচ্চাদের গলা তো এমন নয়!

ডাইনিং টেবিলের ওপর কফির কাপ দুটো রেখে বারান্দায় বেরিয়ে এল মালিনী।

সন্ধে গাঢ় হয়ে এসেছে আরও। জোনাথনদাদু বারান্দায় ঝোলানো সব আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই আলোতেই মালিনী দেখল পাঁচজনের দলটাকে। তিনটে মেয়ে আর দুটো ছেলে। সবারই কাঁধে হ্যাভারস্যাক। কোমরে পাউচ, পরনে জিন্‌স আর উইন্ডচিটার। বয়স কুড়ি-একুশ।

সবার মুখে-চোখেই ক্লান্তির ছাপ। দীর্ঘ পথযাত্রার ছাপ। ওদের কাঁধের ব্যাগ কাঁধেই আছে। শ্বাস পড়ছে দ্রুত। অর্থাৎ সামান্য সময় আগেই ওরা এসেছে।

মালিনীকে দেখে রোগামতো যে-ছেলেটি জোনাথনদাদুর সামনে দাঁড়িয়েছিল, সে কিছু বলতে গিয়েও যেন থমকে গেল। ছেলেটির চোখে মুগ্ধতা দেখতে পেল মালিনী। এটি নতুন কিছু নয়। গড়পড়তা সব ছেলেরাই মালিনীকে দেখলে মুগ্ধ হয়।

মালিনী সেই দৃষ্টিকে পাত্তা না দিয়ে বলল, 'কী হয়েছে? তোমরা কারা?'

ছেলেটি হাসল। পাতলা দাড়ির ফাঁক দিয়ে দুটো লম্বা লম্বা টোল জেগে উঠল গালে। পিছনে থেকে একটি মেয়ে এগিয়ে এল এবার। মেয়েটিকে দেখে সামান্য অস্বস্তি হল মালিনীর। মেয়েটি ভীষণ সুন্দরী। আর কেন কে জানে, মালিনীর চেনা মনে হল মেয়েটিকে। মনে হল, কোথায় যেন দেখেছে। কিন্তু মনে করতে পারছে না কে মেয়েটি! এরাই বা কারা! কেন এই পাহাড়ে এসেছে এরা এমন সময়ে?

মেয়েটি হাঁপধরা গলায় কাতরভাবে বলল, 'প্লিজ, আপনাদের একটা হেল্পের খুব দরকার।'

'হেল্প?' মালিনী অবাক হল।

মেয়েটি কোমরের পাউচ থেকে একটা ছবি বের করে মেলে ধরল ওদের সামনে। তারপর বলল, 'একে আপনারা চেনেন?'

মালিনী ভাল করে দেখার আগেই জোনাথনদাদু ছবিটা ছোঁ মেরে নিয়ে

নিল। তারপর এক পলক দেখেই বলল, 'এই ছবি তোমরা কোথায় পেলে?'

'আপনি চেনেন?' মেয়েটির গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে, অবাক হল মালিনী। এই আলোতেও ও বুঝল মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেটা উত্তেজনায় না চোখের জলে, সেটা ঠিক বুঝল না।

মেয়েটি কাঁধের ব্যাগটা রেখে হাঁটু গেড়ে চেয়ারের হাতল ধরে বসল জোনাথনদাদুর সামনে, 'প্লিজ, বলুন না কোথায় থাকে এ? আপনি জানলে প্লিজ বলুন, আমার খুব দরকার।'

জোনাথনদাদু মেয়েটির ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর খুব আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'বলছি, তার আগে বলো তো, তুমি সূর্য, না পৃথিবী?'

১

'ওই দেখ, তোর ভেতর সূর্য ভাসছে।'

গুন্ডার কথায় চমকে উঠল দিঘি। বুকের ভেতর আচমকা চড়াই ঝাপটাল ছ'টা। দম বন্ধ হয়ে এল মুহূর্তের জন্য। কথাটা কি ইচ্ছে করে বলল গুন্ডা? সব জেনেশুনে এমনভাবে বলতে পারল ও? দিঘি কিছু না বলে মাথা নিচু করে নিল। চড়াইদের ডানার আঁচড়ে বুকের ভেতরটা জ্বালা করছে।

গুন্ডা আবার বলল, 'অবশ্য কলেজ স্কোয়ারের এই পুলটাকে কি দিঘি বলা যায়? কে জানে! কিন্তু দেখ, জলে সূর্যের রিফ্লেকশনটা কী দারুণ লাগছে!'

গুন্ডা বড্ড বেশি কথা বলে। একবার শুরু করলে থামতেই চায় না। অন্যের কেমন লাগছে, না লাগছে তা কেয়ারই করে না একদম।

'আঃ গুন্ডা, তুই চুপ করবি?' রূপ ধমক দিল, 'গত দেড় ঘণ্টা ধরে বকে যাচ্ছিস। আর বোর করিস না।'

'বোর?' গুন্ডা থমকাল। ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ঝুলপির পাশ থেকে ঘাম সরিয়ে বলল, 'কেন, বোর হচ্ছিস কেন? আর চুপ করব কেন? কেউ মরে গেছে নাকি?'

রূপ বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওফ্, তুই বড় হবি না? অবস্থার গুরুত্ব বুঝিস না? জানিস না আজ কোন দিন?'

'আজ? কেন? তুই জানিস না কোন দিন? থারটিথ্ আগস্ট। আর বড় বললি? আর কত বড় হব রে? প্রায় উনিশ বছর বয়স, একশো কুড়ি কেজি ওজন। ছেচল্লিশ কোমর। শালা আর কত বড় হব বল?'

রূপ ওর আইলাইনার লাগানো চোখ ওপর দিকে তুলে কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। বলল, 'ইউ আর জাস্ট ইনকরিজিব্‌ল!'

'শালা, সিগারেট খেয়ে পয়সা নষ্ট করিস। দে না আমায়। একটা মটন রোলের খরচ তো উঠে যায়।' গুন্ডা রূপের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে দিঘির দিকে ঘুরল, 'তাছাড়া, দিঘির আজ তো সেলিব্রেট করার দিন। সেই পার্ভার্টটা আজ বিদেয় হচ্ছে। ইউ শুড থ্রো আ পার্টি।' গুন্ডা খিকখিক করে হেসে, দুটো হাত ঘষল।

পার্ভার্ট! কথাটা অ্যাসিডের মতো ঢুকল কানের ভেতরে। দিঘি চোয়াল শক্ত করল। ওর মনে পড়ে গেল ঠোঁটের ওপর তিল। মনে পড়ে গেল ভেজা স্বাদ। বুনো জঙ্গলের গন্ধ। আচমকা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। বৃন্ত দুটো কোনও এক স্পর্শের স্মৃতিতে উন্মুখ হল। শীত করে উঠল দিঘির। দেখল কলেজ স্কোয়ারের জলে সূর্যটা ম্রিয়মাণ হয়ে এসেছে। আর কিছুক্ষণ পর থাকবেই না।

কিছু থাকে না। দিঘি জানে, কিছু থাকে না জীবনে। শুধু স্মৃতি থেকে যায়। মনখারাপ থেকে যায়। ছোঁয়া যায় না, এমন একটা কষ্ট ফড়িংয়ের মতো ওড়ে পাঁজরের আনাচকানাচে।

'দিঘি, কী হয়েছে?'

দিঘি মুখ তুলে আর্যকে দেখল। কালো টি-শার্ট আর বাদামি জিন্‌স পরেছে আজ। পিঠে ব্যাগ। ফরসা লম্বা চেহারা একটু এলোমেলো। মুখচোখ লাল হয়ে আছে। গালে দু'দিনের না কামানো দাড়ি।

'কিছু না,' দিঘি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'তুমি হাঁপাচ্ছ কেন?'

আর্য হাসল, 'তোমায় বলেছিলাম যে, পাঁচটায় আসব, কিন্তু স্যার এমন আটকে দিলেন যে... তাছাড়া, জে ইউ-র ক্যাম্পাস থেকে এই অবধি আসতে গেলে তো হাঁপাতেই হবে। তাও দেখো, জাস্ট ওয়ান আওয়ার লেট।'

দিঘি হাসল। ইচ্ছে করছে না, তবু হাসল। সত্যি আর্য ওর জন্য অনেক করে। না, ও কিছু করতে বলে না, কিন্তু তবু করে। নিজে থেকে করে।

আর্যর পুরো নাম আর্যনীল ঘোষ। যাদবপুরে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ে। থার্ড ইয়ার। বড়লোক বাপের একমাত্র ছেলে। সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ওপর আর্যদের বাড়ি। না, ঠিক বাড়ি নয়, বাংলো। চারটে গাড়ি, শিফ্‌টে শিফ্‌টে বদল হওয়া দারোয়ান, মালি, উর্দি পরা কাজের লোক, কী নেই? নেই, আর্যর মা নেই।

তাই বিদেশে আর্যকে পড়তে পাঠাননি ওর বাবা। যদিও ভদ্রলোক মাসের মধ্যে পনেরো দিন বিদেশেই থাকেন। তবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে হয়তো বিদেশেই ম্যানেজমেন্ট পড়তে চলে যাবে আর্য। ইংল্যান্ডে সেইমতো একটা বাড়িও কিনে রেখেছেন আর্যর বাবা। আর্য নিজে কখনও এসব বলেনি দিঘিকে। বলেছে স্নেহা।

রূপের মতো স্নেহাও দিঘির বান্ধবী। একই সঙ্গে ইকনমিক্স নিয়ে পড়ে। স্নেহারা আবার আর্যদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। সেই সূত্রেই গত বছর স্নেহার জন্মদিনে আর্যর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল দিঘির।

স্নেহাদের বাড়িটা আদ্যন্ত ক্লাসিক্যাল। সবাই চৌকো ভারী ফ্রেমের চশমা পরে। দাবার ছকের মতো বারান্দায় বাড়ির বড়রা ডেক-চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ে। আনন্দ হলে রবীন্দ্রনাথের গান গায়। দুঃখ হলেও রবীন্দ্রনাথেরই গান গায়। ওদের বাড়ির খাটে উঠতে হলে ফায়ার ব্রিগেডের সিঁড়ি লাগে। এখনও ঠাকুরদাদা ঘড়ি সময় জানায় পাড়া কাঁপিয়ে। ওরা সরগম মেনে হাসে। ওদের স্টাডিতে ঢুকলে মনে হয় আস্ত একটা কলেজ স্ট্রিট।

স্নেহার জন্মদিনে তাই অমন একটা বাড়ির ভেতর জিন্‌স, টপ, লিপ-স্টাড, রিস্ট-ব্যান্ড পরা ছেলেমেয়েরা ঢুকে নিজেরাই বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছিল। রূপের ঘণ্টায় চারটে সিগারেট ছাড়া চলে না। গুন্ডা কথায় কথায় 'এফ' শব্দের হরির লুঠ দেয়। রিধিমার লো ওয়েস্ট জিন্‌স মাঝে মাঝেই বিপদসীমা লঙ্ঘন করে। ওরা সবাই 'কোথায় এলাম' ধরনের মুখ করে বাড়িতে ঢুকেছিল। দিঘির সেই অবস্থা না হলেও অস্বস্তি হচ্ছিল ওরও।

ওরা সবাই জড়সড় হয়ে বসেছিল এক কোনায়। স্নেহার এক মাসিমা পিয়ানো বাজিয়ে পুজোপর্বের একটি গান গাইছিলেন। গুন্ডা বারে বারে হাই আটকাতে আটকাতে বলছিল, 'এরা সিন্নি খাইয়েই বাড়ি পাঠিয়ে দেবে না তো রে?'

রিধিমা মোবাইলে টেক্সট করে যাচ্ছিল অবিরাম। রূপ ঘনঘন সিগারেটের প্যাকেটে হাত দিচ্ছিল। আর দিঘি বেজার মুখে তাকিয়েছিল সামনে।

ঠিক তখনই পিছন থেকে একটা গলা ফিসফিস করে দিঘির কানের কাছে বলেছিল, 'রবীন্দ্রনাথ নিজে শুনলেও হাই তুলতেন। এরাই রবীন্দ্রসংগীতের বারোটা বাজাচ্ছে।'

দিঘি চট করে পিছনে তাকাতেই তামাকের হালকা কিন্তু মিষ্টি গন্ধ পেয়েছিল একটা। আর দেখেছিল মাখনের থেকে ছুরি দিয়ে কেটে বের করা একটা মুখ।

দিঘি ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল। কে এমন গায়ের ওপর এসে পড়ছে?

ছেলেটা ফিসফিস করে বলেছিল, 'হাই, দিস ইজ আর্য। ওয়ান্ট আ রিয়েল পার্টি? জাস্ট ফলো মি। ছাদে আমরা নিজস্ব অনুষ্ঠান করছি।'

দিঘিরা লঘু পায়ে ফলো করেছিল আর্যকে।

কিন্তু সেই সন্ধের পর আর্য ফলো করতে শুরু করে দিঘিকে।

আর্য গুন্ডাকে ঠেলে বসে পড়ল বেঞ্চে। তারপর বাঁ হাতটা দিয়ে দিঘির কাঁধ জড়িয়ে বলল, 'হোয়াট হ্যাপেন্ড সোনা?'

দিঘি কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাতটা সরিয়ে দিল, বলল, 'নট ইন দ্য মুড।'

'কেন? আজ তো দারুণ দিন। দ্যাট বাস্টার্ড ইজ গোয়িং আউট।' আর্য হাসি মুখে বলল, 'ইউ শুড বি হ্যাপি।'

রূপ বলল, 'না আর্য, ব্যাপারটা তা নয়। আসলে দিঘির হয়তো সব

হিউমিলিয়েশনগুলো মনে পড়ছে। মানে, ওর সঙ্গে যা হয়েছে...'

'চুপ কর না তোরা।' দিঘি বিরক্ত গলায় বলল, 'একটা বিষয় পেলে তোরা এত ড্র্যাগ করিস না!'

'তাহলে অমন পেঁপেসেদ্ধর মতো মুখ করে বসে আছিস কেন তুই?' গুন্ডা ফোঁস করে উঠল, 'তুই মাঝে মাঝে এমন ক্যালানের মতো বিহেভ করিস না!'

দিঘি দু'হাত দিয়ে মুখটা ঘষল। ক্লান্ত লাগছে খুব। ঘুম পাচ্ছে। গতকাল সারারাত ঘুমোতে পারেনি। কেবল সেইসব কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল সে চলে যাবে। পড়াশোনার বইপত্তর খুলেও এক লাইন পড়তে পারেনি দিঘি। ওর জলে ডুবে থাকার মতো কষ্ট হচ্ছিল। শ্বাস নিতে পারছিল না যেন। ঘাড়ে, মুখে জল দিচ্ছিল। তবু পারছিল না মনঃসংযোগ করতে। তারপর একসময় বইপত্তর গুটিয়ে রেখেছিল। বুঝেছিল ওর শত চিন্তাতেও যা হওয়ার তা পাল্টাবে না, তা হবেই।

যা হওয়ার তা চিরকালই হয়, দিঘি জানে। কেউ কিচ্ছু করতে পারে না। শুধু মাঝখান থেকে কষ্ট আর টেনশন করে মানুষ। মনখারাপ করে। ভয় পায়। দিঘি নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল খুব। তবে পারছিল না। শুধু মনে পড়ছিল দেওয়ালে ঝোলানো গিটারটার কথা। মনে পড়ছিল মাস্কের গন্ধ। দুটো নীল চোখ!

'কী রে কিছু বলছিস না কেন?' আর্যকে টপকে গুন্ডা খোঁচা মারল দিঘিকে।

'কী বলব?'

'একটা পার্টি দে না। এমন মহান দিনে শালা জলের ধারে বসে অমন দুঃখকষ্টের মুখ করছিস কেন রে?'

'ইয়েস, লেট্‌স হ্যাভ সাম ফান।' আর্য উৎসাহিত হল, 'অন্তত প্যারামাউন্টে চলো, সবাই একটা করে লেমন ড্রিঙ্ক মেরে আসি।'

দিঘি বলল, 'তোমরা যাও, আমার ভাল লাগছে না।'

'ডোন্ট বি আ স্পয়েল স্পোর্ট। চল না।' রূপ খোঁচা মারল এবার। বলল, 'রিধিমা আর স্নেহারাও তো অন দ্য ওয়ে। ওদের বলে দিই, ওরাও চলে

আসবে। তুই ফালতু ঝামেলা করিস না।'

দিঘি কিছু বলতে গিয়েও পারল না। সাইড ব্যাগ থেকে ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে মোবাইলটা। ও ফোনটা বের করল। আরে শমীদা!

'হ্যাঁ শমীদা, বলো।' দিঘি কানে লাগাল ফোনটা।

'কী রে তুই কোথায়?'

'এই কলেজের কাছে। কলেজ স্কোয়ারে বসে আছি। কেন?'

'না, মানে... তুই...' শমীদা ইতস্তত করল, 'তুই ঠিক আছিস তো?'

'হ্যাঁ, কেন?' দিঘি বিরক্ত হল।

শমীদা সামান্য তোতলা। দিঘির বিরক্তি বুঝতে পেরে আরও কথা আটকে গেল। বলল, 'না-ন্-না, তু-তুই র-র-রাগ...'

'করছি না।' দিঘি ব্যাপারটা সহজ করার চেষ্টা করল।

শমীদা শব্দ করে হাসল। বলা যায় হাসার চেষ্টা করল। বোঝাতে চাইল যে, একটুও ঘাবড়ায়নি। মানুষটার এই লো-কনফিডেন্সপনার জন্যই দিদিকে ধরে রাখতে পারল না। সবসময় যেন ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। যেন ইউনেসকো থেকে সবাইকে খুশি করার কনট্র্যাক্ট শমীকে দেওয়া হয়েছে। অমন ম্যাদামারা হয়ে থাকলে কেউ পাত্তা দেয়? অবশ্য শমী হয়তো তেমন পাত্তা পেতেও চায় না। শুধু পাত্তা দিতে চায়। সবাইকে মাথায় তুলে রাখতে চায়। এই এখন যেমন দিঘিকে চাইছে।

দিঘি বলল, 'তা হঠাৎ ফোন করলে?'

'তোর মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ আছে। আটটা নাগাদ পৌঁছে যাচ্ছি।'

'ইয়ে... মানে... ঠিকঠাক আসছিস তো?' শমীর গলায় অনিশ্চয়তা।

'মানে? দিদির কথা বলছ কি?' দিঘি জানতে চাইল, 'তুমি একটা কথা কতবার বলবে শুনি? দিদিকে তো নিয়েই যাব।'

'আসলে মহুল তো, তাই বলছিলাম সব ঠিকঠাক আছে তো? মানে ওর যা মাথা গরম।'

'এত পাত্তা দাও কেন বলো তো?' দিঘির বিরক্ত লাগল।

'কেন দিই?' বলল শমী, 'সত্যি এটা ভেবে দেখিনি তো।'

'ঠিক আছে এখন রাখছি। ঠিক পৌঁছে যাব।'

ফোনটা কেটে খাপে ঢুকিয়ে রাখল দিঘি। সত্যিই মাঝে মাঝে শমীকে খুব করে বকুনি দিতে ইচ্ছে করে ওর। কেন এমন হয়ে থাকে মানুষটা?

মহুলের সঙ্গে শমীর যখন বিয়ে হয় তখন ক্লাস এইটে পড়ে দিঘি। সম্বন্ধ করেই বিয়ে। বিয়ের আগে মাত্র দু'বার শমীকে দেখেছিল ওরা। বেঁটে, ফরসা মানুষ। মুখটা আমুদে। সবসময় একটা হালকা হাসি যেন লেগেই থাকত মুখে। আর মহুল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। হাতে মাথা কাটে টাইপ। নিজেই তখন ব্যবসা শুরু করেছিল মহুল। ইন্টিরিয়র ডিজাইনিংয়ের ব্যবসা। মনপ্রাণ দিয়ে ব্যবসা জমানোর চেষ্টা করত মহুল। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা এসবের দিকে মোটেই মন ছিল না ওর। তাই বাবা যখন বিয়ের কথা তুলেছিল মহুল দু'দিন সময় চেয়ে 'হ্যাঁ' করে দিয়েছিল।

দিঘির আপত্তি ছিল বেশ। কত বয়স তখন মহুলের? বড়জোর পঁচিশ। এই বয়সে এখন কেউ বিয়ে করে? মহুলকে আপত্তির কথা বলেওছিল দিঘি। বলেছিল, 'কী রে দিদি, তুই এখনই বিয়ে করবি? পাগল হয়ে গেছিস?'

'কেন? পাগল হওয়ার কথা বলছিস কেন?'

'বা রে, কেউ এমন হুট বলতে বিয়ে করে নাকি? তাও অ্যারেঞ্জড! ইয়াক্।'

'বাজে কথা বলিস না। হি হ্যাজ আ গুড প্রসপেক্ট।'

'মানে? গুড প্রসপেক্ট মানে?' দিঘির অবাক লেগেছিল। কী বলছে মহুল?

'মানে?' মহুল খাটে গুছিয়ে বসেছিল। একটা হালকা চাদর গায়ে পেঁচিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'শোন দিঘি, আমায় বিজনেসের জন্য এটা করতে হবে। আগেকার দিনের রাজ-রাজাদের মতো। শমীন্দ্রদের বিশাল বড় কাঠের ব্যবসা! ওদের ফার্নিচারের ব্র্যান্ড সারা দেশে এত পপুলার, সেখানে বিয়ে হলে আমার ইন্টিরিয়র ডিজাইনিংয়ের ব্যবসাটার কত লাভ হবে বল তো! বিয়েটা আমার কাছে স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স। নাথিং মোর দ্যান দ্যাট।'

'ব্যস, শুধু তাই?' দিঘির অবাক লেগেছিল খুব, 'তোর শমীদাকে পছন্দ হয়নি? এমনি এমনি বিয়ে করছিস?'

মহুল হেসেছিল খুব। বলেছিল, 'তোদের এই টিন এজটা ভীষণ ডেঞ্জারাস। আনেসেসারি গ্লোরিফাই করাটা এই বয়সের স্বভাব। আরে বাবা জীবন হল হার্ড রিয়্যালিটির জায়গা। সারভাইভাল অত সোজা কিছু নয়। তাছাড়া যেদিন শমীন্দ্ররা আমায় দেখতে এসেছিল, তুই বুঝিসনি যে, ছেলেটা একটু ল্যাবাকান্ত টাইপ। একে পকেটে পোরা খুব সোজা।'

'দিদি তুই একটা যাচ্ছেতাই। আর সে কথাই যদি বলিস তাহলে এটাও জেনে রাখিস যে, শমীদারা তিন ভাই-ই ব্যবসার পার্টনার। তাছাড়া শমীদার মাথার ওপর ওর বাবা আছে। তুই যা চাইছিস তা সফল নাও হতে পারে।'

'আরে দেখ না মজাটা। বাবা চিরকাল চাকরি করে গেল। হোক না বড় চাকরি, কিন্তু চাকরি তো। অন্যের কাছে নিজের সময় আর ইচ্ছে গচ্ছিত রাখা। একটা তিন লাখের গাড়ি। সেকেন্ড হ্যান্ড পুরনো দিনের ফ্ল্যাট। এর বেশি কিছু করতে পেরেছে বাবা? ব্যবসাই হচ্ছে আসল জিনিস। বাঙালিদের সেই এজ ওল্ড ছুঁতমার্গের আর কোনও জায়গা নেই। অমন টিপে টিপে জীবন কাটাতে ইচ্ছে করে না দিঘি। তাই তো এক বছর চাকরি করে নিজে ব্যবসা শুরু করলাম। এখনও অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে হবে জীবনে। অনেক কিছু। আগে বিয়েটা হতে দে, তারপর দেখ তামাশা।'

সত্যি তামাশাই দেখেছে ওরা। মহুল পুতুলনাচ থেকে সার্কাস সব দেখিয়ে ছেড়েছে সবাইকে। আর দিঘিরা সবাই ট্রাপিজের খেলা দেখার মতো করে তাকিয়ে থেকেছে অবাক হয়ে। কখনও নিজে রাগ করে মহুল চলে এসেছে বাপের বাড়ি। কখনও শমীর মা ফোন করে নালিশ করেছে যে, মহুল বাথরুমে ঢুকে নিজেকে বন্ধ করে নিয়েছে। কখনও আবার মাঝরাতে গাড়ি নিয়ে ক্ষতবিক্ষত শমী এসে বলেছে, মহুল খিমচে এই দশা করেছে ওর।

দিঘিরা প্রথম প্রথম বুঝত না কেন এই অশান্তি হচ্ছে। মা জিজ্ঞেস করত মহুলকে, কিন্তু উত্তর পেত না। বাবা জিজ্ঞেস করত, কিন্তু উত্তর পেত না। এমনকী শমীও বলত না কিছু।

শমীদের অফিস ছিল ক্যামাক স্ট্রিটে। একদিন বাবা সেখানে আলাদাভাবে গিয়ে দেখা করে শমীর সঙ্গে। রাতে যখন মাকে বাবা সেই সাক্ষাতের কথা বলছিল, দিঘি পাশের ঘর থেকে, একরকম আড়ি পেতেই শুনেছিল বাবা-মায়ের কথা।

মা অবাক হয়ে বলেছিল, 'এই জন্য? শুধুমাত্র এই জন্য মহুল অশান্তি করছে?'

'হ্যাঁ,' বাবাকে দেখতে না পেলেও, দিঘি বুঝতে পেরেছিল যে, বাবা মাথা নিচু করে বসে রয়েছে। বাবা বলেছিল, 'গন্ডগোলটা মহুল নিজেই করছে। শ্বশুরমশাইকে বলছে ওর কোম্পানিতে ইনভেস্ট করতে আর ওর ব্র্যান্ডটাকে নিজেদের সিস্টার কনসার্ন হিসেবে তুলে ধরতে। শমীর অন্য ভাইরা এতে আপত্তি করায়, শ্বশুরমশাই মত দিচ্ছেন না। ব্যস, রেগে লাল হয়ে গেছে তোমার মেয়ে! তাণ্ডব শুরু করেছে। শমীকে তো প্রায়ই মারধর করে মহুল। শেষ পর্যন্ত যে কী হবে!'

মা কাঁদছিল। এ ঘরে বসে বিরক্তি আর লজ্জা একসঙ্গে অনুভব করছিল দিঘি। মহুল ওর চেয়ে প্রায় এগারো বছরের বড়, কিন্তু চিরকাল এমন ছেলেমানুষি করে গিয়েছে। দিঘি আর মহুলের ভেতর কে যে বয়সে বড় বোঝা দায়!

সাড়ে ছ'টা বাজে। প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। এবার উঠতে হবে। আর্যরও শমীর কাছে নেমন্তন্ন আছে। কলেজ স্কোয়ার থেকে এখন গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউতে যেতে হবে। সেখানে বছরখানেক হল নতুন একটা দু'কামরার ফ্ল্যাট নিয়েছে মহুল। সেখান থেকে ওকে পিক-আপ করে নিয়ে তারপর পার্ক স্ট্রিট যাবে। সেখানকার বড় চৌমাথার মিউজিক স্টোর্সের সামনে ওদের জন্য অপেক্ষা করবে শমী। শমী ওদের রেস্তোরাঁয় খাওয়াবে। কারণ শমীদের দক্ষিণ কলকাতার ওই পেল্লায় বাড়িটায় মহুল আর যাবে না কোনওদিন। ওই বাড়ির লোকদের মুখোমুখি আর দাঁড়াবে না।

অবশ্য শমীর সামনেও যেতে চায় না মহুল। বলে, 'ওই লাউগাছটার সামনে যেতে আমার ঘেন্না করে।'

শমী ব্যাপারটা ভালই জানে তাই গত পরশু নিজে মহুলকে ফোন না করে, ফোন করেছিল দিঘিকে। তখন কফি হাউজ থেকে বেরিয়ে মেট্রোর দিকে যাচ্ছিল দিঘি। রবীন্দ্রসদনে আর্যর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। ফোনটা পেয়ে সামান্য বিরক্ত হয়েছিল ও। শমীকে মোটামুটি পছন্দই করে দিঘি। কিন্তু শমীর ওরকম দুর্বল পার্সোন্যালিটিটা ঠিক মানতে পারে না। লোকটার ভেতরে কেমন যেন একটা হাহাকার ঘুরে বেড়ায় সবসময়। মনে হয় যেন কোনও গভীর গর্তে পড়ে আছে মানুষটা। কেউ উদ্ধার করার নেই।

দিঘিরও শমীকে ছোটখাটো বিষয়ে উদ্ধার করতে ইচ্ছে করে না। বিশেষ করে যদি তা মহুল সংক্রান্ত হয়। এমন ন্যাদ্যাবোদা ছেলে দেখলে পিত্তি জ্বলে যায় দিঘির।

তবু ফোনটা ধরেছিল, 'হ্যাঁ, বলো শমীদা।' গলার বিরক্তিটা বিন্দুমাত্র লুকোতে চায়নি ও।

'তুই রাস্তায় আছিস দিঘি?'

আচ্ছা আহাম্মক! কলেজের দিনে বিকেলবেলায় আর কোথায় থাকবে ও? দিঘি বলেছিল, 'হ্যাঁ, এবার মেট্রো ধরব। তাড়াতাড়ি বলবে একটু, কী দরকার।'

'ও ব্যস্ত আছিস?' শমীর গলায় দ্বিধা বুঝতে পেরেছিল দিঘি।

ও বলেছিল, 'তাতে প্রবলেম নেই। শর্টে বলে নাও কী বলবে।'

'বলব?' শমী ইতস্তত করছিল তাও।

'শমীদা প্লিজ, মেক ইট ফাস্ট।'

শমী গলা পরিষ্কার করে বলেছিল, 'একটা হেল্প দরকার ছিল। আর্জেন্ট হেল্প।'

'কী হেল্প?'

'পরশু আমার বার্থডে দিঘি।'

'তাই?' দিঘি কী বলবে বুঝতে পারছিল না।

'হ্যাঁ। থার্টিথ্রি আগস্ট। সেদিন আমি তোকে, আর্য আর তোর দিদিকে

একটা ছোট ট্রিট দিতে চাই।'

'তাই? কিন্তু কেন আবার এত ঝামেলা করছ শমীদা? এসব বাদ দাও না। তাছাড়া আর্য ফ্রি আছে কিনা, বা দিদি ফ্রি আছে কিনা জানি না।'

'আর্য ফ্রি আছে। তোকে ফোন করার আগে ওকে ফোন করেছি আমি। তুই জাস্ট মহুলকে রাজি করিয়ে নিয়ে আসবি। আটটার সময় পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে বড় মিউজিক স্টোরটার সামনে।'

'আমি? কেন?' দিঘির আশ্চর্য লেগেছিল।

'আরে মহুল কিছুতেই আমার কল রিসিভ করছে না। আমি কুড়িবার ফোন করেছি। প্রতিবার কেটে দিয়েছে। তারপর এসএমএস করে কীসব গালিগালাজ লিখে পাঠিয়েছে দেখ না। প্লিজ দিঘি, তোর দিদিকে একবার নিয়ে আয়। আরে, মাই লাইফ ডিপেন্ডস অন ইট। মহুলকে আমি কি ছাড়তে পারি?'

'দেখো শমীদা, আমি দিদিকে কী বলব? আর দিদিই বা শুনবে কেন? তুমি জানো না দিদির কেমন জেদ?'

'প্লিজ দিঘি। মহুল একমাত্র তোর কথাকেই যা একটু গুরুত্ব দেয়। তুই প্লিজ না করিস না।'

শমীর গলাটা শুনে দিঘির মনে হয়েছিল যে-কোনও সময়ে কেঁদে ফেলবে মানুষটা।

'আরে ঠিক আছে। ডোন্ট বি সো সেন্টি। তুমি এমন কেন গো শমীদা? নিজের বউকে এত ভয় পাও কেন?'

'আর বউ!' শমী দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

'আরে তোমার সঙ্গে না থাকলেও ডিভোর্স যখন হয়নি, তখন বউ-ই। কেন তুমি অনর্থক ভয় পেয়ে এমন করছ?' দিঘি মেট্রো স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বলেছিল কথাগুলো।

'না দিঘি, অনর্থক নয়... তুই... তুই প্লিজ মহুলকে...' শমীর গলাটা ভিজে ভিজে শোনাচ্ছিল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে শমীদা। আমি দিদিকে নিয়ে পৌঁছে যাব। ডোন্ট ওরি। টেক কেয়ার, বাই।'

প্রাথমিক বিরক্তিটা চলে গিয়ে দিঘির বেশ খারাপ লাগছিল শমীর জন্য। শমী হয়তো দুর্বল মানুষ। কিন্তু দুর্বল মানুষরা ভালবাসতে পারবে না এমন তো কোনও আইন এখনও নেই। মহুল যে কেন প্রেমকে গুরুত্ব দেয় না!

এখন মহুলের ইন্টিরিয়র ডিজাইনিং ব্যবসা মোটামুটি ভালই চলছে। শমীর বাড়ি থেকে তো চলেই এসেছিল আগে। আর গত বছর বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউতে নতুন একটা ফ্ল্যাটে উঠে গেছে মহুল। বাবার শত অনুরোধেও টিঁড়ে ভেজেনি। মহুল ফিরে আসেনি। এবার মহুলের ইচ্ছে একটা ছোট গাড়ি কিনবে।

মহুলকে মানুষ হিসেবে যতই ডেসপারেট, অ্যারোগ্যান্ট আর সেলফিশ লাগুক না কেন, দিঘির মনে হয় ভেতরের মেয়েটা কিন্তু খুব ভাল। তবে সেই ভাল, নরম মেয়েটার নাগাল পাওয়া যে সহজ নয় তাও জানে দিঘি। সেই নরম মেয়েটার নাগাল কীভাবে পাবে, কীভাবে মহুলকে রাজি করাবে শমীদার নেমন্তন্নে নিয়ে যেতে তাই ভাবছিল দিঘি। ভাবছিল কথাটা কীভাবে বলবে মহুলের সামনে।

রাতে, খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে বসতে যাবে, এমন সময় ফোনটা বেজেছিল দিঘির। নামটা দেখে সামান্য চমকে গিয়েছিল ও। মহুল! আরে, দিদিকেই তো ফোন করবে ভাবছিল।

'বল, দিদি,' ফোনটা ধরে খাটে গুছিয়ে বসেছিল দিঘি।

'দিঘি, কেমন আছিস তুই?'

'ভাল আছি। শোন না, আমি তোকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম।'

'আমায়?' মহুল হেসেছিল। দিঘি বুঝতে পারছিল যে, মহুলের মেজাজ ভাল আছে।

'হ্যাঁ, তবে আগে তুই বল কেন ফোন করেছিস।'

মহুল খুশির গলায় বলেছিল, 'শোন না, তোকে কাল আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যেতে হবে। কনভ বলেছিল যাবে, কিন্তু আমি রাজি হইনি। দিঘি, তুই যাবি আমার সঙ্গে। কেমন?'

কনভ, মানে কনভ রাঠোর। মহুলের নতুন প্রেমিক। বা বলা যায় প্রেমের লাইনে ইট পেতে অপেক্ষা করা এক প্রত্যাশী। মহুল ছেলেটা সম্বন্ধে তেমন সিরিয়াস নয়। বলে, 'ছাব্বিশ বছর বয়স, কী রে অত প্রেম? আমার চেয়ে কম সে কম তিন বছরের ছোট। তারপর ওকে দিয়ে আমার ব্যবসারও কোনও লাভ হবে না।' তবে কনভ ছেড়ে দেয় না। লেগে থাকে মহুলের সঙ্গে।

কনভ রাঠোর, বিশাল বড়লোকের ছেলে। ওদের গ্রুপ অব কোম্পানিজ আছে। তারই একটা, রাঠোর পার্টিকল অ্যান্ড হার্ড বোর্ড মিল্‌স লিমিটেডের ডিরেক্টর এই কনভ। যেমন লম্বা তেমন টকটকে গায়ের রং কনভের। দেখলে মনে হয় হিন্দি ছবির নায়ক। থুতনির কাছে একটা কাটা দাগ মুখটার অন্য একটা অ্যাপিল তৈরি করেছে। দিঘির বান্ধবী রূপ তাই বলেছিল একটা গেট টুগেদারে কনভকে দেখে। বলেছিল, 'এ যে একদম চন্দ্রচূড় সিংহ রে।'

আসলে কনভ পাশের ব্যানার্জি বাড়িতে খুব আসত একসময়। আদিত্যদার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। সেসময়ই ওর আলাপ হয়েছিল মহুল আর দীঘলের সঙ্গে। তবে কনভ আর বেশি দিন দেশে থাকবে না। ওদের ব্যবসা দেখাশোনার জন্য ওকে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যেতে হবে। তবু চলে যাওয়ার আগে ও মহুলকে নিজের দিকে টানতে চেষ্টা করে।

'এই দিঘি, কী হল, কী ভাবছিস?' মহুল খুঁচিয়েছিল, 'উত্তর দিলি না তো! কাল যাবি তো আমার সঙ্গে?'

'কোথায় যাব?' দিঘি অবাক হয়েছিল।

'কাল গাড়ি দেখতে বেরব। কয়েকটা শোরুমে ঘুরতে হবে। আমি আর তুই যাব। বিকেল তিনটে নাগাদ আমার অফিসে আসবি। কেমন?'

দিঘি হেসেছিল, 'তাহলে গাড়ি কিনবিই ঠিক করলি?'

'হ্যাঁ, আর সেটা পছন্দ করতে তুই যাবি আমার সঙ্গে।'

'দিদি, আমি যাব। কিন্তু আমার একটা কথা তোকে শুনতে হবে তার আগে।'

'শিওর, কী কথা?' খুশির গলায় জানতে চেয়েছিল মহুল।

'পরশু তোকে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে। রাজি তো?'

'পরশু? কোথায়?' এবার একটু আশ্চর্য হয়েছিল মহুল।

'শমীদার জন্মদিন, তোকে নেমন্তন্ন করেছে। আমাকেও। তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে দিয়েছিল দিঘি।

'মানে?' ফোনের ওপ্রান্ত থেকে ছিটকে এসেছিল মহুলের গলা, 'কী বললি? শমীর জন্মদিনে আমায় যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, নেমন্তন্ন করেছে যখন, যেতে তো হবেই।'

'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ওই জানোয়ারটার জন্মদিনে আমি যাব? আর চল্লিশের বুড়ো ভাম! তার আবার জন্মদিন কী রে?'

'আঃ, শোন না,' দিঘি কিছুতেই থামাতে পারছিল না মহুলকে, 'আরে তুই তো ফোন তুলছিস না। আসলে ওদের বিজনেস হাউসের হয়ে তোর কাছে একটা প্রপোজাল রাখতে চায় ও।'

'প্রপোজাল?' আচমকা নরম হয়ে গিয়েছিল মহুলের গলা।

দিঘি বুঝেছিল যে, ওষুধ ধরেছে। মহুল আর শমীর যত গন্ডগোল তো এই বিজনেস নিয়েই। দিঘি তো জানে মহুল বিজনেসের জন্য সব করতে পারে। তাই ঝুঁকি নিয়ে মিথ্যে কথাটা বলেই দিয়েছিল। ভেবেছিল আগে তো মহুল যেতে রাজি হোক। তারপর না হয় শমীকে ব্যাপারটা বলে একটা উপায় বের করা যাবে।

'তা, কী প্রপোজাল শুনি?' মহুল সন্দেহের গলায় বলেছিল।

'সে কি আর আমায় বলেছে? আমরা গেলে খেতে খেতে বলবে। আসলে পার্ক স্ট্রিটে খাওয়াবে তো!'

'পার্ক স্ট্রিটে! বাড়িতে নয়! ও...' মহুলের স্বস্তির শ্বাসটা স্পষ্ট বুঝেছিল দিঘি। আর এও বুঝেছিল যে, মহুল আর খুব একটা অরাজি নয়।

মহুল আবার বলেছিল, 'তা হঠাৎ দু'বছর পর টনক নড়ল বাবুর?'

'তুই বড্ড বেশি খুঁতখুঁত করিস। আমার মনে হল তোর কাজের ক্ষেত্রে উন্নতি হবে তাই বললাম। এখন বাকিটা তোর ওপর। বল, কী বলব শমীদাকে? যাবি তো?'

ফোনের ওপারে নিস্তব্ধতায় ডুবে গিয়েছিল মহুলের গলা। তারপর একসময় জলের গভীর থেকে বুদ্বুদ ওঠার শব্দে আলতো করে মহুল বলেছিল, 'হ্যাঁ, যাব।'

ফোনটা রেখে বিছানায় ঠেঁট কামড়ে বসেছিল দিঘি। মহুলকে রাজি করাতে এ কী করে ফেলল ও? যখন জানে যে, মহুল আর শমীদার ভেতরের গন্ডগোলের মুল কারণ মহুলের ব্যবসার প্রতি আগ্রহ, তখন কেন ও এমন একটা কাণ্ড করল?

দিঘির মাঝে মাঝে নিজের ওপর রাগ হয়। হঠাৎ হঠাৎ ও এমন এক একটা কথা বলে ফেলে যার খেসারত দিতে গিয়ে নিজেই ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়ে।

সেই রাতে আবার নিজের চারদিকে জালটা দেখতে পেয়েছিল দিঘি। অনিচ্ছাকৃতভাবে ও আবার একটা নতুন ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে গেল না তো? আর আচমকা, একদম আচমকাই, কোনও কারণ ছাড়াই দিঘির চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল একটা হলুদ গিটার, একটা ছাদের ঘর আর এক জোড়া নীল রঙের চোখ।

'কী হল, প্যারামাউন্টে যাবে?' আর্য কনুই দিয়ে আলতো ধাক্কা মারল দিঘিকে।

'না, যাব না,' বিরক্ত লাগল দিঘির। এমনিতেই মন ভাল নেই তার ওপর এরা এমন শুরু করেছে যে, বিরক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে আরও। ও বলল, 'তোমার মনে নেই শমীদার ওখানে নেমন্তন্ন আছে?'

'নেমন্তন্ন!' আর্যর কাছে যাওয়ার আগেই খপ করে কথাটাকে ধরল গুন্ডা, 'আমায় বলিসনি তো? কোথায় নেমন্তন্ন? কার কাছে?'

'তাতে তোর দরকার কী?' রূপ আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

'সেটা তোকে বলব কেন রে? শালা খাস তো ধোঁয়া, সলিড ফুডের মর্ম তুই কী বুঝবি?' গুন্ডা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল, 'শালা ডাল, আলুসেদ্ধ আর পাঁপড়ভাজা খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল। ড্রেজার নামিয়ে পেট পরিষ্কার করাতে হবে!'

'বড্ড হ্যাংলা তুই। আর্য আর দিঘির কোথায় নেমন্তন্ন তা জেনে তুই কী করবি? ম্যানার্স, এটিকেট বলেও একটা ব্যাপার আছে গুন্ডা, বুঝেছিস?'

'ম্যানার্স?' গুন্ডা ওর মেদবহুল শরীর কাঁপিয়ে হাসল, 'ওসব ম্যানার্স মারাস না। তোদের তো শালা খিদেই পায় না। বুঝিস খিদে পেলে কেমন লাগে? আমার ফ্যামিলিতে ন'জন থাকে। মাস্টারবেট করার পর্যন্ত প্রাইভেসি পাই না। বাবার চটকল বন্ধ। দাদার কেরানিগিরি আর ঘুষের টাকায় বেঁচে থাকি। দুটো অবিবাহিত পিসি আছে যারা সারাদিন মায়ের পিছনে পড়ে থাকে। ভাইটা সারাদিন গিটার নিয়ে টিং টাং করে মাথা খায়। বউদি রাতে চারটের বেশি রুটি দেয় না আমায়। কী করে যে বেঁচে আছি আমি জানি। যাদবপুরের কলোনি থেকে ওই পশ কলেজে আসতে আসতে জানিস নিজেকে কতটা মেরে ফেলতে হয়? তোর সারা মাসের যা সিগারেটের খরচ না, সেটা দু'বাড়ি টিউশন করে আমায় তুলতে হয়।'

দিঘি দেখল উত্তেজনায় গুন্ডার সারা শরীরে জলের মতো ঢেউ খেলছে। দরদর করে ঘামছে ছেলেটা। দেখে মায়া হল দিঘির। সত্যি গুন্ডাদের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। না, ও নিজে গুন্ডাদের বাড়িতে যায়নি। কিন্তু স্নেহা গেছে। ওই বলেছে। তবে পড়াশোনায় গুন্ডা খুব ভাল। আর টিউশনিও করে চুটিয়ে। গুন্ডার কথায়, 'আরে, ও ছাত্র পড়ানো, শিক্ষা দান, ঢপের কনসেপ্ট। আমি জাস্ট খাওয়া-পরার কাজ করি। ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে মাসের শেষে মাইনে আর সন্ধেবেলার টিফিনটা হয়ে যায়।'

রূপ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে পিষে দিল আগুনটাকে, তারপর গুন্ডার হাত ধরে ওকে বসাল। ঠান্ডা, নরম গলায় বলল, 'বাবা রে বাবা, এত সেন্টু খেয়ে ঘাস কেন তুই? বড্ড অভিমান তোর। মাথাটা ঠান্ডা কর। যা ড্রামা শুরু করেছিলি না, আ পারফেক্ট টিয়ার জার্কার।'

গুন্ডা রূপকে পাত্তা না দিয়ে বলল, 'কোথায় রে তোর নেমন্তন্ন দিঘি?'

'শমীদার কাছে, আজ ওর জন্মদিন।'

'জন্মদিন! এই বয়সে! শিং ভেঙে বাছুর?' গুন্ডা আবার উঠে দাঁড়াল, 'তবে ভাল। সেই জন্যই না খ্যাঁটের বন্দোবস্ত করেছে। শালা, শমীদাটা কিন্তু মাইরি ব্যাপক কিপটে, আর্য আর তোকে খেতে বলল আর আমি বাদ? তাছাড়া বছরে মাইরি মোটে একটা জন্মদিন ওর। যাক গে, আমি যাব। শমীদাকে ফোন করে বলে দে।'

গুন্ডা শেষ কথাগুলো এমন করে বলল যেন সরকার থেকে সার্কুলার দেওয়া হয়েছে যে, গুন্ডাকে বাদ দিয়ে কোনও নেমন্তন্ন বা অনুষ্ঠান হবে না।

দিঘি চোয়াল শক্ত করল। গুন্ডাটা যদি যায় তাহলে শমীদা একটু অস্বস্তিতে পড়বে। নেমন্তন্ন যে নিছকই বাহানা সেটা তো দিঘি ভাল করেই জানে। হঠাৎ কেন এই নেমন্তন্ন, কেন এই খাওয়ানোর ইচ্ছে, তা শমীদা নিজেই বলেছিল, সে রাত্রেই।

মহুলের ফোনটা ছেড়ে চুপ করে বিছানায় বসেছিল দিঘি। এমনিতেই গত দু'সপ্তাহ ওর মনমেজাজ ভাল নেই। তার ওপর আবার মহুল-শমীর ঝঞ্ঝাটে নিজের বোকামোর জন্যই ঢুকে যাওয়া—সব নিয়েই খুব বিরক্ত ছিল দিঘি। ও ঠিক করেছিল সেই রাতেই শমীদাকে ফোন করে মহুলকে ও কী বলেছে তা বলে দেবে।

একবার রিং হতেই ফোনটা ধরেছিল শমী, 'এই তোর ফোনের জন্যই এতক্ষণ বসেছিলাম। তা কী খবর? মহুল কী বলল?'

দিঘি বলেছিল, 'বলেছে আসবে। তবে...'

'আসবে?' শমী আনন্দ আর উত্তেজনায় এমন চিৎকার করেছিল যে, ফোনটাকে কান থেকে সরিয়ে নিয়েছিল দিঘি।

শমী বলেছিল, 'তা মহুল রাজি হয়ে গেল? তুই কী এমন বললি ওকে?'

'সেটা বলতেই ফোন করেছি।' দিঘি সংক্ষেপে ঘটনাটা বলেছিল শমীকে।

আঁতকে উঠেছিল শমী, 'অ্যাঁ, করেছিস কী? এমন বললি কেন?'

'তো কী বলব? বলব যে, জন্মদিনে শমীদা বউকে সোহাগ করবে বলে ডাকছে।' মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল দিঘির। আচ্ছা লোক, নিজের কিছু করার মুরোদ নেই, অথচ হাতে লাল পেন নিয়ে অন্যের কাজকর্ম কারেকশন করবে বলে বসে আছে।

'এখন আমি কী করব?' অসহায় শুনিয়েছিল শমীর গলা, 'বাড়িতে যদি জানতে পারে? যদি মহুল এ ব্যাপার নিয়ে হুট করে দাদাকে ফোন করে? একদম সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার।'

দিঘি জানে, বাড়ির ছোট ছেলে হিসেবে শমীর আদর যেমন সবার ওপরে, তেমনই ব্যবসাপত্তরের ক্ষেত্রে ওর গুরুত্ব সবার নীচে। লো-কনফিডেন্স, সামান্য তোতলা মানুষটা বাড়িতেও কেমন যেন একটু গুটিয়ে থাকে সবসময়।

দিঘি বলেছিল, 'শোনো শমীদা, অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। দিদিকে এ ছাড়া নিয়ে যাওয়ার আর কোনও উপায় ছিল না। তুমি যেমন তেমন একটা ঢপ মেরে দিও না। অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? আর তোমার মুখ থেকে ব্যবসাপত্তরের কথাবার্তা না শুনে দিদি কাউকে ফোন করবে না। ফলে ভয় পেও না একদম। আর শোনো, তোমার গ্যাঁট ভাল করে খসাব সেদিন, তৈরি থেকো কিন্তু, কেমন।'

'কী রে দিঘি, অমন চুপ করে গেলি কেন বল তো?' গুন্ডা ভুরু কুঁচকে তাকাল।

'কোথায়?' দিঘি উঠল। আর বসে থাকলে হবে না। এবার উঠতে হবে। এখান থেকে গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ খুব একটা দূরে নয়। ট্যাক্সি নিয়ে নিলেই হবে।

'আচ্ছা মুশকিল। গেলি চুপ করে! আর বলছিস, কোথায়?' গুন্ডাও উঠে দাঁড়াল।

সন্ধে হয়ে আসছে এবার। আশপাশের আলো জ্বলে উঠছে। সাঁতারুরা সামনের জল থেকে উঠে গা মুছছে। গল্প করছে। একটু দূরে জলের এক কোনায় বাঁশের তৈরি আধ-খ্যাঁচড়া খাঁচাটাকে এই সন্ধেবেলা কেমন যেন ধ্বংসস্তূপের মতো লাগছে। পুজো, দুর্গাপুজোর জন্য তৈরি হচ্ছে শহর। অক্টোবরের প্রথমেই এবার পুজো। তার তোড়জোড় সারা শহর জুড়ে চলছে।

রূপ বলল, 'আমি এবার আসি রে। তোরা যা।'

গুন্ডা বলল, 'কেন, তুইও চল আমাদের সঙ্গে।'

'মানে?' আর্য এতক্ষণে কথা বলল, 'এই গুন্ডা, তোকে কে নিচ্ছে?'

'কেন? তুইও দিঘির বন্ধু, আমিও বন্ধু। তুই যেতে পারলে আমিও যেতে পারব।'

'আমি শুধু বন্ধু নই, বুঝেছিস?' আর্য গম্ভীরভাবে কথাটা বলে দিঘির দিকে তাকাল।

দিঘি চোখ সরিয়ে নিল আর্যর চোখ থেকে। আর্য শুধু ওর বন্ধু নয়? তাহলে আর্য কে? আর্য বন্ধুর বেশি। সেই জন্যই তো আর্য দিঘিকে আদর করে। চুমু খায়। নির্জনে হাত ধরে বসে থাকে। সেই জন্যই তো আর্য কোথাও ঘুরতে গেলে দামি গিফ্‌ট নিয়ে আসে। শরীর খারাপ হলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফোন করে। সত্যিই তো, আর্য কি শুধুই বন্ধু?

দিঘির বুকের ভেতরে অদ্ভুত একটা কষ্ট পাক খায়। একটা নেই-নেই হাওয়া ঘুরে বেড়ায়। মনে হয়, নির্জন মাঠের ভেতর দিয়ে ছোট্ট একটা মেয়ে হাঁটছে একা। মনে হয়, কেউ নেই তার হাত ধরার। আচমকাই নীল একজোড়া চোখ দেখতে পায় দিঘি। হলুদ গিটার দেখতে পায়। দেখতে পায় ছাদের ঘরে এক পুজোর সকাল। সত্যিই আর্য কি শুধুই বন্ধু নয়?

ভেজা একটা হাওয়া শরীরের ভেতরে পাক খেয়ে গেল দিঘির। আজ তেরোই আগস্ট। আজ মৃত্যুদিন না?

'জন্মদিন, শমীদার জন্মদিন। ব্যস, আমি যাব।' গুন্ডা চিৎকার করে উঠল, 'আজ গেলে শমীদা কিচ্ছু মনে করবে না।'

'তাহলে ট্যাক্সিতে তুই সামনে বসবি।' আর্যর গলা দিয়ে রাগ ছিটকে বেরল।

খিকখিক করে হাসল গুন্ডা, 'শালা রং নিবি না। মনে থাকে যেন আমাদের পাড়ার ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাস।'

'তো? মারবি নাকি?'

গুন্ডার হাসি বেড়ে গেল, 'শালা পিছনের সিটে দিঘিকে একা চাস তো?'

'শালা, তোকে, শালা...' আর্য কী বলবে যেন বুঝতে পারল না।

'চুপ করবি গুন্ডা। আমার অসহ্য লাগছে।' দিঘি চিৎকার করে উঠল, 'সবসময় এমন করিস না তো! যাবি যখন চুপচাপ চল।'

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল এই সময়টা জমজমাট থাকে। দোকানিদের বই ফেরির চিৎকার, ট্যাক্সির অনর্থক হর্ন, সোল ক্ষয়ে যাওয়া জুতোর মতো এক দিকে কেতরে থাকা বাস আর অটোর অ্যাক্রোব্যাটিক পার হয়ে দিঘিরা ইউনিভার্সিটি গেটের সামনে এল।

রূপ বলল, 'ও কে, কাল ক্লাসে দেখা হবে। কেমন? বাই।'

দিঘি বলল, 'তুইও কিন্তু যেতে পারতিস। কোনও প্রবলেম হত না।'

'আমি? পাগল!' রূপ আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটাকে টোকা দিয়ে রাস্তায় ফেলে বলল, 'তোর ওই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান টাইপ দাদা-দিদির পাল্লায় পড়ব ভেবেছিস? এত্ত ঝগড়া কেউ করে! বিশেষ করে তোর দিদি। বাবা, যা এক পিস প্রোডাকশন তোর বাবা-মা দিয়েছে না! বাদ দে। আমি কাটি, বাই।'

রূপ চলে যেতেই আর্য হাত তুলে একটা ট্যাক্সিকে দাঁড় করাল। তারপর কোথায় যাবে বলে গাড়ির সামনের দরজাটা খুলে গুন্ডার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওঠ।'

গুন্ডা হাসল, 'দেখিস, যে রেটে তুই দিঘির সঙ্গে চিপকাচ্ছিস, টু-টু জা ফোর না হয়ে যায়!'

কলকাতায় অফিস টাইমের রাস্তা আর বাচ্চাদের ভাতের থালা—দুটোই এক। দিঘি অবাক হয়ে দেখে শহরে রোজ কচুরিপানার মতো গাড়ি বাড়ছে। লোন নিয়ে গাড়ি আর বাড়ি বাঙালির অ্যান্টাসিড অ্যাডিকশনের চেয়েও সাঙ্ঘাতিক হয়েছে আজকাল। ছোট ছোট বুট জুতোর মতো দেখতে গাড়িগুলো পোকার মতো ঘুরে বেড়ায় শহরের রাস্তাঘাট দিয়ে। দেখে বিরক্ত লাগে দিঘির। কষ্ট হয়। ভাবে, এত গাড়ির কি সত্যিই দরকার আছে? কত বড় বড় সুন্দর দেখতে বাস বেরিয়েছে এখন। নতুন ভাবে মেট্রো চলছে। অটো, ট্যাক্সিতে বাটি উপছে উঠছে শহরের। তারপরেও এত গাড়ি কীসের জন্য দরকার? অবশ্য ওদেরও এমন একটা ছোট্ট বুট জুতো রয়েছে। আর ওর দিদিও তো গতকাল একটা বুট জুতো পছন্দ করেছে।

ট্যাক্সিতে বসেই গুন্ডা সামনের সিট থেকে পিছন দিকে ঘুরে বসল, বলল, 'আমি এভাবেই বসব। দেখি কী করিস তুই আর্য।'

আর্য ভুরু কুঁচকে দিঘির থেকে সরে বসল একটু। বলল, 'গুন্ডা, তোর লজ্জা করে না রে? এমন যেচে নেমন্তন্নে যাস, অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে পিপিং টম হোস, এমন হাতির মতো মোটা তাও গোগ্রাসে গিলিস, লজ্জা নেই তোর?'

গুন্ডা হি হি করে হাসল, 'যতই যা বলিস, আমি সামনে ঘুরে বসব না। দিঘিকে নিয়ে অসভ্যতা করবি, আমি হতেই দেব না। আর আর্য, ব্যাপারটা ভাব, দিঘি কীরকম রাফ প্যাচের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সেটা বুঝছিস না তুই?'

গুন্ডার দিকে তাকাল দিঘি। আবার সেই প্রসঙ্গে ঢুকছে ছেলেটা।

গুন্ডা বলল, 'তবে আজকের পর থেকে আর সেই জানোয়ারটাকে দেখতে হবে না তোকে, শালাটাকে আরও আগে বাড়ি থেকে লাথি মেরে বের করে দেওয়া উচিত ছিল। তবে বেটার লেট দ্যান নেভার। আচ্ছা দিঘি, মালটা তোকে ঠিক...'

'চুপ করবি?' ঝাঁঝিয়ে উঠল দিঘি, 'বড্ড বাজে বকছিস তখন থেকে, বড্ড বাজে বকছিস গুন্ডা। চুপ কর।'

গুন্ডা থতমত খেয়ে বলল, 'যাঃ বাবা, আমার ওপর রাগছিস কেন? আমি কী করলাম? তুই ফালতু খচে যাচ্ছিস। যাক গে, যা হওয়ার হয়েছে। ওসব ভুলে যা। নোংরা মানুষদের যত ভুলবি ততই ভাল হবে।'

ভাল? কীসে ভাল হয় মানুষের? কার কথা ভুলতে চায় সে? ভুলে গিয়ে সে কী রাখতে চায় মনে?

দিঘি জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। আগস্ট বর্ষার মাস। তবে এবার বৃষ্টি তেমন হচ্ছে না। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে কিছু বিদ্যুতের শিকড় আচমকাই জেগে উঠল আকাশে। হঠাৎ ঠান্ডা হাওয়া ট্যাক্সির জানলা দিয়ে এসে আলতো ছুঁয়ে গেল দিঘির মুখ। অসংখ্য আঠারো বছর বয়সিদের মতো, বর্ষার সম্ভাবনায় দিঘিও কেঁপে উঠল ভেতরে ভেতরে।

মহুলের ফ্ল্যাটটা পাঁচতলায়। ছোট, কিন্তু ছিমছাম। দিঘির খুব ভাল লাগে মহুলের ফ্ল্যাটটা। শুধু নির্জনতা, সুন্দর সাজানো বা সাউথ ফেসিং বলে নয়। এই ফ্ল্যাটটা আসলে প্রতীক। মহুলের একা বেঁচে থাকার, সবার মুখে থাপ্পড় মেরে একা বেঁচে থাকার প্রতীক। পরিশ্রম আর নিষ্ঠার জোরে একটা খুব সাধারণ মেয়েও যে কলকাতায় ভদ্রভাবে বাঁচতে পারে, সে ব্যাপারে মহুল একটা উদাহরণ। কে না বিরোধিতা করেছে মহুলের এই শমীর থেকে আলাদা থাকার সিদ্ধান্তের, বাবা-মায়ের থেকে আলাদা থাকার সিদ্ধান্তের, এমনকী দিঘিরও মনে হয়েছিল যে, মহুল বাড়াবাড়ি করছে। শমীর সঙ্গে ঝামেলার জেরে একা একা থাকার কোনও মানে নেই। মনে হয়েছিল যে, শমীকে ছেড়ে চলে আসার পর মহুলের সঙ্গে মা যতই খারাপ ব্যবহার করুক, তাতে বাড়ি ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাটে একা থাকাটা বাড়াবাড়ি।

কিন্তু এখন দিঘি মহুলের বাড়াবাড়ির কারণটা বোঝে। পাখনা মেলে আকাশে ভেসে থাকা পায়রার আনন্দটা বোঝে। ওর মনে হয়, ইশ, এমন যদি একটা জীবন পেত ও!

মহুল ওকে এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকার কথা বলে। বলে যা খুশি করতে পারে দিঘি এই ফ্ল্যাটে এসে। কিন্তু দিঘি চট করে আসে না। কোথায় যেন বাধে। মহুল ওর নিজের দিদি, তাও মহুলের জিনিস নিতে কষ্ট হয় ওর। ভাবে যেদিন ও নিজে পারবে, সেদিন ও-ও ডানা মেলবে।

পাঁচতলায় লিফ্‌ট থেকে নেমে দিঘি ডোরবেল বাজাতে যাবে, ঠিক এমন সময় ব্যাগের ভেতর থেকে মোবাইল বেজে উঠল।

এখন আবার কে? বিরক্ত লাগল দিঘির। কাল টিউশন আছে। স্যার নয় তো! স্যারটা মহা ফাঁকিবাজ। হয় কী নয় কামাই করে।

দিঘি ফোনটা বের করল, আরে, সুবর্ণ! হঠাৎ এ সময়?

দিঘিদের পাড়ায় থাকে সুবর্ণ। সমবয়সি ছেলেটা খুবই ভাল। তবে বেশ রগচটা। ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়ে। দিঘির খুব বন্ধু।

দিঘি ফোনটা কানে লাগাল, 'হ্যাঁ রে সুবর্ণ, বল কী ব্যাপার?'

সুবর্ণ বলল, 'দারুণ খবর দিঘি। যাকে বলে পাড়ার ব্রেকিং নিউজ।'

'কী খবর?' দিঘি জিজ্ঞেস করল।

সুবর্ণ শ্বাস নিল একটু। খানিকটা যেন মনে মনে গুছিয়ে নিল নিজেকে। তারপর বলল, 'শুয়োরের বাচ্চাটা এইমাত্র কাটল।'

'মানে?' দিঘি বুঝল না ঠিক।

'আরে ট্যাক্সি ডেকে এনেছিল। তাতে ঢাউস দুটো ব্যাগ আর দুটো ছোট ব্যাগ তুলে মালটা বেরিয়ে গেল এইমাত্র। শালা, পাড়াটা বাঁচল যেন। আবর্জনা দূর হল!'

দিঘি ফোনটা ধরে রইল কানে। ও যেন দেখতে পেল সুকিয়া স্ট্রিটের গলির মুখ দিয়ে একটা হলুদ ট্যাক্সি বাঁক নিয়ে চলে গেল।

কত দূরে গেল ট্যাক্সি? কোথায় নিয়ে গেল মানুষটাকে? কার কাছে নিয়ে গেল? আচ্ছা, যা যা ঘটেছে সবাই তো ভালই হয়েছে বলবে, তাহলে দিঘির এমন লাগছে কেন? এমন চাপা কষ্ট হচ্ছে কেন বুকে?

সুবর্ণ বলল, 'তোর আজ লাকি ডে দিঘি। আর ভয় পেতে হবে না তোকে। আজ থেকে মন খুলে থাকতে পারবি। সবার কাছে তেরো সংখ্যাটা আনলাকি, তোর কাছে লাকি। তেরোই আগস্ট তোর লাকি ডে, বুঝলি?'

তেরোই আগস্ট! আজ মৃত্যুদিন না? আর আজকেই এভাবে চলে যেতে হল ওকে? মাথা নিচু করে, একরাশ কলঙ্ক আর অন্ধকার নিয়ে চলে যেতে হল? কার জন্য যেতে হল? দিঘির জন্য?

দিঘির মোবাইল ধরা হাতটা কান থেকে নেমে এল আপনা-আপনি। সুবর্ণ এখনও অনেক কিছু বলছে। কিন্তু পৌঁছচ্ছে না, দিঘির কাছে কিচ্ছু পৌঁছচ্ছে না। শুধু বুকের ভেতর চাপ লাগছে ভীষণ। পাঁজর ফাটিয়ে পাথরের দেওয়াল উঠছে যেন। আর সেই দেওয়াল টপকে দিঘি কিছুতেই পৌঁছতে পারছে না নিজের কাছে।

২

বুটটা খুলে রেখে এবার পায়ে জড়ানো ক্রেপটা খুলছে ছেলেটা। মাথা নিচু। ছোট করে কাটা চুলগুলো ঘামে ভিজে সপসপ করছে। জামাটাও শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে একদম। ছেলেটা যে বেশ ক্লান্ত তা ওর হাঁপানো দেখে বোঝা যাচ্ছে। ছেলেটার নাম জয়নাল। জগুদার নতুন বাছাই। বয়স বড়জোর কুড়ি। ছেলেটাকে আজই প্রথম নেটে দেখল রুহান। বলের স্পিড বেশ ভাল। দু'পাশে মুভমেন্টও ভাল। ওদের টিমের এক নম্বর ব্যাট্‌সম্যান বটুক চারবার এজ করেছে ওর বল। আর দু'বার তো একদম মিড্‌ল স্ট্যাম্পে খেয়েছে।

বটুকের ব্যাটটা সলিড। কিন্তু একটা নতুন ছেলের কাছে ক্রমাগত নাস্তানাবুদ হয়ে জয়নালকে চার অক্ষরের মালা পরিয়ে দিয়েছিল। তার ফলস্বরূপ পরের বলটা বটুক হেলমেটের ভাইজারে খেয়েছে। প্যাড-গ্লাভ্‌স খুলে, ব্যাট ছুড়ে ফেলে, বটুক রীতিমতো রাগারাগি করে বেরিয়ে গেছে।

খুব মজা লাগছে রুহানের। আনন্দ হচ্ছে। বটুককে একদম পছন্দ করে না ও। স্টার ইউনিয়নের এক নম্বর ব্যাট্‌সম্যান বলে ব্যাটার খুব তেল। তাছাড়া বেঙ্গলের নিয়মিত ওপেনার। ন্যাশনাল লেভেলে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশের তিনজন ব্যাট্‌সম্যানের সঙ্গে বটুক ঘোষের প্রতিযোগিতা চলছে ইন্ডিয়া স্কোয়াডে ঢোকার জন্য। যদিও

রুহান জানে ব্যাপারটা সোজা নয়। ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম রাবড়ি মালাই নয় যে, চেটেপুটে খেয়ে নেবে। ক্রিকেটের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি আরও অনেক ইকুয়েশন এখানে চলে। রুহান জানে, বা[illegible]কও এসবের জন্য বোর্ডের নানা লবিতে সিঁড়ি লাগানোর চেষ্টা করছে। পাশাপাশি পারফরম্যান্সও দেখাচ্ছে। এবছর রঞ্জিতে তিনটে সেঞ্চুরি মেরেছে। যার মধ্যে একটা ডাবল। অসমের সঙ্গে। যদিও সেটার খুব একটা বোধহয় দর নেই, তবু ডাবল সেঞ্চুরি যে-কোনও স্তরের ক্রিকেটেই একটা দারুণ ব্যাপার।

সেই বা[illegible]ককে জয়নাল এমন ঘোল খাইয়েছে! রুহানের মনে হল ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করবে একবার।

আলাপ তো করবে, কিন্তু আর-একটা অস্বস্তি মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে রুহানের। ছেলেটাকে কোথায় যেন দেখেছে ও। ঠিক মনে করতে পারছে না, কিন্তু কোথায় যেন দেখেছে। মানুষের মুখ চট করে ভোলে না রুহান। কিন্তু এটা কেন যে মনে পড়ছে না। মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে অস্বস্তি লাগল রুহানের। যেন পরীক্ষায় উত্তর লিখতে বসে সব উত্তরই পেটে আসছে, মুখে আসছে না।

আসলে সত্যিকারের পরীক্ষার সময় তো এমনই হত রুহানের। পড়ি-পড়ি করেও মনে পড়ত না সঠিক উত্তর। বা গোটা উত্তরটা লিখল, তারপর শেষের আসল পয়েন্টটা আর মনে এল না। ফলে যা হওয়ার তাই হত। রেজাল্ট ভাল হত না।

ক্লাস নাইনে ওঠার পর অ্যাডিশনালে বায়োলজি নিয়েছিল রুহান। বাবা চাইত ডাক্তার হোক রুহান। সবাই বলেছিল স্ট্যাটিসটিক্স বা মেক্যানিক্স নিতে। তাতে নম্বর উঠত। আর নাইনে বায়োলজি নিলেই কেউ ডাক্তার হয় না। কিন্তু বাবার ছিল গো[illegible]। বায়োলজি নিতেই হবে। জয়েন্টে বসতে হলে প্রথম থেকে জীববিদ্যাটা পোক্ত করা দরকার।

কিন্তু বায়োলজি বিশেষ মাথায় ঢুকত না রুহানের। এইসব বিজ্ঞানসম্মত নাম। তাদের ল্যাটিন আর গ্রিক অরিজিন। তাদের শ্রেণি, উপশ্রেণি। কর্ডাটা,

নন-কর্ডাটা, ভার্টিব্রেটা থেকে শুরু করে অর্থোপোডা, মোলাস্কা ইত্যাদি হাজারো ফ্যাচাংওয়ালা নামের লিস্টি। ওসব কিছুই মনে থাকত না ওর। ভয়ে ঘাম দিত রুহানের। জিব শুকিয়ে আসত। স্যার পড়া জিজ্ঞেস করলে জিবে যেন গিট দিয়ে দিত কেউ। ও কেবল, 'ওই যে স্যার...' 'মানে স্যার...' বলত। আসলে উত্তরগুলো আশপাশেই উড়ত ওর, কিন্তু তবু ঠিক ধরতে পারত না। তাই ভাল নম্বরও পেত না রুহান। চিরকালই সেকেন্ড ডিভিশন হয়ে রইল ও।

মাধ্যমিকে চুয়ান্ন শতাংশ নম্বর পেয়েছিল রুহান। রেজাল্ট জেনে বাড়ি ফিরে রুহান দেখেছিল বাবা তাড়তাড়ি চলে এসেছে অফিস থেকে। অস্থিরভাবে পায়চারি করছে বারান্দায়।

রুহানকে দেখে বাবা জানতে চেয়েছিল, 'কত? লাইফ সায়েন্স আর অ্যাডিশনাল বায়োলজিতে কত?'

নম্বরটা মাথা নিচু করে বলেছিল রুহান। তারপর আর কিছু স্পষ্ট মনে নেই।

শুধু আছড়ে পড়া বেল্ট। চড়। মাটিতে ফেলে গলা টিপে ধরা। আর কাত হয়ে শুয়ে দেখা দূরে মায়ের শঙ্কিত, বিধ্বস্ত মুখ। এ[illegible]কুই মনে আছে। ককাই এসে না ছাড়ালে রুহান বাঁচত কিনা কে জানে।

ককাই, মানে রজত রয়। রুহানের কাকা। রুহানের ঠাকুরদা রুদ্রাংশুশেখর রয়, লেক গার্ডেন্সে ওদের বাড়িটা তৈরি করেছিল। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বাড়িটার সামনে ছোট্ট একটা বাগান রয়েছে। নীচতলায় একজন ভাড়াটে রয়েছে ওদের। আর ওপরের তলাটার দুটো অংশ দুই ভাইয়ের।

এ ছাড়াও রুহানের এক পিসি রয়েছে। বাবা আর ককাইয়ের মাঝের বোন। থাকে সল্টলেকে। পিসেমশাইয়ের বড় ব্যবসা আছে। লেদার এক্সপোর্টের। তবে পিসিমা বিশেষ আসে-টাসে না ওদের বাড়িতে।

এসব নিয়ে বিশেষ ভাবে না রুহান। বাবার মৃত্যুর পর থেকে কোথায় যেন আত্মবিশ্বাসে আরও ঘাটতি হয়েছে রুহানের। জানা প্রশ্ন ভুল করে।

বাজারে গেলে দরদাম করার মতো মনের জোর পায় না। বাসে কেউ পা মাড়িয়ে দিলে নিজেই 'সরি' বলে সরে আসে। রিকশাওয়ালা চার টাকা বেশি ভাড়া চাইলে মুখ বুজে দিয়ে দেয়। এরকম আরও কত কী!

আসলে বাবা যতই বকুক আর মারুক, রুহান জানত যে, বাবা খুবই ভালবাসে ওকে। বাবাকে দেখলে রুহান আলাদা একটা ভরসা পেত।

মাধ্যমিকের রেজাল্টের পর সেই মার দিলেও, বাবাই উদ্যোগ নিয়ে নানা কাঠখড় পুড়িয়ে একটা স্কুলে ঠিক সায়েন্স নিয়ে ভর্তি করিয়েছিল রুহানকে। প্রতিটা সাবজেক্টের জন্য আলাদা করে টিচার রাখার পরেও নিজে বায়োলজিটা দেখত। লজ্জা লাগত রুহানের। ও ভাবত, বাবা যে এত খাটছে, তার ফল কি দিতে পারবে রুহান? ও তো এখনও সব ভুলে যায়। মনে করতে পারে না পুরো উত্তর। ও তো এখনও বিজ্ঞানসম্মত নামগুলোর বানান ভুল লেখে। এখনও ত্রিকোণমিতির ফরমুলা গুলিয়ে ফেলে। তাহলে? ও যখন পারবে না, তখন বাবা কত কষ্ট পাবে। কিন্তু তারপর বাবার চেষ্টা, আত্মবিশ্বাসী চোখ দুটো আর অধ্যবসায় দেখে ভাবত, না, কিছুই অসম্ভব নয়।

ছোট থেকেই ক্রিকেট খেলত রুহান। ফাস্ট বল করত। ভালই করত বলটা। বাবার অধ্যবসায় দেখে ও পড়ার পাশাপাশি খেলাতেও উৎসাহ পেত। ক্রমশ সব বিষয়েই রুহানের চেষ্টাটা বাড়ছিল। এমনকী, ইলেভেন থেকে টুয়েলভে ওঠার পরীক্ষাতেও ক্লাসের বন্ধুদের, স্যারদের, এমনকী, নিজেকে পর্যন্ত অবাক করে উনষাট শতাংশ নম্বর পেয়েছিল রুহান। এক শতাংশ, মাত্র এক শতাংশের জন্য ফার্স্ট ডিভিশন পায়নি।

এক রাতে, বাবা আর মাকে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুনেছিল রুহান। তার ভেতর রুহানের নামটা আসছিল দেখে কান পেতেছিল ও।

মা বলেছিল, 'তোমার এমনিতেই মাঝে মাঝে বুকে ব্যথা করে। তারপর অফিসে এত কাজের চাপ। তাই বলছিলাম, অফিস থেকে এসে আর ছেলেটার সঙ্গে বই নিয়ে বসে শরীরের স্ট্রেন কোরো না।'

'ধুর, কিচ্ছু হবে না,' বাবার হাসি শুনতে পেয়েছিল রুহান।

'তোমায় বলেছে,' মা রেগে গিয়েছিল সামান্য, 'ভাল কথা বলছি, এসব থামাও। শরীরের যত্ন নাও। তাছাড়া ছেলের পিছনে এত যে খাটছ, কী লাভ? যা চাইছ তা যদি না হয়? যদি জয়েন্টে সুযোগ না পায়?'

'তাহলেও ওর এই চেষ্টাটার কথা তো মনে থাকবে। এই পরিশ্রম, ডিসিপ্লিন আর নিষ্ঠাটার কথাটা তো মনে থাকবে। সেদিন ওকে যে, বেল্ট দিয়ে পিটিয়েছিলাম তা কি শুধু রেজাল্ট খারাপের জন্য ভেবেছ? তা নয়, একদম নয়। মাধ্যমিকে ওর নিষ্ঠার অভাব ছিল, পরিশ্রমের অভাব ছিল। ডিসিপ্লিন ছিল না ওর। তাই রাগ করে অমন মেরেছিলাম। পরে ভাবলাম, ও তো ছোট। মেরে কী লাভ হবে? তার চেয়ে যদি ওর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চেষ্টা করি তাহলে অন্তত ছেলেটা বুঝবে। সব সময় চাবুক চালালেই কাদায় বসা ঘোড়ার গাড়ি ওঠে না। কখনও কখনও নিজেকেও কাদায় নেমে হাত লাগাতে হয়। আর দেখলে তো এইচ এস-এর কঠিন সিলেবাসেও পাঁচ পারসেন্ট নম্বর বেড়েছে ওর। দেখো না, আর তো মাত্র এক পারসেন্ট। তাহলেই ফার্স্ট ডিভিশন হয়ে যাবে।'

মাত্র এক শতাংশ। মাত্র। এই 'মাত্র'টুকুই আর ছুঁতে পারল না রুহান। এই ঘটনার চারদিনের মাথায় বাবা হঠাৎ মারা গেল। দিনটা সোমবার ছিল। জুনের মাঝামাঝি। গরমে কলকাতার খুলি ফুটো করে ধোঁয়া উঠছিল যেন। রাস্তায় পিচ গলে বাবল গামের মতো লেগে যাচ্ছিল জুতোর তলায়। গরম একটা হাওয়া পাক খেয়ে উঠছিল থেকে থেকে।

এর ভেতর বাবা হাঁটছিল। বাস না পেয়ে প্রায় চার কিলোমিটার দূরের অফিস থেকে হেঁটে ফিরছিল মানুষটা। ফুলবাগানের কাছে এসে আর পারেনি। বসে পড়েছিল রাস্তার পাশের একটা দোকানের সিঁড়িতে। আর ওঠেনি।

বাবা ওঠেনি। রুহানও আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। ও আবার নেমে গিয়েছিল পঞ্চাশে। নিষ্ঠা, পরিশ্রম, ডিসিপ্লিন সব জট পাকিয়ে গিয়েছিল মাথায়। মায়ের নামে এমআইএস, বাবার পেনশন আর একতলার ভাড়াটেদের ভাড়ার ভাগ নিয়ে হাঁটতে থাকা সংসারটা যেন হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছিল। উচ্চ মাধ্যমিক দিয়ে কলেজে বি এসসি পাস কোর্সে ভর্তি হয়েছিল রুহান। বুঝেছিল, আর কিছু হবে না ওর জীবনে। এবার যদি খেলে একটা চাকরি-বাকরি কিছু জোটে।

কিন্তু তাও তো জুটল না। এটা-ওটা হাবিজাবি কাজ করতে করতে কোত্থেকে যে বয়সটা তিরিশ ছুঁয়ে ফেলল কে জানে! তেমনভাবে কিছুই শেষ করা হল না রুহানের। এমনকী নন্দার সঙ্গে সম্পর্কটাও শেষ করা হল না।

আজ দূরে থেকে জয়নালের বোলিং দেখতে দেখতে খুব ভাল লাগল রুহানের। বহু দিন আগে শোনা বাবার কথাগুলো মনে পড়ে গেল আবার। মনে পড়ে গেল পরিশ্রম, ডিসিপ্লিন আর নিষ্ঠা। রুহান বুঝল জয়নাল ছেলেটির ভেতরে তিনটেই আছে। তবে কতদিন থাকে, সেটাই দেখার।

ডান পা-টা প্লাস্টিকের নিচু টুলটার ওপর থেকে মাঠের ওপর নামিয়ে পিছনে ঘুরল রুহান। আঃ, ব্যথা লাগল। ব্যথাটা গিয়েও যাচ্ছে না। এখনও ভোগাচ্ছে। পা ফেলতে, টানতে কষ্ট হচ্ছে। দৌড়নো তো দূরের কথা। কবে ভাল করে হাঁটতে পারবে কে জানে! আদৌ পারবে তো কোনওদিন?

হঠাৎ খুব অসহায় লাগল রুহানের। কলকাতায় একজন মানুষও নেই যার কাছে গিয়ে নিজের কষ্টের কথা, যন্ত্রণার কথা বলতে পারে! আর যে ছিল সে তো কলকাতায় থাকে না এখন। তীব্র এক কলঙ্ক নিয়ে সে তো মাথা নিচু করে চলে গেছে কলকাতা ছেড়ে। এখনও রুহান ওই নীল চোখ দুটো দেখতে পায়। এখনও নীল চোখ দুটো ওকে ভরসা জোগায়।

'কী রে শালা, এতদিন পর মাঠের কথা মনে এল?' নির্ভুলভাবে গলাটা চিনতে পারল রুহান। জগুদা।

ও আবার পিছনে ঘুরল, 'আরে জগুদা। কেমন আছ?'

'তুই কেমন আছিস বল! আর তোর হাঁটুটা?'

'এই আছে, স্লো রিকভারি হচ্ছে। কবে মাঠে নামতে পারব ভগবান জানে!'

'তা ভগবান তো সবই জানে। কিন্তু মুশকিল কী জানিস, ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে কোনও ইনফরমেশন শেয়ার করেন না। বহুত খিটকেল পাবলিক। ইনফরমেশন ইজ পাওয়ার, লোকটা জানে। তাই অন্যের হাতে দেয় না সেই পাওয়ার। পাছে তার গুরুত্ব হারায়!' জগুদা হাসল।

সাদা টি-শার্ট আর প্যান্ট পরা মানুষটার মুখটা ভাল করে দেখল রুহান। না, এগারো বছরে, মাথায় চুলের রঙের চেয়ে আর বেশি কিছু পাল্টায়নি। জগুদা রয়েছে জগুদাতেই।

কলেজের ফার্স্ট ইয়ারেই কলেজ টিমে চান্স পেয়ে গিয়েছিল রুহান। তার আগে লেকের মাঠে একটা ছোট্ট কোচিং সেন্টারে ক্রিকেটটা শিখত ও। কলেজের ট্রায়ালে ওই শেখাটা কাজে লেগেছিল।

ফাস্ট বল করত রুহান। খুব বেশি লম্বা নয় ও। এই পাঁচ ফুট সাত আর কী। তাই কলেজের ট্রায়ালে বল হাতে লম্বা রান-আপ নিচ্ছিল যখন, স্যার অবাক হয়েছিলেন, 'তুমি মিডিয়াম পেসার?'

'না স্যার, আমি ফাস্ট বল করি।'

ট্রায়ালে কলেজের নামকরা এক সিনিয়র ব্যাট্সম্যানকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল রুহান। তবে সে রাগ করেনি। এগিয়ে এসে বলেছিল, 'তোর ল্যাটেরাল মুভমেন্ট খুব ভাল তো! তা আমাদের এখানে তো ঠা ঠা পোড়া রোদে সারাদিন খেলা হয়। এই পেসে বল করে যেতে পারবি তো?'

তা পারত রুহান। ওটাই একমাত্র পারত ও। ওই লাল চেরি ফলের মতো বলটা নিয়ে যখন বোলিং রান-আপ থেকে দৌড় শুরু করত, মনে হত এটাই ওর জীবন। বলের সেলাইয়ের ওপর আঙুল দিয়ে গ্রিপ করে ভাবত, এভাবে, ঠিক এভাবেই ও ধরতে চায় জীবনকে। তারপর সামনে দাঁড়ানো ব্যাট্সম্যানের দিকে বলটা করার সময় ও ওর সমস্ত ব্যর্থতা, অপমান আর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা ভরে দিত বলটার মধ্যে। চেরি ফলটা রুহানের হাত থেকে বেরোবার পরে পাল্টে যেত উত্তপ্ত লোহার গোলায়।

এমনই একটা সময়ে কলকাতার একটা নামকরা কলেজের সঙ্গে খেলা ছিল ওদের কলেজের। প্রথমে ব্যাট করে রুহানদের কলেজ খুব অল্প রানে গুটিয়ে গিয়েছিল। লাঞ্চ ব্রেকের সময় সব প্লেয়াররা মাথা নিচু করে বসেছিল

শামিয়ানার নীচে। সেমিফাইনাল ছিল ম্যাচটা। হারলে ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা শেষ। স্যার বলেছিলেন, পরের বছরে আবার চেষ্টা করা যাবে। কেউ যেন মনখারাপ না করে।

পরের বছর, পরের বার। সব পরে। মাকে মাংস করতে বললে মা বলে পরের রোববার। জুতো ছিঁড়ে গেছে বললে, পরের মাসে কেনার কথা বলে। কলেজ থেকে ঘুরতে যাওয়ার কথা হলে মা বলে, এবার না, পরের বার। সব পরে হবে। এই বারের জন্য কিচ্ছু নয়! এই জীবনের জন্য কিচ্ছু নয়! তাহলে এই জীবন কীসের জন্য? মাসের পর মাস নিরামিষ ঘাসপাতা চিবোনোর জন্য? ছেঁড়া জুতো পরে হাঁটার জন্য? কলেজের বন্ধুদের ঘুরতে যাওয়ার সময় স্টেশন অবধি পৌঁছে দেওয়ার জন্য? অন্যের সাফল্যে হাততালি দেওয়ার জন্য? এ জন্ম শুধু হাসি মুখে কখন পরের বার আসবে তার অপেক্ষায় থাকার জন্য?

স্যার বলেছিলেন, পরের বার হবে। বলেছিলেন, দুঃখ না করতে। মনখারাপ না করতে। বলেছিলেন, সব বার সবাই পারে না। পরের বার চেষ্টা করা যাবে। মাথা ঠান্ডা রাখতে বলেছিলেন স্যার।

প্রথম ওভারের প্রথম চারটে বলে চারটে চার খেয়েছিল রুহান। তার পরের বল দুটো ব্যাট্‌সম্যানের শরীর লক্ষ্য করে করেছিল। রান হয়নি। ব্যাট্‌সম্যানটি ওভারের শেষে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিল, 'উই উইল ক্রাশ ইউ। দশ ওভারে খেলা শেষ করে দেব।'

'মানে?' টুপি হাতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল রুহান।

'শালা, মানে বোঝো না? দেব এবার তোদের।' ব্যাট্‌সম্যান ছেলেটি হাত দিয়ে অশালীন ইঙ্গিত করেছিল।

রুহানের সারা শরীরের রক্ত জমাট বেঁধেছিল মাথায়। ও একদৃষ্টে তাকিয়েছিল ব্যাট হাতে ছেলেটির দিকে। গণ্ডগোল এড়ানোর জন্য রুহানের টিমের একজন সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল রুহানকে।

ডিপ থার্ডম্যানে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসছিল রুহান। খেলায় হার-জিত আছেই, তা বলে এভাবে বলবে? কাছেই রুহানদের টিমের শামিয়ানা টাঙানো ছিল। রুহানকে বাউন্ডারি লাইনে এসে দাঁড়াতে দেখে স্যার এসে দাঁড়িয়েছিলেন কাছে। বলেছিলেন, 'মাথা গরম করছিস কেন? যে যা বলছে বলুক। কান দিবি না। এবার না-ই পারলাম জিততে। পরের বার না হয় জিতব।'

পরের বার! কেন সব কিছু পরের বার হবে? রুহান চোয়াল শক্ত করে নিয়েছিল।

বল হাতে নিজের দ্বিতীয় ওভার করতে যাওয়ার সময় একবার আকাশের দিকে তাকিয়েছিল রুহান। বিবেকানন্দ পার্কের পাশের বড় বড় গাছগুলোর মাথার ওপর সূর্যটা নতুন মোহরের মতো চকচক করছিল। লেকের দিক থেকে কোনাকুনি হাওয়া বইছিল একটা। বিকেলবেলার ভিড় ধীরে ধীরে বাড়ছিল মাঠের পাশে।

বলটা হাতে নিয়ে দৌড়নোর সময় রুহানের মনে হয়েছিল পরের বার বলে কিছু নেই এ-জীবনে। আসলে একটাই জীবন। একটাই সুযোগ। ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ।

পপিং ক্রিজের কাছে গিয়ে লাফিয়ে উঠেছিল রুহান। না হওয়া থেকে হওয়ার দিকে ছিল সেই লাফ। মাটি থেকে সূর্যের দিকে ছিল সেই লাফ। পরের বারের থেকে এবারের দিকে ছিল সেই লাফ।

একা ছ'টা উইকেট নিয়ে বিপক্ষকে একরকম ধ্বংস করে দিয়েছিল রুহান। ম্যাচ শেষে স্যার জড়িয়ে ধরলে রুহান বলেছিল, 'স্যার, পরের বার বলে কিছু হয় না। যা করতে হবে এবার করতে হবে।'

ফাইনালেও পাঁচ উইকেট নিয়ে টিমটাকে জিতিয়েছিল রুহান। ম্যান অফ দ্য ম্যাচের হাজার টাকা নিয়ে কিট গুছিয়ে যখন মাঠের বাইরে বেরিয়ে আসছে ঠিক তখনই একজন লম্বা দোহারা চেহারার মানুষ এসে দাঁড়িয়েছিল ওর সামনে। ডান হাতটা বাড়িয়ে হেসে বলেছিল, 'হ্যালো, আজ খুব ভাল খেলেছ। আমার দারুণ লেগেছে। তুমি কি কোনও ক্লাবে খেলো?'

'আমি?' লোকটির সঙ্গে হাত মিলিয়ে অবাক গলায় জিজ্ঞেস করেছিল রুহান।

'হ্যাঁ, তুমি, খেল নাকি অন্য কোনও ক্লাবে?'

'না, মানে, তেমন কিছু নয়। এক জায়গায় জাস্ট প্র্যাকটিস করি।'

'তা খেলবে আমাদের ক্লাবে?'

'আপনাদের ক্লাবে?' রুহান কী বলবে বুঝতে পারছিল না।

'হ্যাঁ, স্টার ইউনিয়ন।'

'আপনি কে বলুন তো?'

লোকটি হেসেছিল খুব। তামাটে লম্বা মুখটায় বাচ্চাদের মতো আনন্দ দেখেছিল রুহান। লোকটি বলেছিল, 'আমার নাম জগন্ময় মিত্র। তবে ময়দানে সবাই আমায় জগুদা বলে।'

'তা রুহান, এতদিন মাঠে আসিসনি কেন রে?' জগুদা জিজ্ঞেস করল।

'এই হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। তার ওপর মায়ের শরীরটা এত খারাপ ছিল যে, বাড়ি থেকে বেরোতেই পারিনি। জানোই তো, মায়ের বাতের ব্যাপারটা এমন হয় যে...'

জগুদা মাথা নাড়ল। পকেট থেকে সিগারেট বের করে বলল, 'তা অফিস করছিস তো? নাকি সেখানেও ডুব দিয়েছিস?'

রুহান মাথা নিচু করল। গত দশ দিন অফিস যেতে পারেনি। একদম, কোনও কিছু না জানিয়েই যায়নি। তবে একবার অফিসে ফোন করেছিল মাত্র।

জগুদা সিগারেটটা ধরিয়ে অনেকখানি ধোঁয়া বুকের ভেতর নিল। চোখ বন্ধ করে ধোঁয়াটাকে ধরে রাখল খানিক। তারপর বলল, 'এমন চিরক্যালানে হয়ে থাকলে চলবে? দেখ, সুখেনদা তোকে এই চাকরিটা দিয়েছেন। জানি খুব সামান্য কাজ। তবু এ বাজারে চাকরি তো! তা, সেখানেও লাফড়া করছিস! যে-রুহানকে প্রথম খেলার মাঠে দেখেছিলাম, সেই ছেলেটা কোথায় গেল? তোর কী হয়েছে বল তো? জানিস তো তোদের কোম্পানির অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। তার ওপর এমন কামাই করলে কিন্তু বিপদে পড়বি।'

রুহান জানে কোম্পানি খুব একটা ভাল চলছে না। ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ সুখেন বোস রুহানকে পছন্দ করেন। গত বছর একটা ক্যুরিয়র কোম্পানি থেকে চাকরি গিয়েছিল রুহানের। তখন সুখেনদাই এই কনসালটেন্সি ফার্মে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ওকে।

এই কোম্পানিটা বড় বড় স্টিল ফ্যাক্টরির কনসালটেন্সি করে। কিন্তু এই বাজারে অনেক কোম্পানির মতো রুহানদের ফার্মেরও অবস্থা ভাল নয়। গত মাসেই চারজনকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই জগুদা ঠিকই বলছে। রুহানের হঠাৎ গা শিরশির করে উঠল।

জগুদা বলল, 'আচ্ছা আগে তো তুই খেলার মাঠে অন্তত চাগিয়ে থাকতি। গত মরশুমের থেকে দেখছি মাঠেও তোর কেমন ঢিলে অবস্থা। কেন বল তো?'

মাথা নামাল রুহান। কী যে বলবে ও! সব কথা কি আর জগুদাকে বলা যায়! নিজের অন্যায়ের কথা আর বলে কী করে ও?

রুহান হাসল, 'এই বাড়ির নানা সমস্যা। চাকরির চাপ। তার ওপর ইনজুরি। আর মন ভাল থাকে, বলো? আর তো প্রথম টিমেও চান্স পাই না।'

'খেলিস আর মন দিয়ে? যে, পাবি!' জগুদা রাগের গলায় বলল, 'যখন তোকে প্রথম দেখেছিলাম কী বল করতিস! বড় একটা জুতোর কোম্পানিতে চাকরিও তো পেলি। কিন্তু রাখতে পারলি কাজটা! জুতোর সোলগুলো টিফিন বাক্সে লুকিয়ে কেন বাইরে আসতে গিয়েছিলি তুই? চাকরিটা খোয়ালি। স্টারও তোকে লাথি মেরে বের করে দিত, যদি না সুখেনদা তোকে বাঁচাতেন। তুই এমন চুরি-ছ্যাঁচড়ামো করবি ভাবিনি কোনওদিন।'

'ও, সেই কথা তুমি এখনও তুলছ!' রুহানের খারাপ লাগল, 'টিফিন বাক্সটা আমার ছিল না জগুদা। অন্য একজনের ছিল। তার ডাবল শিফ্‌ট ডিউটি ছিল বলে বলেছিল যে, বাড়ি যাওয়ার পথে যেন টিফিন বক্সটা বাড়িতে দিয়ে যাই। আমি কী করে জানব ওর ভেতর দিয়ে জুতোর সোল বাইরে পাচার করছে?'

'আরে সে তো তুই সবসময় বলিস। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে? তুই গাধা বলে তোর এই দশা!'

'তা বলে তুমি এমন বলবে?' রুহানের গলাটা বুজে এল।

জগুদা সিগারেটটা শেষ করে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষল। তারপর বলল, 'যাক গে, সবাই কী ভাবল গুলি মার। এই চাকরিটা ভাল করে করিস আর পায়ের যত্ন নিস। না হলে কষ্ট বাড়বে। আরও এক-দু' বছর খেলা আছে তোর।'

জগুদা চলে গেল নেটের অন্য দিকে। প্লাস্টিকের চেয়ার টেনে বসল রুহান। সাড়ে দশটা বাজে। আজ ও ক্লাবে এসেছে মূলত ব্রজদার ডাকে। ব্রজদা ক্লাবেরই এক কর্মকর্তা। গতকাল ফোন করেছিল রুহানকে। বলেছিল একটু দরকার আছে। যেন দেখা করে।

ব্রজদা হল সেই ধরনের মানুষ যে, নিজের যে-কোনও কাজে অন্যকে ভিড়িয়ে নিতে পারে। কিন্তু রুহান বুঝছে না ও কী কাজ করে দিতে পারে। ব্রজদাকে মনে মনে খুব একটা পছন্দ করে না রুহান। কিন্তু গত চার মাস ক্লাবের থেকে কোনও টাকা পায়নি। মাসে চার হাজার টাকা করে ক্লাব দেয় রুহানকে। অন্যরা অনেক বেশি পেলেও রুহান যা পায় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। ভাবে, সত্যিই তো কী আর এমন খেলছে যে, বেশি টাকা পাবে! ক্লাব এই যে দেয়, এটাই বেশি।

আজ আগস্টের শেষ দিন। ওদের অফিসে দু'ধাপে মাইনে হয়। চোদ্দো তারিখ আর একত্রিশ তারিখ। আজ এখান থেকে কাকিমার বাপের বাড়ি যাবে একবার তারপর অফিসে ঢুঁ মারবে। মাইনেটা নিতে হবে তো।

'কী রে, কতক্ষণ এসেছিস?' পিছন থেকে ব্রজদার গলা পেল রুহান।

ও ঘুরে দাঁড়াল, 'এই তো খানিকক্ষণ।'

'তা, কী খবর তোর? টাকাপয়সা লাগবে না? চার মাস পেমেন্ট পাসনি তো?'

অবাক হল রুহান। ভূতের মুখে রাম নাম! ব্রজদার ধান্দাটা কী?

ব্রজদা বলল, 'হ্যাঁ রে, তোর পা কেমন আছে? ক'দিনে সেরে উঠবি মনে হয়?'

রুহান মাথা নাড়ল, 'জানি না ব্রজদা, ফিজিওথেরাপি করাচ্ছি, দেখি কী হয়?'

'আচ্ছা শোন', ব্রজদা একটা লাল প্লাস্টিকের চেয়ার টেনে এনে সামনে রাখল, 'তোর সেই বন্ধুটির খবর কী বল তো?'

'কোন বন্ধু? আবেশ?' রুহান জানতে চাইল।

আবেশ গোস্বামী, রুহানের কলেজবেলার বন্ধু। খেলাধুলোয় যথেষ্ট আগ্রহ আছে ওর। রুহানের সঙ্গে মাঠেও এসেছে বেশ কয়েকবার। আর নিজের অদ্ভুত মিশতে পারার গুণে সবার সঙ্গে আলাপও করে গেছে।

'ওই যে ফরসা, খুব সুন্দর দেখতে। খাড়া নাক। আরে বুঝতে পারছিস না? আচ্ছা গাধা তো তুই! ওই যে রে তোর বন্ধুটা। যার নীল রঙের চোখ!'

'ও!' রুহান চোয়াল শক্ত করল। খুব অপ্রিয় একটা বিষয় ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

'কোথায় রে ছেলেটা? একদিন তো মাঠে নিয়ে এসেছিলি। হ্যাঁ রে, ও তো ব্রাহ্মণের ছেলে। বিয়ে করবে না? যত দূর মনে পড়ে ওর সঙ্গে আলাপের পর জানতে পেরেছিলাম যে, বিয়ে হয়নি। কী রে, ও বিয়ে করবে?'

'অ্যাঁ?' ঘাবড়ে গেল রুহান, 'তা আমি বলব কী করে?'

'তোর বন্ধু, তুই জানিস না?'

'বন্ধু ঠিক নয়। আমার চেয়ে প্রায় তিন বছরের বড়। তবে ও আর কলকাতায় নেই। ওসব চিন্তা ছাড়ো ব্রজদা। ওর কেস প্রচুর খিটকেল।'

'যাঃ!' ব্রজদা মাথা নাড়ল, 'শালা, আমার কপালটাই খারাপ।'

ব্রজদার তিন রকমের ব্যবসা আছে। মিষ্টির দোকান, ট্রাভেল এজেন্সি আর বিবাহ বন্ধনীর অফিস। তিনটে ব্যবসাই ভাল চলে। তবু ব্রজদার কথায় কথায় কপাল খারাপের ব্যাখ্যাটা ঠিক বোঝে না রুহান।

'বাদ দে,' ব্রজদা পকেট থেকে রুমাল বের করে তালের মতো মুখটা মুছল, 'ওঃ, শালা পচা ভাদুরে গরম। যা অবস্থা না! তা শোন না, তোর কাকার ডেকরেটিংয়ের ব্যবসা আছে না?'

'আছে।' রুহান বলল, 'কাকার তো ওটাই ব্যবসা। তা কোনও বিয়ে-ফিয়ে আছে নাকি?'

'ক্যালানে নাকি? ভাদ্র মাসে বিয়ে? আমার ছোট ভাই, লেক গার্ডেন্সেই থাকে। ছেলের জন্মদিন। সেপ্টেম্বরের দশ তারিখ। প্যান্ডেল-ফ্যান্ডেলগুলো করে দিতে হবে। কী, পারবি তো? খুব ইম্পটান্ট কাজ কিন্তু!'

'তা এত ডেকরেটার থাকতে আমায় কেন?'

'সামনে পুজো সবাই বাঁশ-ত্রিপল অন্য জায়গায় ইউজ করে ফেলেছে। তাই তোকে বললাম, ডোবাসনি ভাই! প্রেস্টিজ প্যাংচার হয়ে যাবে।'

রুহান বলল, 'আরে আমি কী করতে পারি বলো? কাকাকে বলি। দেখি, যদি কাকা পারে। তা বাড়ি ভাড়া নিলেই তো মিটে যায়।'

'তুই তো ওখানেই থাকিস! ভেতর দিয়ে লর্ডসের মোড়ের দিকে যেতে হলে একটা মাঠমতো পড়ে না? তার পাশের বিরাট বড় বাড়িটাই তো ভাইয়ের। মানে ভাইয়ের ঠিক নয়। ওর শ্বশুরের। ভদ্রলোক মারা যাওয়াতে একমাত্র মেয়েকে সব দিয়ে গেছেন। শাশুড়ি তো আগেই ছিল না। ফলে এখন ভাইয়ের একচ্ছত্র রাজত্ব। ভেতরে একটা লন আছে। দেখলে চোখ ট্যারা হয়ে যাবে। শালা, আমার যদি এমন এক পিস শ্বশুর থাকত!' ব্রজদা এমন মুখ করল যেন পারলে এখনই একটা অমন শ্বশুর ধরে আনে।

ব্রজদা আবার বলল, 'শ্বশুরের টাকায় বড়লোক হওয়ার যে কী মজা, কী করে তুই বুঝবি?'

কথাটার ভেতরের বিদ্যুৎটা আলতো করে রুহানের বুকটা ছুঁল আর তার ফলে আঁতকে উঠল ও। শ্বশুরের পয়সায় বড়লোক? ও যত এইসব থেকে পালাতে চায় ততই যেন এই প্রসঙ্গ ধাওয়া করে ওকে। চেপে ধরে।

রুহান নিজে কষ্টের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে বলল, 'যাক গে, বাদ দাও। কাকাকে বলছি, দেখি যদি পারি।'

'দেখি বললে তো হবে না। কাজটা করে দিতে হবে। বাড়ির ভেতরের লনে শামিয়ানা টাঙিয়ে প্যান্ডেল হবে। তুই নিজে যাবি কিন্তু।'

'আমি?' রুহান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

ব্রজদা হাসল, 'শোন, এটা তুই যেভাবেই হোক কর। আমি ভাইকে কথা দিয়ে দিয়েছি। আর না করিস না। তাছাড়া...'

'কী তাছাড়া?' অবাক হল রুহান।

'চার মাসের বকেয়া পেমেন্টের সঙ্গে এক মাসের বোনাসও দিয়ে দেব। বুঝলি? কিন্তু অনুষ্ঠানের পর। আগে নয়।'

বোনাস? ব্রজদার কথাটা খট্ করে কানে লাগল রুহানের। হঠাৎ বোনাস? ও তো খেলতে পারছে না। এমন যদি হত যে, দারুণ খেলে টিমকে জিতিয়েছে তাহলে কর্মকর্তারা বোনাসের কথা বলে। এখানে তো তেমন ব্যাপার নেই। চার মাসের টাকা ওর প্রাপ্য, বোনাসটা ভাল শোনাচ্ছে না। কাজটা করার পরিবর্তে টাকা! একটা সূক্ষ্ম অপমান লাগছে রুহানের। অবশ্য এমন টুকটাক অপমান এখন অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে রুহানের। বাইরের লোক তো বাইরের লোক, মা নিজেই কত কথা শোনায়!

আগে কিন্তু মা এমন ছিল না। বরং শান্তশিষ্টই ছিল। রুহানের সব ব্যাপারে খেয়াল রাখত। ইদানীং ব্যাপারটা আর তেমন নেই। বিশেষ করে গত এক বছর ধরে মা যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। সবসময় তেতো মুখে ঘুরে বেড়ায়। হয় কী নয় রুহানকে যা নয় তাই বলে অপমান করে। বাবার মৃত্যুর এত বছর পর মায়ের হঠাৎ মনে হয়েছে যে, বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী রুহান। কেন মনে হয়েছে ও জানে না, কিন্তু আজকাল হয় কী নয় মা বলে, 'তোর বাবা বেঁচে থাকলে আমায় কি এমন দিন দেখতে হত? তোর জন্য, শুধু তোর জন্য তোর বাবা আজ নেই।'

আসলে বাবার পেনশন, ভাগের বাড়ি ভাড়া আর রুহানের সামান্য রোজগারে সংসার চালাতে মায়ের কষ্ট হয়। এটা রুহান বোঝে আর এটাও বোঝে যে, পাশাপাশি ককাইয়ের ব্যবসায় গত এক বছর যাবৎ উন্নতি হয়েছে বেশ। ককাইয়ের ছেলে রাজাও ভাল চাকরি পেয়ে বিদেশ চলে গেছে। কম্পিটিশন, মা কম্পিটিশনে কোথায় জানি হেরে যাচ্ছে বলে মনে হয় রুহানের। আর তাই তার শোধ তোলে রুহানের ওপর।

আসলে ককাইয়ের প্রথম জীবনে বাবা প্রচুর করেছে ককাইয়ের জন্য। পড়াশোনোয় ভাল ছিল না ককাই। ফেলটেলও করেছে কয়েকবার। বিএ-

টাও কমপ্লিট করেনি। তখন বাবাই টাকাপয়সা দিয়ে এই ডেকরেটিংয়ের ব্যবসাটা শুরু করায় ককাইকে।

কিন্তু সব শুরুই তো কারও না কারও হাত ধরেই হয়। ককাইয়েরও হয়েছে। তা বলে সারা জীবন কি তার পায়ে মাথা ঠেকাতে হবে নাকি? তাও ককাই আর কাকিমা অনেক করে রুহানদের জন্য। আর প্রায় সবসময় বলে যে, 'দাদা না থাকলে আমাদের যে কী হত।'

রুহান ভাবে আর কী করতে পারে ককাই? মাথাটা কেটে তো আর মায়ের পায়ে রাখতে পারে না। আর বাবা ব্যবসা শুরু করিয়ে দিলেও এখনকার এই সাফল্যের কৃতিত্ব গোটাটাই ককাইয়ের নিজের।

আর কোথায় যেন এটাই ঠিক মানতে পারে না মা। রুহান দেখে কীরকম ভাবে পদে পদে ককাই আর কাকিমার দোষ ধরে মা। রুহানের বিরক্ত লাগে। মাঝে মাঝে লজ্জাও। মাকে বলেও সে কথা। কিন্তু মা আমলই দেয় না। বরং উল্টে রুহানকে বলে, 'তোকে অত ওদের ধামা ধরতে হবে না। জানিস তো না কীভাবে তোর বাবার টাকার শ্রাদ্ধ করেছে ওরা। আর আমাকেই এখন ভিক্ষে করতে হচ্ছে।'

ভিক্ষে মোটেও করতে হয় না মাকে। রুহান জানে এখন মায়ের বাড়িয়ে বলা স্বভাব হয়েছে। কিন্তু সেটাকে যে কীভাবে রুহান সামলাবে তা ঠিক বুঝতে পারে না। তা মায়ের খারাপ ব্যবহারটাকে সামাল দেওয়ার জন্য ককাই আর কাকিমার ফাইফরমাস খেটে দেয় রুহান।

এই আজই তো একটা কাজ নিয়ে বেরিয়েছে কাকিমার। এখন মাঠ থেকে যেতে হবে নিউ মার্কেটের ওখানে। কাকিমার বাপের বাড়িতে। তবে এই ব্যাপারটা মা জানে না। জানলে অশান্তির শেষ রাখবে না। কাকিমা'ও তাই প্রথমে রুহানকে যেতে বলেও পরমুহূর্তে নিষেধ করেছিল। বলেছিল, 'রুহান, তুই যাস না। দিদি জানলে আবার অশান্তি করবে।'

রুহান হেসেছিল, 'বাদ দাও তো। আর জানবে কেমন করে? তুমিও বলবে না, আমিও বলব না। ফলে সব ঠিক আছে।'

কাকিমা বলেছিল, 'আসলে বুকুটা এতদিন পরে বিদেশ থেকে ফিরল। তাই ওর জন্য ছানাভাপা করেছিলাম।'

'তুমি দাও না, আমি দিয়ে আসব।' রুহান একরকম জোর করেই টিফিন বাক্সটা কেড়ে নিয়েছিল কাকিমার কাছ থেকে।

কাকিমার প্রেশারটা বেড়েছে কিছুদিন হল। গত পরশু তো পড়েও গিয়েছিল। ডাক্তার বলছে কমপ্লিট বেড রেস্ট। কিন্তু কোনও মহিলা কবে ডাক্তারের কথা শুনেছে? কাকিমাও শোনেনি। বরং নিজের খুড়তুতো ভাইটির জন্য রান্না করেছে নিজে।

খুড়তুতো ভাই বুকু। মানে বুকুদা। পুরো নাম বিনয়কৃষ্ণ বোস। প্রায় সারা জীবনই হস্টেলে হস্টেলে কাটিয়েছে বকুদা। তবে ছুটিছাটায় কলকাতায় এলে খুব আসত রুহানদের বাড়ি। তখন খুব আড্ডা দিত, ইয়ার্কি মারত রুহানের সঙ্গে। এমনকী পাড়ায় ক্রিকেটও খেলত। রুহান খুব ভক্ত ছিল বুকুদার। তবে একসময় আসা বন্ধ করে দেয় বুকুদা। তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে, ম্যানেজমেন্ট পাশ করে সোজা বিদেশে চলে গিয়েছিল। মাঝখানে শুধু একবার এসে বিয়ে করে আবার চলে গিয়েছিল বউ সমেত। না, বিয়েতে যেতে পারেনি রুহান। তখন খেলতে অসম গিয়েছিল। তবে ফিরে এসে কাকিমার কাছে গল্প শুনেছিল বিয়ের। বর-বউয়ের ছবিও দেখেছিল। খুব মিষ্টি দেখতে বুকুদার বউকে। নামটাও খুব অদ্ভুত। জিয়ানা। নামের অর্থ কী কে জানে! বিয়ের পরে বিদেশ চলে গেলেও প্রথম প্রথম দু'বছর অন্তর মাসখানেকের জন্য আসত বুকুদা। তবে রুহানদের বাড়িতে আসত না। কাকিমা দেখা করতে যেত আর গল্প বলত এসে। বুকুদার সব ব্যাপারেই মুগ্ধ কাকিমা খুব প্রশংসা করত ওদের। তারপর বিয়ের পাঁচ বছরের মাথায় রুহান শুনল একটা মেয়ে হয়েছে বুকুদার। আর তারপরই বন্ধ হয়ে গেল বুকুদার আসা। কাকিমা বলত, 'চাপ, খুব কাজের চাপ। বুকু উন্নতি করছে খুব।' বলত, 'বুকুর বউটাও খুব ভাল হয়েছে, কেমিস্ট্রিতে মাস্টার্স করেছে। চাকরিও পেয়েছে ওখানে। ওরা একদম মেড ফর ইচ আদার। আচ্ছা, রুহান তুই বিয়ে করছিস না কেন রে? সারা জীবন এমনই থাকবি?'

রুহান হাসত কাকিমার কথায়। কিচ্ছু বলত না। কার কথা বলবে? কী কথা বলবে? ওর রোজগারে বিয়ে করা যায় নাকি এই বাজারে? তাছাড়া নন্দার ব্যাপারটা তো এখনও...

কত বছর হল বুকুদার বিয়ের? তা প্রায় আট-ন' বছর তো হবেই। বহু বহু দিন পরে আজ বুকুদার বাড়িতে যাবে রুহান। বুকুদার সামনে দাঁড়াবে। কিন্তু আড্ডা হবে কি? না, হবে না। রুহান জানে আড্ডা হবে না একদম। আচ্ছা, বুকুদা চিনতে পারবে তো ওকে? সেই কুড়ি-একুশ বছর বয়সের বুকুদা এখন চল্লিশ। কোথা দিয়ে কেটে গেল দু'দশক? সম্পর্ককে কীভাবে চিরে দিয়ে চলে যায় সময়?

বুকুদা এখানেও খুব বড় চাকরি নিয়ে এসেছে। একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির পঁচিশ-তিরিশ তলা মতো উঁচু পোস্টে আছে। কাকিমার কাছে ছবি দেখেছে বুকুদার। কাঁচা-পাকা চুল। মোটা গোঁফ। সেই পাতলা দোহারা ছেলেটার জায়গায় এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে মোটাসোটা একটা মানুষ। শুধু ঠোঁটের তিলটা একইরকম রয়ে গেছে।

আজ বুকুদার ছুটি। কে জানে কেন ছুটি নিয়েছে! রুহান শুনেছে বুকুদার বউও বড় চাকরি করে এখন। তবে যেহেতু এদিকে আসেনি কোনওদিন, রুহানের সঙ্গেও আলাপ নেই। আজ দেখা যাক আলাপ হয় কিনা।

পায়ের চোটটা ভালই রয়েছে। আজ আর এই অফিস টাইমের ভিড় ঠেঙাতে পারবে না। ক্লাব থেকে বেরিয়েই রুহান ট্যাক্সি ধরল একটা। আজকাল অল্প দূরত্ব হলেও ট্যাক্সিওয়ালারা 'না' করে না। তাছাড়া নিউ মার্কেট চত্বর থেকে নতুন ভাড়া পেতেও সমস্যা হবে না।

কাকিমাদের বাপের বাড়িটা পুরনো হলেও এখনও একটুও জীর্ণ হয়নি। কাকিমার বাবারা চার ভাই। চারজনের জন্য চারটে তলা বরাদ্দ। বুকুদার বাবা নেই। মা আছে। তবে প্যারালিসিস হয়ে গেছে এক দিকে। সঙ্গে সর্বক্ষণের আয়া থাকে। এ বাড়িতেই এসে উঠেছে বুকুদারা। রুহান শুনেছে যে, বুকুদা কোম্পানি থেকে একটা এলাহি ফ্ল্যাট পেয়েছে নিউটাউনে। কিন্তু যায়নি। কারণ জিয়ানার কষ্ট হবে নিউটাউন থেকে ক্যামাক স্ট্রিটে ওর অফিসে রোজ যাতায়াত করতে। তাছাড়া বুকুদার মেয়েকেও নামকরা একটা স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে যেটা এই বাড়ি থেকে বেশ কাছে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে বুকটা একটু কাঁপল রুহানের। কেন কাঁপল? বহু দিন পরে বুকুদার সামনে দাঁড়াবে বলে? নাকি এমনি এমনি, রুহানের যেমন আচমকা ভয় লাগে, তেমনই হচ্ছে?

বাড়িটা উঁচু। কাঠের সিঁড়ি বসানো। একতলা থেকে আর-এক তলায় উঠতে প্রায় দু'সপ্তাহ সময় লাগার মতো অবস্থা হয়। সিলিং দেখলে মনে হয় কোনও ঐতিহাসিক মনুমেন্টের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। তবে বাড়ি দেখলে বোঝা যায় যে, কাকিমার বাপের বাড়ির অবস্থা খুবই ভাল। নেহাত ককাইয়ের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে, না হলে ওদের মতো বাড়িতে কাকিমার জীবন কাটে নাকি? কিন্তু কাকিমার কোনও অহঙ্কার নেই। রাগ নেই। সবসময় হাসিখুশি।

বাড়ির একতলায় কাকিমার বাবা-মা থাকেন। প্রথমে সেখানেই গেল রুহান। দরজা খুলল কাকিমার মা নিজে, 'আরে রুহান। আয় আয়।'

রুহান পায়ের স্যান্ডেলটা খুলে ভেতরে

ঢুকল, 'দিদা, কাকিমা ফোন করে বলেনি যে, আমি আসব?'

'আরে ল্যান্ডলাইন খারাপ, মোবাইলেও চার্জ নেই। কী যে বিপদে পড়েছি! তবে খেয়া গতকাল বলেছিল যে, তুই আসবি। কিন্তু কখন সেটা বলেনি। তা খেয়ে এসেছিস? এখানে দুপুরে ভাত খেয়ে যাবি কিন্তু।'

'না দিদা, আমায় খুব তাড়াতাড়ি অফিস যেতে হবে। এই ছানাভাপাটা বুকুদাকে পৌঁছে দিয়েই কাটব।'

'তুই অফিস শুরু করেছিস নাকি? পা ভাল হয়ে গেছে? খেলতে গিয়ে এমন চোট পেলি!' দিদা প্রশ্ন করল।

'পা, পুরো সারেনি। তবে মায়ের শরীর খারাপ ছিল বলেও যেতে পারিনি। তা আজ মাইনে হবে, তাই...'

'ও,' দিদা বলল, 'শরীরটার যত্ন নিস রুহান। ক্রিকেট খুব কঠিন খেলা।'

রুহান হাসল। তা কি আর ও জানে না? খুব জানে, হাড়ে হাড়ে জানে।

রুহান বলল, 'দিদা আমি চট করে বুকুদাকে দিয়ে আসি টিফিন বাক্সটা। আচ্ছা, তোমার কি কিছু বলার আছে কাকিমাকে? থাকলে বলো আমি বলে দেব।'

দিদা হাসল, 'বলিস অনেকদিন আসে না এদিকে, একবার যেন আসে। রজতকে নিয়ে আসে।'

দিদার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এবার দোতলায় উঠতে হবে রুহানকে। হাঁটুটায় এখনও ব্যথা আছে অল্প। এই এভারেস্ট কীভাবে চড়বে ভাবল ও। তবে চড়তে হবেই। ধীরে ধীরে সিঁড়িগুলো ভেঙে ওপরে উঠল রুহান। ঘাম হচ্ছে বেশ। তবে সবটাই কিন্তু পরিশ্রমের জন্য নয়। টেনশন, আসলে ভীষণ টেনশন হচ্ছে রুহানের। এতগুলো বছর কেটে গেছে। কী জানি বুকুদা কতটা পাল্টে গেছে! একসময় তো চব্বিশ ঘণ্টা বকবক করে মাথা খেত সবার। মনে আছে ওদের বাড়িতে এলে বাবা বলত, 'বুকু, বোকো না।'

সেই বেশি কথা বলা, ইয়ার্কিবাজ ছেলেটা লোক হতে হতে কতটা পাল্টেছে কে জানে! আজও বুকুদার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার দিনটার কথা মনে আছে। মনে আছে বুকুদার সেই বিহ্বল দৃষ্টি। কতই বয়স তখন রুহানের? নয়, কি দশ। তবু আজও সব স্পষ্ট মনে আছে ওর।

সেই দিনের সেই বুকুদা আজ এত বছর পরের রুহানকে দেখে কী বলবে?

ডোরবেলটা টিপে নিজের মনকে স্টেডি করল রুহান। এই বয়সে এমন ব্যাপার নিয়ে নার্ভাস হওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। বেলের শব্দটা কেমন গির্জার ঘণ্টার মতো। মনে হচ্ছে যেন প্রার্থনা শুরুর সময় হল।

খুট শব্দে এক পাল্লার কফি রঙের দরজাটা একটু ফাঁক হল। রুহান বুঝল ডোর-চেন লাগানো আছে দরজায়। একটা ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ের মাথা দরজার ফাঁক দিয়ে বের হল। চোখে-মুখে জিজ্ঞাসা। আগে মেয়েটিকে দেখেনি রুহান।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কাকে চান?'

'বুকুদা আছে?'

'বুকুদা? ও দাদাকে খুঁজছেন? আপনি রুহানদাদা?' মেয়েটি হাসল।

আশ্চর্য হল রুহান। ওকে চিনল কী করে?

মেয়েটি দরজা বন্ধ করল দশ সেকেন্ডের জন্য, তারপর খুট করে ডোর-চেনটা খুলে দরজাটা খুলে দিল পুরো। বলল, 'আসুন, আমি জানতাম আপনি আসবেন।'

রুহান অবাক হয়ে মেয়েটিকে দেখল। এ বাড়িতে যে কাজ করে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটি দেখতে ভাল। পালিশ পড়লে সুন্দরী বলেও চালানো যায়। তা মেয়েটির কি কোনও অলৌকিক শক্তি রয়েছে? এভাবে মুখ দেখে সব গড়গড় করে বলে দিচ্ছে?

রুহান বোকার মতো হাসল, 'তুমি আমায় চেনো?'

'কেন? কাকিমা তো ফোন করে বলেছিল বউদিকে। বউদি তো বলল যে রুহান আসবে সকালে। তাই বুঝতে পেরেছি।'

রুহান বুঝল মেয়েটি একটু বেশি কথা বলে। অবশ্য এই বয়সে এটা হয়।

দরজা থেকে নরম কার্পেটে ঢাকা মেঝে। এই তলাটা এমন ছিল না আগে। ও বুঝল বুকুদা এসে পাল্টেছে এসব। জুতোটা কোথায় খুলবে বুঝতে পারে না রুহান। দামি কার্পেটের ওপরে ওর এই ধুলো মাখামাখি স্যান্ডলটা খুব বেমানান লাগল ওর। মেয়েটা হাসল, বলল, 'এই কোনাতেই ছেড়ে রাখুন। কিচ্ছু অসুবিধে নেই। ধুলো পড়ুক। আমার নাম কলি। আপনি সোফায় বসুন আমি ভেতরে খবর দিচ্ছি।'

বসার ঘরটা নতুন করে সাজানো হয়েছে। ওয়াল টু ওয়াল ক্যাবিনেট, পেল্লায় লেদারের সোফা, দেওয়ালে ঝোলানো পাঁউরুটির মতো চ্যাপ্টা টিভি, স্প্লিট এসি।

রুহান অদ্ভুত দেখতে গ্লাস-টপের সেন্টার টেবিলে খুব সাবধানে প্লাস্টিকে জড়ানো টিফিন বাক্সটা রাখল। এমন বাড়িতে ঢুকলে সবসময় খুব অস্বস্তি হয় রুহানের। মনে হয়, কী করবে ঠিক জানে না। ও ঘড়ি দেখল, প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। বারোটার ভেতর অফিস গেলে ভাল হত। ওই অবধি বস থাকে এই অফিসে। আরও দিন সাতেকের ছুটি লাগবে। রুহান জানে, পাওয়া কঠিন তবু চেষ্টা করবে। এখন ব্যাপারটা হল এখানে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে! আসলে কুড়ি বছর আগের বুকুদা যে আর তেমন নেই তা বুঝতে পারে ও। সেই পাজামা-পাঞ্জাবি আর ঝোলা নিয়ে চলে আসা মানুষটার এখনকার বাড়িঘর দেখেই তফাতটা করতে পারছে রুহান।

'কী রে হান? কেমন আছিস?'

প্রশ্নটা বিদ্যুতের মতো আছড়ে পড়ল রুহানের শরীরে। ও চকিতে উঠে দাঁড়াল। প্রায় কুড়ি বছর, তবু গলার স্বর একই আছে!

'বুকুদা...' রুহান অবাক হয়ে তাকাল। হুবহু ছবির মতো মানুষটা। শুধু পরনে টি-শার্ট আর থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট।

'আরে দাঁড়ালি কেন? বোস।' বুকু হাসল।

'হ্যাঁ...।' রুহান বসল। এসি চলছে তবু ঘাম হচ্ছে ওর।

'তারপর বল, কী করছিস হান?'

'আমি? এই কাকিমার থেকে এটা নিয়ে দিতে এলাম।' রুহান বুঝল ও ভুল বলছে।

'তাই, ক্যারিয়ারের কাজ করছিস?'

হাসল রুহান, 'চাকরি করি একটা। ছোটখাটো। তেমন সিরিয়াস কিছু নয়।'

'সিরিয়াস নয়?' হাসল বুকু, 'আসলে কিছুই সিরিয়াস নয়, বুঝলি?'

রুহান বুঝল, ওর মতো বুকুও কথা খুঁজে পাচ্ছে না। ও বলল, 'বুকুদা, এই টিফিন বাক্সটা রইল। আমি আসি গো। অফিসে দেরি হবে।'

'তাই? শিওর।' বুকু দাঁড়িয়ে পড়ল, 'অনেকদিন পর দেখা হল তোর সঙ্গে। আর এক দিন আসিস, জমিয়ে গল্প হবে।'

'আসব বুকুদা।'

'আনা আজ নেই। বাবার কাছে গেছে। তাই আলাপ হল না তোর সঙ্গে। পরে আসিস কিন্তু।'

'আসব।' রুহান হেসে দরজার দিকে এগোল।

'হান,' বুকু ডাকল পিছন থেকে।

রুহান দাঁড়াল, 'কী বুকুদা?'

'মা ভাল আছেন?'

'হ্যাঁ, তবে এই বয়সে যা হয়। একটু শরীর খারাপ থাকে।'

'আর...' বুকু ঠোঁট চাটল। ইতস্তত করল একটু। গোঁফে আঙুল বোলাল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'পাড়ার সব ভাল?'

রুহান এই প্রথম সত্যিকারের হাসল, 'আসি বুকুদা, আর একদিন এসে অনেক গল্প করব।'

'রুহানদা তুমি এখন এলে?' অফিসের করিডোরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ব্রত।

ছেলেটা রুহানের চেয়ে বেশ ছোট। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। রুহানের চেয়ে উঁচু পদেই আছে, কিন্তু তবু কখনও রুহানকে অসম্মান করে না বা নিজের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করে না। ছেলেটাকে ভাল লাগে রুহানের। এই পৃথিবীতে, যেখানে একে অন্যকে পিষে মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে চায়, সেখানে ব্রত অন্য রকম এক মানুষ। ভাল মানুষ।

রুহান একটু খোঁড়াল। খানিকটা ব্রতকে দেখানোর জন্যই যে, ও কত অসুস্থ এখনও। ওর খারাপ লাগল ব্রতর সামনে এমন মিথ্যাচার করতে, কিন্তু যে দশ দিন না আসে তাকে তো এমন একটু-আধটু অভিনয় করতেই হয়। খেলার ভাষায় ওরা বলে প্লে অ্যাক্টিং।

'কী হল? তোমার পায়ের চোটটা এখনও কমেনি, না?' ব্রতর গলায় দুঃখ।

'কী আর করব বল। এমন লাগল যে, প্রায় ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড বানিয়ে ছেড়েছে আমায়। দেখ না অফিসে পর্যন্ত আসতে পারছি না।'

ব্রত বলল, 'যাও, মাইতিদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে নাও।'

মাইতিদা অ্যাকাউন্টসে বসে। সারাদিন পান খায় আর কীসব যোগবিয়োগ করে। তবে মাসের দুটো মাইনের দিনে একটু কথাবার্তাও বলে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রুহান মাইতিদার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, মাইতিদা নিস্পৃহ গলায় বলল, 'তোমার মাইনে এখানে নেই। সাহেবের ঘরে।'

'অ্যাঁ! স্যার দেবেন?' ভীষণ অবাক হল রুহান, 'কেন?'

'কর্তার ইচ্ছেই কর্ম। আমি কীভাবে জানব কেন?'

রুহান পিছন ফিরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে স্যারের ঘরের দিকে এগোল। শুনল মাইতিদা নিজের মনে বলছে, 'আরে বাবা এটা কি স্কুল যে, একটু খুঁড়িয়ে হেঁটে দিলাম আর সব ঠিক হয়ে গেল? তাও যদি ঠিকমতো খোঁড়াত। আসার সময় বাঁ পায়ে খোড়াল আর এখন ডান পা খুঁড়িয়ে হাঁটছে! যত্তসব?'

রুহানকে নক করতেও হল না। কাচের দরজার ওপারের থেকে রুহানকে দেখে বস ডেকে নিলেন ঘরে। তারপর একটা খাম বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'রুহান, এই যে দু'মাসের মাইনে।'

'দু'মাসের!' রুহান ঘাবড়ে গেল।

'হ্যাঁ, আমরা তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি। উই ডোন্ট নিড ইউ এনি মোর।'

'স্যার...' কথা শেষ করতে পারল না রুহান। যে-পায়ে চোট নেই সেই পায়েও জোর পেল না যেন! মনে হল ও জলের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। রুহান যেন দেখতে পেল একটা ছেলে ডুবছে! ডুবেই যাচ্ছে!

৩

কুয়াশার ঝাঁঝরির ভেতর মিলিয়ে যাচ্ছে সাইকেল। হলুদ-লাল পাতা নিয়ে ইয়া বড়-বড় সব গাছেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তার ফাঁকে তুলোর মতো গোল্লা কাটছে হাওয়া। প্রতিটা ঘাসের মাথায় মুকুটের মতো শিশির পায়ের তলায় বুঝতে পারছে ও। পাহাড়ি শহরের ভোর মেঘ সরিয়ে উঁকি দিতে শুরু করেছে ক্রমশ। তার কালো ফিতের মতো রাস্তা, সবুজ রেলিং আর লাল কাঠের বেঞ্চ—সবেতেই মাফলারের মতো জড়িয়ে রয়েছে কুয়াশা। আর

তার ঝাঁঝরির ভেতর ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে সাইকেল। শুধু একটা গোলাপি স্কার্ফ উড়ছে। কুয়াশার ভেতর থেকে লোমে ঢাকা কুকুরের জিভের মতো বেরিয়ে রয়েছে সেই ছোট্ট স্কার্ফটা।

ওই স্কার্ফ কার? কে চলে গেল সাইকেল করে? কবে সে মৃদু ঘন্টি বাজিয়ে এসেছিল পাহাড়ি সেই শহরে? কার কাছে এসেছিল সে? আর কেনই বা অমন করে মিলিয়ে গেল? এখন শুধু শূন্য রাস্তা দেখতে পায় ও। সবুজ রঙের রেলিং দেখতে পায়। লাল বেঞ্চে দেখতে পায় কে যেন ছুরি দিয়ে খোদাই করে রেখে গেছে, 'আমি তোর জন্য এসেছিলাম...'

'জিয়ানা ওয়েক আপ, ওয়েক আপ ডার্লিং', নরম শব্দটা বারবার বাজতে বাজতে জিয়ানাকে প্রায় আইসক্রিম কেটে তুলে নেওয়ার মতো তুলে ফেলল ঘুম থেকে।

ব্লাইন্ডসের ফাঁক দিয়ে আলোর লম্বা চ্যাপ্টা আঙুলগুলো ক্রমশ ঢুকে আসছে ঘরে। আর সেই আলোর রং দেখে জিয়ানা বুঝল আজ একটু বেশিই ঘুমিয়েছে ও।

'জিয়ানা ওয়েক আপ, ওয়েক আপ ডার্লিং'—টকেটিভ ঘড়িটাকে থাবড়ে চুপ করাল জিয়ানা। ঘড়িটা অস্ট্রেলিয়া থেকে নিয়ে এসেছিল বুকু। একসঙ্গে হাফ ডজন অ্যালার্ম সেট করা যায়। ঘড়িটা প্রথম প্রথম ভাল লাগলেও এখন কেমন যেন একঘেয়ে লাগে জিয়ানার। আর আজ তো বিরক্তিতে ওটাকে মাটিতে ছুড়ে ভেঙে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে। আর-একটু, ইস আর-একটু যদি ঘুমোতে পারত তাহলে ঠিক বুঝতে পারত কে সেই সাইকেল চালক। দেখতে পারত লাল বেঞ্চে খোদাই করে রাখা পুরো কথাটা।

জিয়ানার মাথাটা ভোঁ হয়ে আছে। এত জীবন্ত ছিল স্বপ্নটা যে, মনে হচ্ছে এখনও পায়ের তলায় শিশির লেগে রয়েছে।

গোলাপি স্কার্ফ। হঠাৎ মনে পড়ল স্কার্ফটার কথা। অন্য স্বপ্নে এটা থাকত না কিন্তু আজ যোগ হয়েছে স্কার্ফটা। সাদা কুয়াশার ভেতর কী সুন্দর উড়ছিল স্কার্ফটা। মনে আছে। সব মনে আছে জিয়ানার। মনে আছে কাকে ও দিয়েছিল গোলাপি স্কার্ফটা। দশ বছর হয়ে গেছে। দশটা বছর হয়ে গেছে। তবু স্বপ্নটা এখনও এত জ্যান্ত। জিয়ানা দু'হাতে মুখ ঢাকল। স্বপ্নটাও যদি এমন দু'হাত দিয়ে ঢেকে রাখতে পারত!

প্রথম অ্যালার্মটা মিস করে দ্বিতীয় অ্যালার্মটায় ঘুম ভেঙেছে আজ। মানে সাড়ে সাতটা বাজে। সাড়ে ন'টার মধ্যে অফিস ঢুকতে হবে। অবশ্য সেটা খুব একটা অসুবিধে হবে না। ওর বাড়ি থেকে অফিস যেতে পনেরো মিনিট লাগে। তাও জ্যাম থাকলে। কিন্তু আজ একবার মেয়ের স্কুলে যেতে হবে। ক্লাস-টিচারের সঙ্গে দেখা করার আছে। সোয়া আটটায় সময় দিয়েছেন টিচার। কে জানে আবার কী কাণ্ড করেছে? এদেশে এসে বৈভবীর সমস্যা হচ্ছে মানিয়ে নিতে। চার পেরিয়ে পাঁচে পড়েছে মেয়েটা। কিন্তু একেবারে

বাপের ফোটোকপি। এ বয়সেই এত গম্ভীর! কথাও বিশেষ বলে না বাড়িতে এসে। খুব করে জিজ্ঞেস করলে দু'-একটা কথা বলে, তাও অনিচ্ছার সঙ্গে।

গতকালই অফিস থেকে আসার পর বৈভবী এসে একটা কাগজ হাতে ধরিয়ে বলেছিল, 'মাম্মা, এটা ক্লাস-টিচার দিয়েছে তোমার জন্য।'

'কী এটা?' অবাক হয়ে হাত বাড়িয়ে ভাঁজ করা কাগজটা নিয়েছিল জিয়ানা, 'কী, বললি না কী এটা?'

বৈভবী গোমড়া মুখে বলেছিল, 'দেখছ না স্টেপ্‌ল করা আছে। আমি জানি না ওটা কী। আর দেখিনি। অন্যের চিঠি দেখতে নেই।'

বৈভবী আর দাঁড়ায়নি। চলে গিয়েছিল নিজের ঘরের দিকে।

চিঠিটা খুলে ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল জিয়ানার। ক্লাস-টিচার আর্জেন্টলি দেখা করতে বলেছে পেরেন্টকে। এমন কিছু ডিসকাস করতে চায়, যা ফোনে বলা যাবে না।

অবাক লেগেছিল জিয়ানার, কী এমন কথা রে বাবা। এইটুকু মেয়ের ব্যাপারে কী এমন কথা থাকতে পারে? তবে বৈভবীকে জিজ্ঞেস করেনি কিছু। জিয়ানা জানত লাভ হবে না। ও মেয়ে কিছু করলেও উত্তর দেবে না। তবে রাতে বুকুকে বলেছিল ঘটনাটা, ল্যাপটপ খুলে কী একটা কাজ করছিল বুকু। জিয়ানা গিয়ে বসেছিল পাশে। বুকু তাকাওয়নি। একমনে তাকিয়েছিল স্ক্রিনের দিকে।

জিয়ানা অপেক্ষা করেছিল সামান্য। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'বুকু, তোমায় একটা কথা বলার ছিল।'

'বলো,' যেন যন্ত্রের ভেতর থেকে উত্তর বেরিয়ে এসেছিল।

'একটু এদিকে মন দাও।' বিরক্ত লেগেছিল জিয়ানার।

'মন দিতে হলে তাকাতে হয় বা দেখতে হয়, এমন ব্যাপার নয়।'

জিয়ানার রাগ হলেও গিলে নিয়েছিল পুরোটা। তারপর মনকে শান্ত করে বলেছিল, 'তুতুলের স্কুল থেকে কমপ্লেন লেটার এসেছে। কাল দেখা করতে বলেছে।'

'কমপ্লেন?' এবার মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়েছিল বুকু, 'কী কমপ্লেন করেছে?'

'না, মানে স্পেসিফিক কিছু লেখেনি, তবে...' ইতস্তত করেছিল জিয়ানা।

'তবে কে বললে কমপ্লেন?'

'লিখেছে এমন কিছু বলতে চায় যা ফোনে বলা যাবে না।'

'তার মানে কি কমপ্লেন? অন্য কিছুও তো বলতে চাইতে পারে।'

'তা পারে...' জিয়ানার নিজেকে একটু বোকাই লাগছিল।

'তুতুল বাড়িতেই কাউকে ডিস্টার্ব করে না, তো স্কুলে কী করবে!' বুকু আবার ল্যাপটপে ফিরে গিয়েছিল।

জিয়ানা সরিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। বুকু যে আর কিছু বলবে না, তা বুঝতে পেরেছিল ও। আর এও বুঝেছিল যে, স্কুলে ওকে একা-একাই যেতে হবে। আসলে বিয়ের পর থেকে একাই সব কিছু করে করে এখন অভ্যেস হয়ে গেছে জিয়ানার।

বিয়ের আগে আগে কিন্তু এত কিছু পারত না ও। সবটাই বাপি করে দিত। মা আর বাপি একদম কাঁটাতার দিয়ে মুড়ে রাখত জিয়ানাকে। ইউনিভার্সিটি যেতে যেদিন দেরি হয়ে যেত মা সেদিন ভাত মেখে খাইয়েও দিত। বন্ধুরা বলত, 'তোর মা বড্ড বাড়াবাড়ি করে কিন্তু।'

জিয়ানা কী বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকত। লজ্জা লাগত ওর। বন্ধুরা আরও খ্যাপাত, বলত, 'সব কিছুতেই তোর মা এত নাক গলায়, ফুলশয্যাতেও কী করবি সেটাও কি তোর মা দাঁড়িয়ে ডিরেকশন দেবে?'

জিয়ানার কান লাল হয়ে উঠত, ও প্রতিবাদ করত। কিন্তু ঠিক পেরে উঠত না। আর ঠিক তখনই সে এগিয়ে আসত। মৃদু গলায় বলত, 'রাস্তায় পাথরকে কে গার্ড দেয়? হিরেকেই মানুষ আগলে রাখে। তোরা সব বৃথাই হিংসে করিস জিয়ানাকে।'

বন্ধুরা বলত, 'তোর তো সবটাতেই বেশি বেশি। জিয়ানা বলতে তো তুই অজ্ঞান!'

তখন কতজন যে অজ্ঞান ছিল জিয়ানা বলতে! কিন্তু একজনের জ্ঞান হারানোটাই শুধু চোখে পড়ত ওর। কষ্ট হত। কিন্তু কিছু বলতে পারত না। মায়ের ভয়ে বা ভালবাসায় মায়ের কথাকেই বেদবাক্য হিসেবে মেনে চলত। তাই তো সেই জ্ঞান হারানো ছেলেটাকে অমন 'না' করে দিয়েছিল।

তখন গড়িয়ায় থাকত ওরা। গড়িয়াহাট থেকে গড়িয়া যাওয়ার অটো ধরত বাড়ি ফেরার পথে। ও সঙ্গে করে আসত। শেষ দিন ওকে 'না' বলে দিয়ে ফুটপাথ টপকে চলে গিয়েছিল অটোস্ট্যান্ডের দিকে। মা দাঁড়িয়েছিল ওর জন্য। তখনও ফ্লাইওভার হয়নি গড়িয়াহাটে। আকাশ থেকে রোদ এসে ধুয়ে দিচ্ছিল পথঘাট। পিছন ফিরে একবারও তাকায়নি জিয়ানা। তবু বুঝতে পারছিল একজন শেষবারের মতো দেখছে ওকে। বুঝতে পারছিল ওর পথ অনুসরণ করছে এক জোড়া নীল রঙের চোখ।

বুকুদের দিক থেকে সম্বন্ধটা এসেছিল সেই সময়তেই। ওদের সঙ্গে আগেই বুকুদের এক ক্ষীণ যোগাযোগ ছিল। তারপর সম্বন্ধ আসায় মা একদম ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বলা যায় মায়ের একক প্রচেষ্টাতেই গোটা বিয়েটা ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সেই মাকে যেন চিনতে পারত না জিয়ানা। বুকুর সঙ্গে জোর করে ঘুরতে পাঠাত ওকে। সিনেমা, রেস্তরাঁয়, শপিং, বুকুর সঙ্গে সব জায়গায় গিয়েছে জিয়ানা। আনন্দ করার চেষ্টাও তো করেছে। ভুলে যেতে চেয়েছে সব কিছু। বুকুকে জড়িয়েই নতুন করে বেঁচে উঠতে চেয়েছে ও। প্রবল ভাবে বেঁচে উঠতে চেয়েছে।

দেখাশুনো ও ঘোরাঘুরির শেষে আবার বিদেশ চলে গিয়েছিল বুকু। ওর দু'মাসের ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। শুধু যাওয়ার আগে বলেছিল সামনের মাঘে এসে একদম নিয়ে যাবে জিয়ানাকে।

তেসরা ফেব্রুয়ারি বিয়ে হয়ে গিয়েছিল জিয়ানার। সানাই, শব্দ, আলো আর প্রচুর লোকের মাঝে বুকুকে দেখে ওর বুকও কেঁপেছিল একটু। ভালও লেগেছিল যখন লোকে বলেছিল, 'তোর বর কত নামকরা ইঞ্জিনিয়ার। ফরেনে থাকে। ওখানে শুনেছি দারুণ ফ্ল্যাট পেয়েছে।'

বুকুর গলায় মালা দিয়ে, ওর পাশে বসে খুব ভাল লেগেছিল জিয়ানার। এমন নম্র চুপচাপ মানুষটা যে সম্পূর্ণ ওর ভাবতে ভাল লেগেছিল। মায়ের মুখের আভা আর বাপির গর্ব দেখে জিয়ানার মনে হয়েছিল, যাক, বাবা-মাকেও খুশি করতে পেরেছে ও। সবার মন রাখতে পেরেছে।

ফুলশয্যার পরের দিন খুব ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল জিয়ানার। শরীরের নরম জায়গায় বুকুর দাঁতের দাগের ওপর হাত বুলিয়ে গত রাতের রোমাঞ্চ মনে এসেছিল ওর। শরীরে পদ্মফুল ফুটেছিল যেন। বালাপোশের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা বুকুর তৃপ্ত, ঘুমন্ত মুখটা দেখে জিয়ানার মনে হয়েছিল, যাক, সবার মন রাখতে পেরেছে ও।

নিজেই বুঝতে পারেনি তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল আবার! আর আচমকা, একদম আচমকাই ও দেখেছিল, কুয়াশার ঝাঁঝরির ভেতর মিলিয়ে যাচ্ছে একটা সাইকেল। হলুদ-লাল পাতার ইয়া বড়-বড় সব গাছেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার ফাঁকে তুলোর মতো গোল্লা কাটছে হাওয়া। কালো ফিতের মতো রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে, দূর থেকে আরও দূরে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে সাইকেলটা।

ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসেছিল জিয়ানা। মনে হচ্ছিল দম বন্ধ হয়ে যাবে, মনে হচ্ছিল মরেই যাবে এবার। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটাকে কে যেন আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলছিল। যেন বুকে চাপ দিয়ে বের করে আনতে চাইছিল সব হাওয়া। দম নিতে পারছিল না জিয়ানা। গলার কাছে যেন আটকে ছিল বল। পেটের ভিতর যেন এক সমুদ্র মাছ দাপাচ্ছিল। কষ্ট হচ্ছিল, ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল জিয়ানার। ও যেন দেখতে পাচ্ছিল দূর থেকে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে বড় বড় দুটো চোখ। দুটো নীল রঙের চোখ। জিয়ানা সেই ভোরবেলা ঘুমন্ত বরের পাশে বসে বুঝেছিল, না, সবার মন রাখতে পারেনি ও। সবাইকে খুশি করতে পারেনি।

পরে, সময়ের সঙ্গে জিয়ানা বুঝেছে সবাইকে একসঙ্গে খুশি করা যায় না। এক সঙ্গে খুশি করা সম্ভব নয়। এই যে সূর্য। এমন প্রতাপশালী, সম্পূর্ণ জীবজগতের নিয়ন্তা। সে-ই কি সবাইকে একসঙ্গে খুশি করতে পারে? তার আলোয় যত জোরই থাকুক না কেন, সে পৃথিবীর এক দিকে দিন করলেও আর-এক দিকে তখন কিন্তু অন্ধকারই থাকে।

বুকুর কাছ থেকে উঠে বিছানার যে-দিকটায় ও শোয়, সেদিকে ফিরে গিয়েছিল জিয়ানা। ও জানত বুকু এখনও অনেকক্ষণ কাজ করবে।

বিয়ের আগের ওই মাস দুয়েকের ঘোরাঘুরির সময়ও বুকু চুপচাপ থাকত, তবে ঠিক এতটা নয়। এখন যেন বুকুর কথা বলতেই কষ্ট হয়। যেন একা থাকতে পারলে বেঁচে যায়। জিয়ানার খারাপ লাগত প্রথম প্রথম, কিন্তু এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে। ও নিজে থেকে আর বুকুকে ঘাঁটায় না। কোনও কোনও দিন ইচ্ছে হলে বুকু ওর পাশে শোয়। আবার কোনওদিন ওর স্টাডির ছোট্ট খাটটাতেই শুয়ে পড়ে। তবে কালেভদ্রে শরীরের ডাকে তাড়াতাড়ি বিছানায় আসে বুকু। কিন্তু সেই ডাকও ইদানীং কমে আসছে দ্রুত। আর সত্যি বলতে কি জিয়ানাও আর বুকুর প্রতি শারীরিকভাবে টান অনুভব করে না। ওদের যৌনতা এখন অনেকটাই রিচুয়াল হয়ে গিয়েছে।

গতকাল শেষ রাতের দিকে বৃষ্টি হয়েছে বেশ। সেপ্টেম্বরের দশ তারিখ আজ। কিন্তু তবু শহরের নানা পকেটে চোরাগোপ্তা অনেক মেঘ লুকিয়ে আছে। এখনও মাঝেমাঝে বৃষ্টি হচ্ছে আচমকা। সামনে পুজো, ভগবান জানে বৃষ্টি কতটা ভোগাবে।

গতকাল শেষ রাতে জলতেষ্টায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল জিয়ানার। তখনই দেখেছিল পাশে বুকু নেই। বিছানার ওই অংশটা নিপাট হয়ে আছে। ও জল খেয়ে পর্দা সরিয়েছিল। বাইরে রাস্তার হলুদ

আলোয় বৃষ্টিটা দেখে কেমন গা ছমছম করছিল। এসি-তে কুড়ি ডিগ্রি টেম্পারেচার সেট করা ছিল। তাতে কেমন যেন শীত শীত করছিল ওর। চব্বিশ ডিগ্রি সেট করে ও শুয়ে পড়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুম এসে গিয়েছিল।

সাড়ে সাতটাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। প্রথম অ্যালার্মটা মিস করল কী করে ও? এ দেশটাই কি এরকম? লোককে কুঁড়ে বানিয়ে দেয়? ইউএসএ-তে থাকার সময় তো এমন হত না। এই কলকাতার ভেতরে কীসের যেন একটা বীজ আছে। মানুষের মধ্যে সেই 'কী যেন' জিনিসটা পুঁতে দেয় এ শহর। মানুষ একটু শ্লথ হয়ে যায়। একটু কম দৌড়য়। একটু নরম হয়ে যায়। হ্যাঁ, নরম তো হয়েই যায়, না হলে আজ ভোরবেলা ও আবার সেই সাইকেলটা দেখবে কেন? কেন আবার বুক তোলপাড় করে ফুঁড়ে বেরবে হলুদ-লাল পাতা সেই গাছেরা? কেন এতদিন পরে উড়ে উড়ে এসে স্বপ্নে জড়িয়ে যাবে গোলাপি স্কার্ফ?

বিছানা থেকে উঠে কলিকে চা করতে বলে বাথরুমে ঢুকে গেল জিয়ানা। বৈভবীর মর্নিং স্কুল। কলি ঠিক তৈরি করে পাঠিয়ে দেয়। ওকে চিন্তা করতে হয় না। শুধু অফিস যাওয়ার আগে শাশুড়ির ঘরে যায় জিয়ানা। ভদ্রমহিলার একটা দিক পড়ে গেছে। বারো ঘণ্টার শিফটে দু'জন মহিলা অ্যাটেনডেন্ট সবসময় থাকে। সকাল আটটায় রাতের আয়া চলে গিয়ে দিনের আয়া আসে।

শাশুড়ির কাছে গিয়ে মিনিট দু'-তিনেক দাঁড়ায় জিয়ানা। শাশুড়ির মাথায় হাত বুলিয়ে একটু খোঁজখবর নেয় শরীরের। তারপর আয়াদের ওষুধপত্র কী লাগবে জিজ্ঞেস করে বেরিয়ে আসে। আবার সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে শাশুড়িকে একবার দেখে আসে ও। শাশুড়ি মানুষটা ভাল। অল্প কথা বলেন। বিরক্তি বা রাগ কিছু প্রকাশ করেন না। চেয়ার-টেবিলের মতো পড়ে থাকেন ঘরের কোনায়। কষ্ট হয় জিয়ানার। মনে হয় শাশুড়িকে একটু সঙ্গ দেয়, একটু গল্প করে বসে, কিন্তু পারে না। সময়টাই যে নেই ওর।

শ্বশুরমশাই যতদিন ছিলেন, শাশুড়ি ভালই ছিলেন। কিন্তু শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যুর শকটা নিতে পারেননি তিনি। বছর না ঘুরতেই সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়। আর তার ফলে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে যান। মা থাকবে কোথায়? কার কাছে? তাই বিদেশের বাস গুটিয়ে বুকু চলে আসে এখানে। বুকুর যা কোয়ালিফিকেশন তাতে নতুন চাকরি পেতে কোনও অসুবিধেই হয়নি। চিন্তা ছিল জিয়ানার। তবে আশ্চর্যজনকভাবে ওরও চাকরি পেতে অসুবিধে হয়নি। একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটরের চাকরি পেয়ে গিয়েছে জিয়ানা।

অফিস! অফিসের কথা চিন্তা করে এই সকালবেলাতেই একটু মন খারাপ হয়ে গেল ওর। ওদের কোম্পানি ভাল। এম ডি মিস্টার মদন খুরানা মাটির মানুষ। একান্তে জিয়ানাকে 'বেটি' বলে কথা বলেন। কিন্তু কলিগরা এক

একজন এক-একটা যন্তর। বিদেশ থেকে এসেছে বলেই কিনা কে জানে, সবার ভেতর একটা কমপ্লেক্স আছে ওকে নিয়ে। কেউই খুব সহজ হতে পারে না। তবে জিয়ানা চেষ্টা করে, সবার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে।

বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরিয়ে ড্রেস করে নিল ও। একটা ছাতা নিতে হবে আজ। যদিও গাড়িতেই যাতায়াত করে, তবু যা হুটহাট বৃষ্টি হচ্ছে, কখন দরকারে লাগে কে জানে।

ড্রেস করে ডাইনিং টেবিলে এল জিয়ানা। কলি চায়ের সঙ্গে দুটো মার্জারিন দেওয়া টোস্টও দিয়েছে। শরীর ঠিক রাখা খুব দরকার। ইদানীং একটু মোটা হচ্ছে জিয়ানা। কোমরের নীচে স্ট্রেচ মার্কস দেখা দিচ্ছে। দেখলে মনে হয় যেন মাটিতে লাঙল টানা হয়েছে। দেখতে এত বিশ্রী লাগে! আজকাল লো-ফ্যাট, লো-ক্যালরি খাবারের দিকে মন দিয়েছে ও। এমনিতে জিয়ানা খেতে ভালবাসে, কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে সেন্সর করেছে। প্রায় বত্রিশ হল, শরীরের দিকে নজর দিতেই হবে এবার।

আটটা বাজে, ওরে বাব্বা! লাফিয়ে উঠল জিয়ানা। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এবার যেতেই হবে। স্কুলে কতক্ষণ লাগবে কে জানে! আজ আর শাশুড়ির ঘরে যাবে না।

ও নিজেই গাড়ি চালায়। ফ্রিজের মাথায় ছোট একটা বাক্স থেকে চাবিটা তুলে নিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকল। চট করে একবার নিজেকে আয়নায় দেখে নিল ও। তারপর ব্যাগ আর ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখল নীচে কাকিমা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গল্প না জুড়ে দেয়!

ভদ্রমহিলার সব ভাল, শুধু বয়স হয়েছে বলেই বোধহয় একটু বেশি বকেন। বেশি বকা লোক ঠিক সহ্য করতে পারে না জিয়ানা। সে ওর যতই শুভাকাঙ্ক্ষী হোক না কেন। আর এখন তো বেদম তাড়ার মধ্যে আছে। একবার কথার ফুলঝুরি ছুটলে কালীপুজোর আগে থামবে না।

'আরে জিয়ানা, কেমন আছ?' কাকিমা একমুখ হাসল।

সর্বনাশ! সব আশঙ্কা কি এভাবেই সত্যি হবে ওর জীবনে? ও বলল, 'এই চলে যাচ্ছে কাকিমা। আসলে মেয়ের স্কুলে একটা মিটিং আছে তো, তাই একটু তাড়ায় আছি।'

কাকিমা বুঝল বলে মনে হল না। বরং আঁচল ঠিক করে চওড়া হেসে বলল, 'তা খেয়া যে রান্না করে পাঠিয়েছিল, তা খেয়ে বললে না তো কেমন লাগল?'

'সেই ছানাভাপা?' জিয়ানা মনে মনে নিজেকে সাবাশ জানাল। মনে রেখেছে ঠিক! ছানা জিনিসটা একদম সহ্য করতে পারে না ও। তাই মুখেও দেয়নি। বুকু খুব ভালবাসে। গোটাটা ও একাই খেয়েছে।

'হ্যাঁ, সেই যে রুহান দিয়ে গেল।'

রুহান, নামটা বেশ ভাল লেগেছিল জিয়ানার। যদিও পরিচয় হয়নি। যেদিন ছেলেটা এসেছিল, ও বাড়ি ছিল না। শুনেছে যে, ওদের বিয়েতেও নাকি আসেনি। এখন বিয়েতে কে এসেছিল আর কে আসেনি তা কি আর মনে রেখেছে ও? তবে এটা শুনেছে যে, খেয়াদির জায়ের ছেলে এই রুহান।

জিয়ানা বলল, 'হ্যাঁ, খেয়েছি তো, খুব ভাল হয়েছে। আসলে নয়-দশ দিন আগের ব্যাপার তো, তাই ঠিক মনে ছিল না।'

'ও, তো বুকু কেমন আছে?'

জিয়ানা ঘড়ি দেখল। এবার সর্বনাশ হবে। সাড়ে আটটাতেও স্কুলে পৌঁছতে পারবে না। আর বুকু? সকালে বিছানায় ছিল না। নির্ঘাত স্টাডিতে ঘুমিয়েছে। তাড়াহুড়োয় দেখেও আসতে পারেনি একবার।

ও বলল, 'ভাল আছে কাকিমা। আচ্ছা, এবার আমি...'

জিয়ানাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কাকিমা বলল, 'দেখো তো, এক বাড়িতে থাকি আর খবর নিতে হচ্ছে এভাবে। শরীরে গাঁটে গাঁটে এমন ব্যথা যে, সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। দিদিও তো শয্যাশায়ী, তাকেও একবার চোখে দেখতে পারি না।'

যে যা পারে না সেটা নিয়ে এত বিলাপ করে কেন, কে জানে! জিয়ানা বুঝল, কাকিমা সহজে ছাড়ার পাত্রী নয়। কিন্তু যা অবস্থা, ওকে ছাড়াতেই হবে।

ও বলল, 'আসি কাকিমা। বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

'দেরি?' কাকিমা আতান্তরে পড়ল, 'এঃ, বয়স হয়েছে তো তাই বড্ড বকবক করি। জানো তো, আমার মায়েরও এই স্বভাব ছিল। একবার কথা শুরু করলে আর থামবে না। একবার কী হয়েছিল জানো? বাবা তখন বিহারে পোস্টেড। রেলে চাকরি করত তো, তাই ট্রান্সফারেবল জব ছিল। তো হয়েছিল কী...'

'আসি কাকিমা,' জিয়ানা আর দাঁড়াল না। বাবার গল্প শুনতে বসে গেলে আজ সারা দিনের কাজ ভন্ডুল হবে। কাকিমার থতমত মুখের ওপর দিয়ে বেরিয়ে এল ও।

ঘুম ভাঙার সময়কার সেই রোদটা আর নেই। বরং তার জায়গায় মেঘ করেছে বেশ। ওদের বাড়িতে কোনও গ্যারাজ নেই। তবে পাশেই অশোকদার গ্যারাজ। সেখানেই ওদের দুটো গাড়ি রাখা থাকে।

আমেরিকায় থাকার সময়ও ওদের দুটো গাড়ি ছিল। তবে দুটোই ছিল বড়। কিন্তু এদেশে এসে দেখেছে যে, পার্কিংয়ের ভীষণ অসুবিধে। আর রাস্তার তুলনায় গাড়ির সংখ্যা প্রচুর বেশি। তাই এখানে ছোট গাড়ির রমরমা। জিয়ানা নিজের জন্য তাই একটা ছোট গাড়িই কিনেছে। কিন্তু বুকু তা করেনি। বড় গাড়িই কিনেছে।

মেরুন রঙের গাড়িটা শেডের তলায় রাখা ছিল। মাসে পাঁচশো টাকা নেয় অশোক। আর শেডের তলায় রাখলে দেড়শো বেশি। জিয়ানার গাড়ির প্রতি মায়া খুব বেশি, তাই শেডের তলাতেই রাখে।

রিমোট টিপে গাড়ির দরজার লক খুলে গাড়িতে বসল জিয়ানা। নিচু হয়ে উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে আকাশটা দেখল। মেঘ বাড়ছে বেশ। যে-কোনও সময় ঢালবে। জিয়ানা গাড়িতে স্টার্ট দিল।

এই দশ বছরে কলকাতা কত পালটে গেছে! বিয়ের পর বিদেশ গেলেও বৈভবী হওয়া অবধি দু'বছর অন্তর ওরা দেশে আসত। তারপর এই এসেছে। আর এসেই যেন কেমন লাগছে শহরটাকে। প্রথম প্রথম এখানে গাড়ি চালাতে ভয় লাগত ওর। মনে হত এই বুঝি অ্যাক্সিডেন্ট হল। কিন্তু এখন হাত স্টেডি হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে বেয়ারা টেম্পো, অটো আর ঠেলাওয়ালারা খুব ঝামেলা করে।

সকালের কলকাতায় অফিস আওয়ার্স শুরু হয়ে গেছে। সবাই সবাইকে টপকে, পিষে এগিয়ে যেতে চাইছে। মেঘ করে আছে বলে একটা ভ্যাপসা গরম লাগছে জিয়ানার, ও সুইচ টিপে কাচ তুলে এসি-টা চালিয়ে দিল।

বৈভবীর স্কুলটা শিয়ালদার কাছে। লেনিন সরণি ধরে বেরিয়ে যাবে। তবে জ্যামের জন্য চট করে বেরোতে পারল না। বারবার লাল আলো, ঠোক্কর আর বেহিসেবি পথচারীদের কাটিয়ে যখন স্কুলে পৌঁছল তখন আটটা চল্লিশ বাজে। এই রে, বড্ড লেট হয়ে গেছে! গাড়িটা পার্ক করে প্রায় দৌড়ে স্কুলে ঢুকল ও।

স্কুলটা পুরনো। ঐতিহ্যশালী। সামনের বড় উঠোনের মতো অংশটাকে থার্ড ব্র্যাকেটের মতো ঘিরে রেখেছে স্কুল বিল্ডিং।

টিচার্স রুমেই বসে ছিল ম্যাডাম। সুলগ্না সেন। চিঠিতে নামটা দেখেছিল জিয়ানা। বৈভবীর স্কুলে যখন যা হয় জিয়ানাই যায়। তবে বেশি দিন তো হয়নি তাই স্কুলে সবার সঙ্গে জিয়ানার অতটা পরিচয় হয়নি এখনও। তবে সুলগ্নাকে দেখেই চিনতে পারল জিয়ানা। মাজা রং। কিন্তু মুখশ্রীতে অদ্ভুত একটা মন-ভাল-করা ব্যাপার আছে।

'মিস সেন?' জিয়ানা টিচার্স রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল।

সুলগ্না উঠে দাঁড়িয়ে দু'-এক পা এগিয়ে এল দরজার দিকে, 'আপনি?'

'জিয়ানা বোস, তুতু... মানে বৈভবীর মা। আপনি চিঠি দিয়েছিলেন।'

'ও ইয়েস,' সুলগ্না হেসে এগিয়ে এল আরও, 'আসুন আমরা পাশের ঘরে বসি।'

টিচার্স রুমের পাশেই একটা মাঝারি মাপের ঘর। তাতে আলমারি, আরও নানা টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে একটা টেবিল আর চারটে চেয়ারও রয়েছে।

সুলগ্না জিয়ানার মুখোমুখি বসে নিজেই প্রথম কথা শুরু করল, 'আচ্ছা, মিসেস বোস আমি ডাইরেক্টলি পয়েন্টে আসছি। বৈভবীকে নিয়ে আমাদের একটু চিন্তা হচ্ছে।'

'কেন?' একটু অবাক হল জিয়ানা।

'শি ইজ বিহেভিং কোয়াইট স্ট্রেঞ্জলি।'

'স্ট্রেঞ্জলি?' জিয়ানা ওর ব্যাগটাকে কোলের থেকে নিয়ে টেবিলে রাখল।

'ও কারও সঙ্গে মিক্স করে না। ঠিকমতো কথা বলে না। ক্লাসওয়ার্ক করে না। আচমকা ভায়োলেন্ট হয়ে যায়। ড্রইং ক্লাসে মরবিড সব ছবি আঁকে।'

'মরবিড ছবি মানে?'

'মানে মরা পাখি, মাথা কাটা ভাল্লুক, রক্তমাখা ছোরা হাতে মানুষ। মানে এখনও তো ভাল করে আঁকতে শেখেনি, তবু বোঝা যায়। ওর মতো বয়সের মেয়েকে এতটা মরবিড আর ভায়োলেন্ট হতে আগে দেখিনি।' সুলগ্না চিন্তিত মুখে জিয়ানার দিকে তাকাল, 'আপনারা বাড়িতে কখনও এমন টের পাননি? মানে, ওর পড়াশোনার বইখাতা ঘেঁটে দেখেননি?'

জিয়ানা একটু লজ্জা পেল। মা হয়ে ও এসব জানে না বলতে সত্যিই খারাপ লাগছে ওর। আসলে বুকু বা জিয়ানা, বৈভবীকে নিয়ে বসার সময় পায় না বিশেষ। ওদের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এমনিতেই সেশনের মাঝখানে এসে ভর্তি হয়েছে বৈভবী। সবার চেয়ে একটু পিছিয়েই আছে। আর বিদেশের সঙ্গে পড়াশোনোর ধাঁচেরও একটা পার্থক্য আছে। একটা ছোট্ট মেয়ে এত সব কিছু সহজে মানিয়ে নেবে কেমন করে? তার ওপর ওকে যে-মেয়েটা পড়াতে আসে, সেও যে কতটা ঠিকঠাক পড়াতে পারছে কে জানে? জিয়ানা ভাবল, এবার থেকে পড়াশোনার ব্যাপারটা মাঝেমাঝে দেখতেই হবে ওকে। তবে মরবিডিটির ব্যাপারটা সত্যিই চিন্তার। হঠাৎ দিদির কথা মনে পড়ল জিয়ানার। দিদিও তো এমন ছিল। তাহলে কি দিদির লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে বৈভবীর মধ্যে? মরবিডিটি কি জিনবাহিত?

সুলগ্না বলল, 'মিসেস বোস, ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝছেন? আপনাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই এমন কিছু হয় না যাতে ওর এই মরবিডিটি আসবে? কিছু মনে করবেন না, কিন্তু প্রশ্নটা আমায় করতেই হল।'

'দ্যাটস ও কে,' জিয়ানা হাসার চেষ্টা করল। পারল না। ও বলল, 'আপনার কী সাজেশন? ওকে কি কাউন্সেলিং করালে ভাল হয়?'

'আমি এখনই বলব না, কিন্তু পরে হলেও হতে পারে।'

'তাহলে এখন কী করব?' জিয়ানার নিজের কাছেই নিজের গলাটা অসহায় শোনাল।

'যতটা সম্ভব ওকে চিয়ারফুল রাখুন। ছুটির দিনে ঘুরতে নিয়ে যান, আনন্দ করুন। ওকে বিশেষ একা থাকতে দেবেন না। আর আমরা তো আমাদের মতো করে চেষ্টা করবই।'

জিয়ানা মাথা নিচু করে রইল খানিকক্ষণ। মেয়েটা সত্যিই একা থাকে। ওই শয্যাশায়ী ঠাম্মা, আর আয়া, আর কলি—স্কুল থেকে ফেরার পর তো এদের সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথাই বলে না। ওদের আশপাশে তো কোনও সমবয়সি বাচ্চা নেই যার সঙ্গে একটু খেলবে মেয়েটা। কী যে করবে বুঝতে পারছে না জিয়ানা।

সুলগ্না এবার উঠল, বলল, 'সরি, এবার আমায় উঠতে হবে, ক্লাস আছে। তবে আই উইল কিপ ইন টাচ উইথ ইউ। বৈভবী খুব সুইট মেয়ে। খুব মিষ্টি মেয়ে। আপনি নজর রাখবেন, কিন্তু টেনশন করবেন না। এভরিথিং উইল বি অলরাইট।'

স্কুল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল জিয়ানা। সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে পার্কিং থেকে বেরোতে যাবে, হঠাৎ বাঁ দিকের কাচে একটা ধপধপ শব্দ হচ্ছে শুনে মুখ ফেরাল ও। দেখল বালা পরা হাত দিয়ে একটা ছেলে মারছে কাচটায়।

'হোয়াট ননসেন্স!' জিয়ানার বিরক্ত লাগল, 'এভাবে কাচে মারছ কেন?'

কাচ বন্ধ থাকায় ক্ষীণভাবে ছেলেটার গলা শোনা গেল, 'আরে দিদি পারকিন ফি না দিয়েই সটকাচ্ছেন! তাড়াতাড়ি মাল ছাড়ুন।'

'মাল?' জিয়ানার রাগ হয়ে গেল ছেলেটার কথায়। এরা এত অসভ্য কেন!

কলেজেও একবার দুটো ছেলে ওকে টিজ করেছিল। ওড়না টেনে 'মাল' বলেছিল। ও দু'দিন কলেজে যেতে পারেনি। ভয়ে, লজ্জায়, কষ্টে নিজের ভেতরেই গুমরেছিল সারাটা সময়। ভাল করে খায়নি। ঘুমোয়নি। এমনকী কারও সঙ্গে কথা বলেনি। বারবার ছেলে দুটোর মুখ মনে পড়ছিল। কলেজের ফুটবল টিমের ষণ্ডা টাইপের দুটো ছেলে। ওদের বিরুদ্ধে যে কিছু করবে তাও পারেনি। তৃতীয় দিন কলেজে গিয়েছিল ও। মাথা নিচু করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল। হঠাৎ কোত্থেকে যে একজন এগিয়ে এসেছিল। এসে সে জানতে চেয়েছিল, 'তোর মুখচোখ এমন কেন রে? গত দু'দিন আসিসনি কেন? তোকে কেউ কিছু বলেছে?' এ ছাড়াও একবার সুমন্ত বলে একটা ছেলে চূড়ান্ত অসভ্যতা করতে গিয়েছিল জিয়ানার সঙ্গে। সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই ছেলেটা।

দুটো ক্ষেত্রেই বুকের কাছে ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে ও চোখ তুলে দেখেছিল ওর দিকে সটান তাকিয়ে আছে দুটো বড় বড় নীল চোখ।

জীবন আজ অনেক দূরে বেঁকে এসেছে। অমন নীল রং আর চোখেই পড়ে না জিয়ানার। ছুটিতে একবার ইংল্যান্ডে ঘুরতে গিয়েছিল বুকুর সঙ্গে। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত কাউন্টিগুলোতে ঘুরতে ঘুরতে বুকু বলেছিল, 'দেখো, আকাশটা কেমন চোখের মতো নীল!'

না, সেই নীল নয়। মাথা নামিয়ে নিয়েছিল জিয়ানা। কিছু বলেনি। বুকু ওকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে বলেছিল, 'ইস্, আমার চোখ দুটো যদি এমন নীল হত।'

ওই চোখ তুলে কেবলমাত্র একজনই তাকিয়েছিল। আর কেউ কোনওদিন পারেনি, কোনওদিন পারবেও না। জিয়ানা বুকুর জ্যাকেটে মুখ গুঁজে কেঁপে উঠেছিল সামান্য। বুঝেছিল এই কম্পনটুকুই একমাত্র ওর ব্যক্তিগত, আর কোনও কিছু নয়।

পার্কিং ফি দিয়ে গাড়িটা বের করে নিল জিয়ানা। এবার অফিস যাবে। আকাশ কালো করে এসেছে। মনে হচ্ছে যেন নোংরা একটা চাদর কেউ টাঙিয়ে দিয়েছে শহরের মাথায়। বিরক্ত লাগছে জিয়ানার। মেঘলা দিনে পলিউশন রেট যেন আরও বেড়ে যায়। ওর মাঝে মাঝে মনেই হয় না যে, এই তেলকালির শহরে ও এতগুলো বছর কাটিয়েছে। মাঝের ন'-দশটা বছর যেন ওকে পালটে দিয়েছে শারীরিকভাবে। যেমন এখন মুখ ফস্কে কখনও-সখনও বলে ফেলে, 'আমাদের ওখানে এমন হয় না।' জিয়ানা মাঝেমাঝে ভাবে, সত্যি মানুষ কখনও কখনও বোঝে না, কোনটা তার দেশ। যেখানে সে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকে সেখানে, না যেখানে তার মন পড়ে থাকে সেখানে।

পার্ক স্ট্রিটে ওদের অফিসটা বেশ বড়। নীচে পার্কিং লট আছে। গত সপ্তাহ থেকে এখানে গাড়ি রাখার সুযোগ পায় ও। কারণ তার আগে গোটা জায়গাটাই একদম বুকড্ থাকত।

দুটো বড় গাড়ির মাঝে নিজের গাড়িটাকে সাবধানে পার্ক করে নামল জিয়ানা। তারপর গাড়ি লক করে এগিয়ে গেল লিফটের দিকে।

এই বিল্ডিংটা ছ'তলা। এর ওপরের দুটো ফ্লোর ওর কোম্পানির। ওরা প্রজেক্টের কাজ করে। সিভিল, মেক্যানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ইত্যাদি আরও ডিভিশন নিয়ে ওরা ব্যবসার যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করে। আর এই সবকিছুকে কো-অর্ডিনেট করে, ওদের সেলসের সঙ্গে টেকনিক্যাল ব্যাক-আপ দিয়ে কাজটাকে সিনক্রোনাইজ করাই হল প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটরের কাজ। তবে মাঝেমাঝে বেয়াড়া জায়গায় সেলস টিমের সঙ্গে ছুটতে হয় কো-অর্ডিনেটরকে। যদিও এই শেষের ব্যাপারটা এখনও করতে হয়নি জিয়ানাকে। আসলে এত বছর বিদেশের ওয়ার্ক কালচারে ছিল ও, তাই খুরানা ওকে ধাতস্থ হওয়ার জন্য হয়তো তেমন প্রজেক্টে ঠেলছেন না। তাছাড়া সেলসে পুরনো কমপিটেন্ট লোকের অভাব নেই ওদের। ছ'জন, প্রায় কুড়ি বছরের এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে বসে আছে। তারা খুবই হেল্পফুল আর কাজটাও বোঝে। ফলে কো-অর্ডিনেটরদের চাপ কম।

যদিও অফিসে একটা কানাঘুষো চলে যে, খুরানা জিয়ানাকে বিশেষ চোখে দেখেন তাই এত মাইনে দিয়ে রাখলেও সেফ জোনে খেলতে দেন। জিয়ানা এসব পাত্তা দেয় না। কর্পোরেট সেক্টর হল চাইনিজ চেকার্স-এর বোর্ড। কে কাকে কীভাবে টপকাবে, বোঝা মুশকিল। সবার ভেতরেই একে ওপরকে টপকানোর ইচ্ছে ক্রমাগত চলে। ফলে চোরাগোপ্তা মার, বদনাম, বিপদে ফেলার মতো ঘটনা ঘটতেই থাকে।

জিয়ানার সঙ্গে আরও চারজন প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর আছে। শ্যাম ভার্গব, ললিত রায়, শালিনী মেটা আর অনুজ সান্যাল। এদের মধ্যে শ্যাম নিজের চরকায় তেল দিতে পছন্দ করে। কিন্তু শালিনী আর অনুজ হল শয়তানের রিপ্রেজেনটেটিভ। ললিত ছেলেটা ভাল। একটু চুপচাপ, কিন্তু ভাল।

লিফটের ভেতরের ফ্যানটা চলছে না আজ। এমনিতেই মেঘের শহর খুব গুমোট, তার ওপর লিফটের মতো একটা কফিনে যদি ফ্যান না চলে তাহলে যে কী ঘোরতর অবস্থা হয়, কাকে বোঝাবে জিয়ানা! এই দেশে, মেন্‌টেনেন্স বলে একটা ব্যাপার যে আছে, বোঝাই যায় না। লিফটের ফ্যানটা যে খারাপ হয়েছে সেটা জানালেও, জিয়ানা জানে যে, কিচ্ছু ঠিক হবে না। এদেশে সবাই যে-কোনও কাজ কাল করার পক্ষপাতী।

এখন পিক আওয়ার্স, তাই লিফটে এ ওর কোলে উঠে পড়ার মতো অবস্থা। গুটখা, পান, নস্যি, সিগারেট—নানা রকম গন্ধের মিশ্রণ যেন পাক খাচ্ছে কফিনের মধ্যে। চিরকালই এসব গন্ধে গা গুলোয় জিয়ানার। বুকু যেদিন স্মোক করত সেদিন চুমু পর্যন্ত খেতে দিত না ও। বুকু বলত, 'আরে বাবা, পুরুষ মানুষ সিগারেট না খেলে মানায়?' বলত, তবে তারপর বহু দিন আর খেত না। আসলে সিগারেটটা বুকুর নেশা ছিল না কোনওদিনই। মাঝেমধ্যে কলিগদের পাল্লায় পড়ে খেত। তবে বুকু আর সিগারেট খায় না। বছর চারেক হল ড্রিঙ্ক করা শুরু করেছে। মদের গন্ধও ভাল লাগে না জিয়ানার। তবে এখন খুব একটা বেশি সহ্য করতে হয় না সেই গন্ধ।

লিফট থেকে যখন ছ'তলায় বেরোল, জিয়ানার মনে হল স্নান করে বেরিয়েছে। লিফট থেকে বেরিয়েই একটা চৌকো জায়গা, তার এক দিক দিয়ে ছাদের দিকে সিঁড়ি গেছে। এক দিকে ওয়াশরুম আর সোজাসুজি সামনের কাচের সুইংডোর। অফিসে ঢোকার দরজা। কাচটা ফ্রস্টেড, আর তার ওপর লেখা প্রোজেকশন কর্প।

দরজায় বনমালী বসে একটা হাত দেখার বই পড়ছিল। লোকটার দু'হাতে আঙুলে মোটমাট চোদ্দোটা আংটি। এত কীসের বিশ্বাস কে জানে! জিয়ানার মাঝেমাঝে অবাক লাগে। কৌতূহলও হয়। ভাবে জিজ্ঞেস করবে বনমালীকে যে, এইসব বই পড়ে কী জানতে চায় ও? যা হবে তা তো হবেই, সেটাকে জেনে বা বদলে দিতে কেন চায় মানুষ? তবে জিজ্ঞেস করতে পারে না, স্বভাবগত ও পদমর্যাদাগত ব্যাপারটা ওকে গম্ভীর করে রাখে।

ওকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝোঁকাল বনমালী। জিয়ানাও মাথা নাড়িয়ে ঢুকে গেল ভিতরে। ঠান্ডা করিডরে দাঁড়িয়ে শান্তি পেল ও। এখানে ঢুকলে মনেই হয় না পচা ভাদুরে গরমে গোটা কলকাতাটাই তন্দুর হয়ে গেছে।

ন'টা চল্লিশ বাজে, অফিস এখনও তেমনভাবে জমেনি। যতটা দেরি হবে ভেবেছিল, ততটা হয়নি। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল জিয়ানা। ওদের এখানে ফিঙ্গার-প্রিন্ট ডিটেক্টর দিয়ে অ্যাটেন্ডেন্স রাখা হয়। সেসব সেরে ডেস্কে গিয়ে বসল ও।

জিয়ানার সিটটা একদম ধারে। পাশে দেওয়াল। তাতে বড় কাচ লাগানো। জিয়ানার এখানে বসতে ভাল লাগে বেশ। ভেতর থেকে বাইরে দেখা গেলেও বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যায় না। আর অত ওপরে বসে গোটা শহরটাকে কম্পিউটারের রেসিং গেমের মতো মনে হয়। মনে হয় কালো রাস্তা দিয়ে অসংখ্য গাড়ি পাল্লা দিচ্ছে একে ওপরের সঙ্গে। আর একটা সময়ও খুব ভাল লাগে জিয়ানার। সূর্যাস্তের সময়। এত উপর থেকে ওর মনে হয় ওপরের সূর্য আর মাটির শহরের মাঝে কেমন যেন ভেসে বেড়াচ্ছে ও। ওর মনে হয় একদিন অনেক উঁচু একটা বাড়িতে ও থাকবে।

তবে একদিন থাকবে, আজ নয়। আজ এখন কাজ করতে হবে ওকে। কোরাপুটে ওদের একটা প্রজেক্ট চলছে। ম্যানেজমেন্টের মতে তাতে এক্সপেনডিচার বেশি হচ্ছে। খুরানা বলেছে একটা প্রজেক্ট ট্যালি তৈরি করতে।

প্রায় দু'বছর ধরে প্রজেক্টটা চলছে। জিয়ানার এখানে জয়েন করার অনেক আগে থেকে। কিন্তু প্রথম থেকেই ঝামেলার জন্য কাজে দেরি হচ্ছে। তার মধ্যে বাজেটে দাম বেড়েছে জিনিসপত্তরের। যদিও প্রজেক্ট কনট্র্যাক্ট-এর ক্লজে এস্কালেশনের কথা ছিল, তবু যা এস্টিমেট ছিল খরচ তারও বেশি হচ্ছে। কতটা প্রফিট মার্জিন যে ড্রেন হবে তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায় আছে ম্যানেজমেন্ট। গত কয়েকদিন ধরে এটা নিয়েই কাজ করছে ও। আজ হোপফুলি শেষ করে ফেলতে পারবে।

ব্যাগটা টেবিলে রেখে কম্পিউটারটা সুইচ অন করল জিয়ানা। বাঁ দিকের ড্রয়ার খুলে দুটো প্রজেক্টের কস্টিং ফাইল বের করল। এত বড় প্রজেক্ট, প্রায় সাড়ে চারশো কোটি টাকার। তার হিসেব করা কি চাট্টিখানি কথা! অবশ্য এ তো আর শুধু অ্যাকাউনটেন্টের হিসেব নয়, এর মধ্যে ট্রিগনোমেট্রি, কেমিক্যাল ব্যালেন্স করে নানান রাসায়নিকের ওজন বের করে তার খরচ, অ্যালজেব্রা, লগ, ক্যালকুলাস আরও অনেক কেরামতির অঙ্ক লুকিয়ে আছে।

অঙ্ক করতে ভাল লাগে জিয়ানার। তাই কাজটা করতে ভালই লেগেছে। ও জানে চেপে করতে পারলে লাঞ্চের পরেই হিসেবটা খুরানাকে সাবমিট করতে পারবে। কিন্তু তার জন্য কিছুক্ষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে হবে।

কম্পিউটারে স্প্রেডশিটটা খুলে দেখতে যাবে, এমন সময় ফোনটা ক্যানক্যান করে বেজে উঠল। মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ গেল জিয়ানার। মা। মা? এমন সময়! বিরক্তিতে মুখটা বেঁকে গেল জিয়ানার। সত্যি, মায়ের সময়জ্ঞানের তুলনা নেই! ভুলভাল সময়ে ফোন করতে মা ওস্তাদ। ভদ্রমহিলাকে বলে বলে পারে না জিয়ানা যে, এমন করতে নেই। অফিস টাইমে ফোন করতে নেই একদম। কিন্তু জিয়ানা এও জানে যে, ফোনটা ওকে তুলতেই হবে নইলে আর রক্ষে থাকবে না। মা কেঁদেকেটে একশা করবে। মায়ের রাগ, দুঃখ সব চড়া সুরে বাঁধা। একগুঁয়ে বাচ্চার মতো মায়ের যা চাই, তা চাই। ইচ্ছার সামান্য এদিক-ওদিক হলেই কেলেঙ্কারি।

'বলো মা,' ফোনটা তুলে বিরক্তি চেপে বলল জিয়ানা।

'তুই কি আমার ফোন পেয়ে বিরক্ত হলি মিষ্টি?'

জিয়ানা ঠোঁট কামড়াল। এই রে! যতই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করুক, মা ঠিক বুঝে ফেলেছে। এসব ব্যাপারে ভদ্রমহিলার একটা নিজস্ব ইন্‌সটিংক্ট আছে।

জিয়ানা হাসার চেষ্টা করল, 'না মা, একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। ইম্পর্ট্যান্ট কাজ করতে হচ্ছে তো, তাই হয়তো তোমার গলাটা অন্যরকম লেগেছে।'

'তাই?' ফোনের ওপার থেকে দীর্ঘশ্বাস শুনল জিয়ানা। মা বড্ড বেশি সেন্টিমেন্টাল।

জিয়ানা বলল, 'মা, একটু তাড়াতাড়ি বলবে কী দরকার?'

'বলছি,' মা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'তোর বাবা বলেছিল তোকে একবার আসতে।'

'এই তো কিছুদিন আগে গেলাম।'

'তো? আর আসা যায় না?'

'ঠিক আছে, যাব।' জিয়ানা কথা শেষ করে রাখতে পারলে বাঁচে এমনভাবে বলল।

মা তবু ছাড়ল না। বলল, 'আর সেই ব্যাপারটা নিয়ে কি কিছু ভাবলি?'

'কোন ব্যাপারটা?' জিয়ানা কমপিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল। প্রজেক্ট কস্ট বের করার সময় ইলেকট্রিক্যাল এস্টিমেশনে মনে হচ্ছে এরিয়া লাইটেনিংয়ে কিছু গড়বড় থেকে গেছে।

'আঃ,' মা বিরক্ত হল, 'তুই শুনছিস না ঠিকমতো। তুতুলের একটা ভাই নেওয়ার ব্যাপারটা। আর দেরি করিস না। একটা বাচ্চার কোনও ভরসা নেই। তাড়াতাড়ি নিয়ে নে। দেখলি তো কী হয় মানুষের জীবনে!'

'মা,' জিয়ানা কঠোর হল, 'প্লিজ, আমায় এবার কাজ করতে দাও। বাপির কাছে আমি ঠিক যাব, বলে দিও, কেমন?'

'কিন্তু, মিষ্টি তুই কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছিস।'

'মা, এখন রাখছি, বাই।' কুট করে ফোনটা কেটে দিল ও।

এটা মায়ের নতুন সংযোজন। দেশে ফেরার পর থেকে শুরু করেছে, 'আর একটা বাচ্চা নে।' কেন? একটা সন্তানের নাকি গ্যারান্টি নেই। মাকে বুঝিয়ে পারে না ও যে, মানুষের জীবন টিভি, ফ্রিজ বা মোবাইল নয় যে, গ্যারান্টি কার্ড সমেত আসবে। কিন্তু মা বোঝে না। আসলে মা এমন করে কেন ও বোঝে। নিজের ছোটবেলার দিকে তাকালে মায়ের সেই মুখটা মনে পড়ে ওর। মনে পড়ে শোওয়ার ঘরে দেখা সেই দৃশ্যটা।

তবে যাই ঘটে থাকুক, অতীত তো অতীতই। আর মায়ের সঙ্গে অমন হয়েছে বলে জিয়ানার সঙ্গেও অমন হবে, তা তো নয়। কিন্তু মা কিছুতেই

বোঝে না এটা, শুধু চাপ দেয়। নিজের মত অনুযায়ী কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেয়। আর এটা সম্ভব হয় বাপির জন্য। বাপি কেন যে মাকে একটু কিছু বলে না! জিয়ানা মায়ের সঙ্গে না পেরে মাঝেমাঝে বাপির ওপর রাগ করে। কখনও কখনও ভাল-মন্দ কথাও শুনিয়ে দেয় বাপিকে। তবু বাপি কিছু বলে না। শুধু তাকিয়ে থাকে।

বাচ্চা নেওয়ার কথা আর ভাবতে পারে না জিয়ানা। বাচ্চা নিতে গেলে যেমন সম্পর্ক চাই, বুকুর সঙ্গে তা আর প্রায় নেই। সারাদিন খাটাখাটনির পর জিয়ানার আর ইচ্ছে করে না। তাছাড়া পুরনো, বহু পুরনো একটা জিয়ানাকে আজকাল ভেতরে আবার টের পায় ও। মনে হয় বহু বহু দিন ঘুমের পর পুরনো সেই মেয়েটা ওর ভেতরে জাগছে। এত বছরের এত ঘটনা সরিয়ে, জিয়ানা বোঝে একজন যেন মাথা তুলছে। যেন তার ফেরত আসার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু কেন? কেন হচ্ছে এমন?

জিয়ানা বোতল থেকে জল খেল খানিকটা। তারপর নিজেকে সংযত করে ডুবে গেল কম্পিউটারে। মনে মনে নিজেকে লাঞ্চ অবধি সময় দিল ও। তার ভেতর যে করে হোক এটা শেষ করে খুরানার কাছে সাবমিট করবে।

বারোটা অবধি মন দিয়ে কাজ করে ঠিক কাজটা গুটিয়ে আনল জিয়ানা। এবার শুধু সামারিটা করা বাকি। ও হাঁফ ছাড়ল। সত্যিই খুব জটিল ছিল কাজটা। আর এটাও সত্যি যে, ম্যানেজমেন্টের আশঙ্কাও ঠিক। বেশ কিছু টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়ে গেছে। জিয়ানা জানে এটা নিয়ে সাইট ম্যানেজারদের ওপর একটা স্টেপ নেওয়া হবে।

জিয়ানা উঠল। একটা কফি দরকার। ওদের বড় ঘরের কোনায় কফি মেশিন রাখা থাকে। অফিসে জিয়ানা কফিটা প্রেফার করে। এদের চায়ের যা কোয়ালিটি, মুখে দেওয়া যায় না।

পাশে রাখা একটা পেপার কাপে কফিটা নিল জিয়ানা। গন্ধটাই রিফ্রেশিং। ও চুমুক দিতে যাবে এমন সময় পিছনের থেকে শুনল, 'আরে জিয়ানা, তুমি খবরটা শুনেছ?'

'খবর?' জিয়ানা কাপটা হাতে ঘুরল। ললিত। বেঁটে কালো মানুষটাকে বেশ উত্তেজিত লাগল।

'আরে বিশাল কেলো!' ললিত বাঁ হাত দিয়ে টাইয়ের নটটা ঠিক করে বলল, 'এক সঙ্গে ছ'জন গেছে।'

'মানে?' জিয়ানা ভুরু কুঁচকে তাকাল। ললিতের এই এক সমস্যা। কোনও কথা সরাসরি বলে না।

'প্লিজ কাট দ্য ক্র্যাপ, কী হয়েছে বলো?'

'বিশাল কেস! পুরো কোম্পানির ব্যাকবোন কেঁপে গেছে।' ললিত বলল।

'আরে, কী হয়েছে বলবে, না একশো পাতা ইনট্রো দেবে?' এবার ঝাঁঝিয়ে বলল জিয়ানা। ও জানে এটা ললিতের ওষুধ।

ললিত বোকার মতো হাসল। বোধহয় জিয়ানার রাগটাকে প্রশমিত করার জন্যই। তারপর বলল, 'সেল্‌সের ছ'জন গতকাল একসঙ্গে রিজাইন করে অন্য জায়গায় জয়েন করেছে।'

'মানে!' জিয়ানার হাত থেকে কফিটা একটু চলকাল। বলছে কী ললিত?

'হ্যাঁ, আমাদের সেল্‌স টিমের ছ'জনকে ওয়াটার বার্ড কোম্পানি জাস্ট একসঙ্গে তুলে নিয়েছে।'

'সে কী?' জিয়ানা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

ওয়াটার বার্ড ওদের সবচেয়ে পুরনো কমপিটিটর, আর হার্ড কমপিটিটর। গত মাসেই ওরা একটা সুইডিশ কোম্পানির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। তারপর এ মাসে জিয়ানাদের সেলসের টিমটাকে এমনভাবে তুলে নিল। এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার।

জিয়ানা বলল, 'তুমি ঠিক জানো?'

ললিত হাসল, 'সারাদিন কমপিউটারে মুখ গুঁজে থাকলে জানবে কেমন করে? আরে বাবা, ঘাস খেতে খেতে মাঝে মাঝে আকাশের দিকেও মুখ তুলে তাকাতে হয়। খবরটা অফিসের সবাই জানে আর তোমায় দেখে মনে হচ্ছে যেন গাছ থেকে পড়লে।'

জিয়ানা কফিটা শেষ করে, কাপটা বিনে ছুড়ে ফেলে বলল, 'তাহলে কী হবে?'

ললিত চলে যেতে গিয়েও দাঁড়াল একটু, 'কী আর হবে! বাঁশের সময় আসছে। সেল্‌স থেকে আমাদের ওপর বিশেষ চাপ আসত না। এবার 'কাম কা বাম্বু লেনা হ্যায় জাম্বো' হবে। হার্ড ডেজ আর কামিং জিয়ানা, হার্ড ডেজ আর কামিং।'

হার্ড ডেজ। কঠিন দিন। সেলসের প্রচণ্ড চাপ এবার বুঝতে পারবে জিয়ানা। টেনশন হচ্ছে ওর। সামনে অনেক কাজের লিড। সেসব ফলো-আপ আর তার পরের ধাপের কাজকর্ম খুব কঠিন হয়ে গেল। এভাবে ছ'জন কখনও ছেড়ে যায়!

জিয়ানা নিজের সিটে ফিরে গিয়ে বসল। কিন্তু কমপিউটারের দিকে না তাকিয়ে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। এ ওকে টপকাচ্ছে, ও একে মেরে বেরিয়ে যাচ্ছে। লোকজন প্রাণ হাতে করে রাস্তা পেরোচ্ছে। হকাররা চিৎকার করছে। আর পুরনো বাড়ির লম্বা লম্বা ছায়া বিপদের রং লাগিয়ে দিচ্ছে সব কিছুতে। কমপিউটার গেমসের শহরটার দিকে তাকিয়ে রইল জিয়ানা। ও বুঝল, এ খেলার কন্ট্রোল ওর হাতে নেই। কারণ এই বিশাল খেলাটার ভেতর ও নিজেই যে ঢুকে পড়েছে এখন।

৪

অফ স্টাম্পের ওপর বলটা ছাড়বে, না খেলবে ভাবতে ভাবতেই মেট্রোটা চলে এল। আদি বিরক্তিতে মাথা নাড়ল শুধু। আর দু'মিনিট সময় পেলে ও ঠিক জিনিসটাকে লাইনে এনে ফেলত।

জিনিস। জিনিসই তো। আদি জানে মেয়েরা জিনিস। একটি মেয়েই ওকে শিখিয়েছিল এটা সেই এগারো ক্লাসে। স্কুলের শিক্ষা। এত সহজে কী করে ভোলে ও? সেই থেকে এই আঠাশ বছর বয়স অবধি ও মেয়েদের এভাবেই দেখে এসেছে।

ট্রেনটা জমাট হয়ে আছে ভিড়ে। বিকেলের দিকের মেট্রোগুলোর এই এক প্রবলেম। তার ওপর স্টেশন বেড়ে যাওয়াতে ভিড়টা বেড়েছে আরও। পিঠের ব্যাগটা ঠিক করে ভিড় ঠেলে একটা কোনায় গিয়ে দাঁড়াল আদি।

বারাসতে গিয়েছিল ও। ওদের কোম্পানি এখন রিয়েল এস্টেটে নেমেছে। তার যোগাযোগ করতে ওকে যেতে হয়। বস ওকে অফিসে বসে কাজ করতে দেয় না। টো-টো করে ঘুরিয়ে মারে। বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনায় ওদের কোম্পানির ব্যবসা ক্রমশ বাড়ছে।

মার্চেন্ট মাল্টিপল্‌স লিমিটেড বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনার ওপর দৃষ্টি দিয়েছে। ওদের ইস্টার্ন রিজিয়নের ডিরেক্টর গৌর রোশন দিওয়ান বলেন যে, এত বড় একটা টেরিটরি পড়ে রয়েছে আর সেটাকে কেউ ট্যাপ করছে না! এটা তো এবার ধরতেই হবে।

মহুলন্দপুরের কাছে চাপাডাঙা গ্রামে একটা পার্টিকল বোর্ডের ফ্যাক্টরি খুলেছে ওদের কোম্পানি। একটা মিনারেল ওয়াটার, ফ্রুট জুসের ফ্যাক্টরিও খুলতে চায়। তার সঙ্গে বারাসত অঞ্চলে বিশাল জমি কিনে রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে।

গৌর রোশন দিওয়ানের বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ মতো। লম্বা, দোহারা চেহারা। দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। মানুষটা খুব মাই ডিয়ার ধরনের। সবার সঙ্গে হেসে, কাঁধে হাত রেখে কথা বলেন। আদিকে বিশেষ পছন্দ করেন। বলেন, 'আদিত্য, তুমি আমার চোখ। বুঝলে? চোখ যা করে, তোমায় তাই করতে হবে। আমি জানি তুমি তোমার কোম্পানির প্রতি লয়াল থাকবে।'

লয়াল, লয়ালটি। আদি হাসে মনে মনে, কথাগুলোর কি সত্যি কোনও মানে আছে? গৌরের কাছ থেকে ও ভাল মাইনে পায়, তাই সাধ্যমতো কাজ করে। এর চেয়ে বেশি টাকা যদি কেউ ওকে অফার করে তাহলে ও সেখানে চলে যাবে। লয়ালটি-ফয়ালটির কোনও দাম আদির কাছে নেই।

আজ বারাসত থেকে দমদম, তারপর সেখান থেকে বেলগাছিয়ায় গিয়েছিল আদি। বারাসতের এই প্রজেক্টটার যারা অ্যাড ক্যাম্পেন করছে তাদের অফিস বেলগাছিয়ায়। সেখান থেকে বেরিয়ে এই মেট্রোটা ধরেছে। আজ দমদম থেকেই পুরো লোড হয়ে এসেছে গাড়ি।

ওর অফিস ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটে। হাইকোর্টের উল্টোদিকে। পুরনো একটা বাড়ির ভেতর ঝাঁ-চকচকে অফিস ওদের। আদি জানে আজকের মিটিংয়ের ফলাফল শোনার জন্য গৌর অপেক্ষা করে আছে।

আসলে ওদের এই আবাসন প্রকল্প নিয়ে একটা স্থানীয় সমস্যা হচ্ছে। কিছু লোকাল লোক চাইছে কাজটা পণ্ড করতে। যদিও মস্তান হিসেবে তারা আসছে না, আসছে সমাজসেবী হিসেবে। কিন্তু আদি খবর নিয়েছিল ওদের সম্বন্ধে, এবং জেনেছিল যে, ওরা আসলে মস্তানই।

এমনিতেই অর্থনৈতিক মন্দার বাজারে নানারকম প্রজেক্ট আটকে আছে। ঘরবাড়ির বুকিং খুব একটা হচ্ছে না। তার মধ্যে একটা প্রজেক্ট যদি ডিলেড

হয় তাহলে অবস্থা আরও খারাপ হবে।

ওই সমস্ত মানুষগুলোর দাবি হল যে, মার্চেন্ট মাল্টিপল্‌স যে-পরিমাণ জমি কিনেছে তার থেকে একটা অংশ বাচ্চাদের পার্ক করতে দিতে হবে। কারণ, জমিটা যখন কেনা হয়েছিল তখন মার্চেন্ট থেকে বলা হয়েছিল যে, আবাসনের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষদের জন্য এই জমির একটা অংশ থেকে একটা পার্ক তৈরি করে দেওয়া হবে।

আসলে সেটা ছিল জাস্ট কথার কথা। গৌর ভেবেছিল স্থানীয় ক্ষমতাশালী লোকদের কিছুটা দান-দক্ষিণা দিয়ে ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেবে। কিন্তু স্থানীয় রাজনৈতিক পালাবদল হওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। পার্টির ছত্রচ্ছায়ায় থাকা কিছু উটকো মস্তান সমাজসেবী হিসেবে এসে প্রজেক্ট বন্ধ করে দেবে বলে হট্টগোল করছে।

'উটকো মস্তান' কথাটা অবশ্য গৌরের কয়েনেজ। আর প্রথম দিকে আদিও তেমন ভাবত। কিন্তু এখন, মানে, আজকের মিটিংয়ের পর আর ভাবছে না। কারণ, রোগা চাপদাড়ির একটা ছেলে আজ মিটিংয়ে ছিল যে যথেষ্ট গুছিয়ে কথা বলতে পারে। উটকো মস্তানরা এমন হয় না। ছেলেটাকে সবাই বিল্টু বলে ডাকছিল। যদিও ভালনাম ত্রয়ণ। ছেলেটি বারাসতের নয়। আরও দূরে থাকে। ছেলেটির ভেতরে একটা অদ্ভুত গোঁ দেখেছে আদি। যেন পণ করে নিয়েছে যে, পার্ক না করে দিলে কিছুতেই আবাসন করতে দেবে না। ছেলেটি যে ভোগাবে খুব, বুঝতে পারছে আদি। এই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছেলেটির ভেতরে যে-ধরনের প্রতিরোধ রয়েছে তা অনেকদিন দেখেনি আদি।

অনেকদিন মানে কতদিন? মাস দেড়েক? তাতেই কি অনেকদিন মনে হচ্ছে? সে থাকতে তো এমনটা মনে হয়নি। তাহলে দাদাভাই চলে যাওয়ার পর এমন মনে হচ্ছে কেন? গত দেড় মাস দাদাভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই ওর। না, সেইসব কারণের জন্য নয়, এমনিই যোগাযোগ করা হয়নি আদির। এমনি? নাকি আদির ভেতরে একটা সুক্ষ্ম অপরাধবোধ রয়েছে?

ও তো জানত, তবু ও এমনটা হতে দিল! কেন দিল? আদি কারও জন্য কেয়ার করে না বলে? ওর কারও প্রতি লয়ালটি নেই বলে? ও বিশ্বাস করে না লয়ালটি বলে কিছু আছে বলে? নাকি দাদাভাইকে ভালবাসত না বলে?

প্রশ্ন। জীবন নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন আদির। কিন্তু উত্তর বিশেষ পায় না।

উত্তর চব্বিশ পরগনা ওর কাজের জায়গা হলেও দীর্ঘদিন চাপাডাঙায় যায়নি। অবশ্য তেমন দরকারও পড়েনি। দাদাভাই সব সামলে রেখেছে ওখানে গিয়ে। তবু দাদাভাই ওখানে যাওয়ার আগে তো যেত প্রায়ই। এমনিই সব দেখাশোনা করে আসত। কিন্তু এখন যায় না। দাদাভাইকে এড়াবে বলেই কি?

দাদাভাই কি খুব অসুবিধে করেছিল সবার? হঠাৎ তবে এমন হল কী করে? বাড়িতে চিরকালই সম্পত্তি নিয়ে ভিতর ভিতর একটা চাপা টেনশন চলে। তা বলে তার জন্য এমনটা করতে হবে? না, আদি এসব ব্যাপারে থাকে না। অফিস করে, আড্ডা মেরে বা ডিস্‌কে গিয়ে সময় কেটে যায় ওর। আর সত্যি বলতে কী, বাড়ির লোকজনও বেশ ভয় পায় ওকে। ও কখন যে কী বলে দেবে সে ব্যাপারে বাবা, মা, সবাই খুব তটস্থ থাকে। আসলে আদি তো বাবা-মাকে উলটোপালটা কথা বলেওছে। আর এখনও বলে। দাদাভাইয়ের মতো এমন চুপ করে থাকার পাত্র নয় আদি। অন্যের ক্ষেত্রে আদি চুপ করেই থাকে। তেমন হলে তো দাদাভাইয়ের জন্য গলা ফাটাত। তা তো করেনি। বরং সে রাত্রে বাড়িতেই ফেরেনি। মদ খেয়ে, ডিস্‌ক হপিং করে কাটিয়ে দিয়েছিল রাতের অধিকাংশ সময়। তারপর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সত্যিই সেই ঘুম কি আজও ভেঙেছে?

মাস দেড়েক ধরে এই কথাগুলো কেমন যেন খোঁচাচ্ছে আদিকে। আগে হত না কিন্তু এখন এমন কেন হচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছে না। গত দেড় মাসে কি সেক্স কমিয়ে দিয়েছে আদি? তাই কি এমন হচ্ছে?

নিজেরই হাসি পেল। ও জানে এমনটা নয়। তবু মনে হল। গত তিনদিন কারও সঙ্গে শোয়নি আদি। আজ হলে চারদিন হবে। যা ওর কাছে রেকর্ড। রেকর্ড যাতে না হয় সেটা দেখতে হবে। আসলে রিনা, দিয়া বা শালিনী এখন কলকাতায় নেই। তবে মহুল আছে। কিন্তু মহুল কি দেবে? মহুল আজকাল আর তেমন পাত্তা দেয় না আদিকে। দেখা যাক, কিছু না হলে আজ মহুলকে ট্রাই নেবে।

মহুল এক অদ্ভুত মেয়ে। কী জেদি আর একগুঁয়ে রে বাবা! ছোট থেকে পাশের বাড়িতে থাকত। কিন্তু কোনওদিন পাড়ার কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যেত না। নিজের খেয়াল আর অ্যাম্বিশন নিয়ে থাকত। মহুলকে প্রথম থেকেই পছন্দ ছিল আদিত্যর। কিন্তু মহুল পাত্তা দিত না। আসলে কাউকেই পাত্তা দিত না মহুল। তাতে যেন আরও কাতর হয়ে পড়ত আদি।

একবার ক্লাস টেনে পড়ার সময় তো সত্যি সত্যি হাতে কম্পাস ঢুকিয়ে রক্ত বের করে মহুলের নাম লিখেছিল একটা চিঠিতে। তবে শুধু নামটাই লিখেছিল। পুরো চিঠিটা লেখেনি। অত রক্ত যে দিতে পারবে না সেটা ভালই বুঝেছিল আদি। তবে চিঠিটা পৌঁছে দিয়ে খুব সাবধানে আদি বলেছিল, 'তোমার নামটা আমার রক্ত দিয়ে লেখা।'

ক্লাস ইলেভেনের মহুল ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'কেন? পেনের কালি ফুরিয়ে গিয়েছিল? না যাত্রা দেখছিস আজকাল বেশি? ইউ বয়েজ আর ইনকরিজব্‌ল। তো বল, আমায় তোর জন্য কী করতে হবে? চুমু খাবি। নে খেয়ে যা। বুকে হাত দিবি। দে। তারপর আমায় রেহাই দে। এসব মেলোড্রামা আমার সামনে আনবি না।'

প্রায় পালিয়ে এসেছিল আদি। কষ্টে দু'রাত ঘুমোতে পারেনি। মাধ্যমিকের সিলেকশনে নম্বরও কমে গিয়েছিল। তারপরও বেশ কিছুদিন লেগেছিল মহুলের শক থেকে নিজেকে বের করে আনতে।

সেই আদিকে দেখলে এই এখনকার আদির হাসি পায়। সেই গালে হালকা দাড়ি, রোগা আর ভিতু ছেলেটার অসহায় মুখ মনে পড়লে আদির মনে হয় কী বোকা, কী বোকা ছিল ও! 'জিনিস'-এর জন্য এমন মনখারাপ করে কেউ!

তবে সে সময় তো আর মেয়েদের 'জিনিস' ভাবত না ও। যাজ্ঞসেনীকে তো নয়ই। যাজ্ঞসেনী আইয়ার। মা বাঙালি, বাবা কেরলের লোক। যাজ্ঞসেনীর বোন কৃষ্ণা পড়ত আদিদের কেমিস্ট্রি ব্যাচে। আর সেখানেই মাঝে মাঝে বোনের সঙ্গে আসত কলকাতার নামকরা কলেজের সেকেন্ড ইয়ার কেমিস্ট্রি অনার্সের যাজ্ঞসেনী। প্রথম দিনই আদিকে দেখে বলেছিল, 'আরে, আই হ্যাভ সিন ইউ আরলিয়ার। আমাদের কলেজের সায়েন্স ক্যাম্পে তুমি এসেছিলে না লাস্ট ইয়ারে? আরে সেই যে বার্নার উলটে তুমি আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলে খাতায়। তোমার দাদা তাড়াতাড়ি নিভিয়ে দিয়েছিল। হি ওয়াজ দি এক্স স্টুডেন্টস রিপ্রেজেনটেটিভ। কান্ট রিমেম্বার হিজ নেম, বাট আমার মনে আছে যে, হি হ্যাড বিউটিফুল আইজ। বিগ অ্যান্ড ব্লু আইজ। তোমার দাদার অমন নীল চোখ আমি বাঙালিদের মধ্যে দেখিনি। হাউ ইজ হি নাউ?'

যাজ্ঞসেনীর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছিল আদি। ওই নরম হাওয়ায় উড়তে থাকা যাজ্ঞসেনীর চুল। ওর হালকা জোড়া ভুরু। বিশাল বড় আকাশজোড়া চোখ। ওর ঘাড়ের কাছে ভেঙে পড়া চুলের কুচি। ছোট ছোট সার দেওয়া বিজ্ঞাপনের মতো দাঁতের সারি। গোলাপি আঙুল। এইসব দৃশ্য যেন ক্রমাগত ছুরি দিয়ে আঘাত করছিল আদিকে। গন্ডগোল হচ্ছে, ঘোরতর গন্ডগোল হচ্ছে বুঝতে পেরেও যেন নিরুপায় হয়ে তাকিয়েছিল আদি। সেই ছুরিকাঘাত থামানোর মতো জোর যেন ছিল না ওর। একসময় কথা থামিয়ে হাত নেড়ে চলে গিয়েছিল যাজ্ঞসেনী, কিন্তু বুঝতে পারেনি যে, পিছনে একজন মানুষ পড়ে রইল। প্রেমে পড়ে রইল সে।

আদির সেই রাতে মনে হয়েছিল, এই মেয়েটির জন্য যা খুশি তাই করতে পারে ও। এই মেয়েটির জন্য শরীরের সমস্ত রক্ত দিয়ে চিঠি লিখতে পারে। পারে সারা জীবন নিজের বুকের ভেতর একে ধরে রাখতে। সাতদিন নাওয়া-খাওয়া প্রায় ভুলে গিয়েছিল আদি। তারপর এসেছিল সুযোগ, যাজ্ঞসেনীর কাছে যেতে পারার সুযোগ। তাই কৃষ্ণার জন্মদিনের নেমন্তন্নটা দু'হাত দিয়ে ভগবানের প্রসাদের মতো গ্রহণ করেছিল আদি। কিন্তু কিচ্ছু হয়নি। কিচ্ছু করতে পারেনি আদি। যাজ্ঞসেনী ভেসে বেড়িয়েছিল দূরে। আর তার কিছুদিন পর আদি জেনেছিল যাজ্ঞসেনীর মনের কথা।

চাঁদনিতেও নামলে হত, কিন্তু নামল না আদি। এসপ্ল্যানেডে নামবে। একটা ছোট্ট কাজ সেরে তারপর অফিস যাবে।

এসপ্ল্যানেড স্টেশনটা যেন কুয়াশা দিয়ে তৈরি। অন্য কোনও স্টেশন নয়, এই স্টেশনটায় নামলেই কেন যে এটা মনে হয় আদির, ও নিজেই জানে না। মনে হয় দূর কোনও পাহাড়ের প্রচুর কুয়াশা এসে ঢুকে পড়েছে এই মাটির তলায়। কী আছে এসপ্ল্যানেড স্টেশনে যে, এমন মনে হয়? কাউকে এই কথাটা বলতে পারে না আদি। ও জানে কেউ পাত্তা দেবে না। তাছাড়া ভাববে ইয়ার্কি মারছে। আসলে আদির ইমেজের সঙ্গে যেন এইসব কথাবার্তা খাপ খায় না।

আদি ভাবে যে, এই ইমেজ রক্ষা করতে গিয়ে বা ভাঙতে না পেরে কত মানুষের যে ঠিকমতো বাঁচাই হয় না। কত মানুষ যে বলতেই পারে না সে আসলে কী চায়? কত মানুষ ভাল করে তাকাতেই পারে না তার গোপন পছন্দের মানুষটার দিকে। ইমেজ আসলে একটা কারাগার। নিজেকে বন্দি করে রাখার জায়গা।

আদি ঘড়ি দেখল। এখনও প্রচুর সময় আছে। গৌর বলেছে সন্ধে সাতটার মধ্যে ফিরলেই হবে। ভিড় ঠেলে প্ল্যাটফর্মে পা দিল আদি।

'এই আদিত্য, এই আদিত্য।' গলাটা শুনে মুহূর্তের জন্য থমকে গেল আদি। আর সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে গুঁতো আর বিরক্তিসূচক শব্দ ভেসে এল একরাশ। আদি দ্রুত ভিড়ের স্রোতকে বাধা না দিয়ে সরে গেল একটা থামের পাশে। প্রচুর মানুষ পিঁপড়ের মতো সার দিয়ে হাঁটছে। তার ভেতর একজন নির্দিষ্ট মানুষকে ঠাহর করা খুব মুশকিল। তবু এদিক-ওদিক তাকাতে থাকল আদি। গলার স্বরটা বেশ চেনা লাগছে। কিন্তু ডাকছে কে? পুজোর মুখের কলকাতা এখন। শহরের সবাই যেন শপিং করতে বেরিয়ে পড়েছে একসঙ্গে। রংচঙে এত মানুষ আর প্লাস্টিকের ব্যাগের খচমচের ভেতরে কে ডাকল আদিকে? ও ভাল করে চারিদিকে তাকাল।

আচমকা ঠাস করে থাপ্পড় পড়ল মাথায়, 'এই শালা অন্ধ, দেখতে পাচ্ছিস না?' আদি আচমকা থাপ্পড়ে ঘাবড়ে গিয়ে পিছনে তাকাল। আরে, আবেশ!

আবেশ গোস্বামী। দাদাভাই আর আদির কমন ফ্রেন্ড। ছেলেটা একটু অদ্ভুত। বিশাল বড়লোক মামার বাড়িতে আশ্রিতের মতো থাকে। ছোটবেলায় ওর বাবা অন্য একজনকে বিয়ে করে চলে গিয়েছিল বাড়ি ছেড়ে। আর সেই দুঃখে ওর মা ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করে। তারপর থেকে আবেশ মামার বাড়িতে মানুষ। ওর ভাষায়, 'মামার বাড়িতে অমানুষ।'

মামা আবেশকে নিজেদের চালের আড়তে বসাতে চেয়েছিল। তাতে আবেশ বসেনি, বরং বলেছিল, 'আমি অমন চালবাজ হতে পারব না।' আদি মাঝে মাঝে ভাবে যে, আবেশের চলে কী করে?

আবেশ ছবি আঁকা শেখায়। আবেশ মাঝে মাঝে কোনও প্রোডাক্টের প্রোমোশনের জন্য খেপ খাটে। কেটারিংয়ের দলে ভিড়ে কখনও পরিবেশন করে আসে। কোনও কনট্রাক্টরের অধীনে সাত-দশদিন কাজও করে দেয়। আর এসব সাত-পাঁচ কাজ নিয়ে জিজ্ঞেস করলে ও বলে, 'এসব করতে করতেই একদিন এমন একটা দাঁও মারব না, তোরা সক্কলে চমকে চোদ্দো হবি।'

না, এখনও পর্যন্ত চোদ্দো তো দূরের কথা, একও হয়নি আবেশের।

তবে ওর এই মনখারাপ না করা, সদ্যহাস্যময় চেহারাটা ভাল লাগে আদির। মনে হয় এই পৃথিবীর কোনও কিছুই স্পর্শ করতে পারে না আবেশকে।

'কী রে শালা? চিনতে পারছিস না?' আদির থতমত মুখটা দেখে চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আবেশ, 'মাস চারেক ছিলাম না আর তাতেই শালা ভুলে মেরে দিলি আমায়? ভুলে গেলি আমি বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলাম বলেই রিনাকে প্রথমবার লাগাতে পেরেছিলি?'

'তোকে কি ভুলতে পারি রে দালাল?' আদি শব্দ করে হাসল, 'তা হঠাৎ এখানে? এতদিন কোথায় ছিলিস?'

'আমি? কুকুর ধরছিলাম।' আবেশ ভারিক্কি গলায় বলল।

'কী ধরছিলি?' আদি উত্তর শুনে একটু ঘাবড়ে গেল।

'কুকুর ধরছিলাম রে, কুকুর ধরছিলাম।' আবেশ এমন করে বলল যেন টেররিস্ট ধরছিল।

'কুকুর! মানে?' আদি বুঝতে পারল না আবেশ কী বলতে চাইছে।

'মানে কুকুর ধরছিলাম। ডগ রে ডগ। শালা নিজের নাম বুঝতে পারছিস না?'

আদি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কুকুর ধরছিল! ছেলেটা বলে কী?

'মিজোরাম গিয়েছিলাম। ওখানে কুকুর খায় ওরা। তারপর অসম, ত্রিপুরা ইত্যাদি জায়গায় স্ট্রে ডগ ধরছিলাম।'

'ইয়ার্কি মারছিস না তো?' আদি দেখল দমদমের দিকে যাওয়ার মেট্রো ঢুকল। আবেশ কোন দিকে যাবে?

আবেশ হাসল, 'আরে না না, ইয়ার্কি মারব কেন রে? আমি একটা কনট্রাক্টরের হয়ে কাজের জন্য গিয়েছিলাম নর্থ-ইস্টে। সে ব্যাটা হাফ কাজ করে পার্টির টাকা মেরে পালিয়ে গিয়েছিল। আর আমরা গিয়েছিলাম ফেঁসে। তা সেখান থেকে একজনের হয়ে কুকুর ধরার কাজে লেগে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোকের আরও ব্যবসা ছিল। একটা মেয়েও ছিল। ভাবলাম যদি জামাই হওয়া যায়। কিন্তু সেই মেয়ে শালা বহুত খচ্চর। নিজের একটা ডোবারম্যান ছিল। লেলিয়ে দিল। শালা গত চার মাস কুকুরে কুকুরে জেরবার হয়ে গেছি একেবারে। তাই চলে এলাম।'

আদি ঘড়ি দেখল। আবেশ বকতে শুরু করলে মাথা খারাপ করে দেবে। দেরি হয়ে যাবে খুব। তখন আবার গৌরের থেকে ঝাড় খাবে। ফলে এখন যেতে হবে ওকে।

আদি বলল, 'শোন না, আমায় অফিস যেতে হবে একবার। তুই বাড়িতে আয় একদিন। গল্প হবে।'

'বাড়িতে? চাঁদু তুমি বাড়িতে থাকো কখন? অফিস, কফি শপ, ডিস্ক আর রংবেরঙের মেয়েছেলের বিছানা ছাড়া তোমায় পাওয়া যায়?'

আবেশ এমন করে কথাগুলো বলল যে, আশপাশের লোকজন ফিরে

তাকাল ওদের দিকে। খুব বাজে লাগল আদির। আবেশের হইহই করার স্বভাবটা মাঝে মাঝে খুব অস্বস্তিতে ফেলে ওকে।

আদি বলল, 'বাজে কথা রাখ। তোর মাইরি সেন্স হবে না কোনওদিন। এই যে আমার কার্ড নে। অফিসে আসিস।'

'কার্ড?' আবেশ হিহি করে হাসল, 'আজকাল মেয়েদের সঙ্গে শুয়েও কি এমনভাবেই কার্ড দিস? দেখাস যে, দেখো কার সঙ্গে তুমি ইয়ে করলে?'

'শালা, তোর সঙ্গে কি শুয়েছি?'

আবেশ চোখ টিপল, 'চাস নাকি? আজকাল শালা সবার কী হয়েছে বল তো?'

'আমি আসছি। তুই ভাট বকে যা।' আদি এগোতে গেল।

'শোন না, তোর সেন্স অফ হিউমারটা বরাবর খারাপ।'

'এগুলো ননসেন্স হিউমার। যাক এবার যেতে হবে আমায়। ওই দেখ আর-একটা মেট্রো ঢুকছে।'

'ও কে, রাগ করিস না ভাই। শোন না, আমি একদিন তোদের অফিসে যাব। ছোট্ট একটা দরকার আছে। ভয় পাস না। টাকাপয়সা চাইব না।'

আদি হাসল, 'আসিস অফিসে। এখন ভাগ। আমাকেও যেতে দে।'

কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে আচমকা ঝকঝকে রোদ্দুরে এসে পড়ল আদি। পুজোর মুখের কলকাতা একদম ছড়িয়ে রয়েছে সামনে। এত লোক কীভাবে সামলায় এই শহর? আদি দেখল হাতে ব্যাগ নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো মানুষজন খানিকটা যেন ছোটাছুটিই করছে।

বিরক্তি নিয়ে ফুটপাথে নামল আদি। লোকের সঙ্গে ধাক্কা না মেরে এগনোর উপায় নেই। নেহাত খুব দরকার, তাই এখন এসেছে। বিখ্যাত এক পরোটার দোকানের দু'চারটে দোকান পরেই ক্যামেরা সারাইয়ের দোকান। সেখানেই যেতে হবে আদিকে। দোকানটা অনেক পুরনো। কিন্তু ক্যামেরাটা এরা খুব ভাল সারায়।

ঠাকুরদার একটা ভাল ক্যামেরা ছিল। ঠাকুরমা সেটা দিয়েছিল দাদাভাইকে। যদিও তা নিয়ে জলঘোলা হয়েছিল বিস্তর। মানে বাবা আর মা-ই মূল জলটা ঘুলিয়েছিল। কিন্তু ঠাকুরমা শোনেনি। ঠাকুরমা কারও কথা শুনত না। দাদাভাইকে নিজের বুকের কাছে আগলে রাখত।

মায়ের বক্তব্য ছিল যে, নাতি তো আদিও। তাহলে আদি পাবে না কেন? আদি তখন ক্লাস টেনে পড়ত। ওর মনে হয়েছিল যে, মা আর বাবা ফালতু ঝামেলা করছে। ওর ছবি তোলার প্রতি আগ্রহই নেই। তাহলে ক্যামেরা নিয়ে কী করবে ও? আর অন্য দিকে দাদাভাই ছবি বলতে পাগল। তো দাদাভাইকে ক্যামেরাটা দিয়ে ভালই করেছে ঠাকুরমা। কিন্তু বাবা-মাকে কে বোঝাবে? দাদাভাইকে তো দু'চক্ষে দেখতে পারে না ওরা। কেন পারে না সেটা জানত আদি। কিন্তু, সেটা কি খুব ন্যায্য কারণ? আদির তো মনে হয় এর পিছনে অন্য একটা কারণ আছে। বাবা-মা না বললেও সেটা আন্দাজ করে ও।

দাদাভাইয়ের তিন-চারটে ক্যামেরা। তার মধ্যে দুটো ডিজিটাল এসএলআর। তবু দাদাভাইয়ের এই মান্ধাতা আমলের ক্যামেরাটা যে কী ভাল লাগত কে জানে! সেটাই একটু চোট পেয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে। না, দাদাভাইয়ের হাত থেকে নয়। আদির হাত থেকে পড়েই। চলে যাওয়ার আগে দাদাভাই নিজে এসে এটা দিয়ে গিয়েছিল আদিকে। আদি কিছু বলেনি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। আসলে বলেনি না, বলতে পারেনি। অপরাধী মনে হচ্ছিল নিজেকে।

প্রায় সপ্তাহ দুয়েক আগে নিজের আলমারিটা খুলে দরকারি একটা কাগজ খুঁজছিল আদি। তখনই হঠাৎ হাতের ধাক্কায় ক্যামেরাটা মাটিতে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল। মানে বাইরে ভাঙেনি। কিন্তু ক্যামেরার ভেতরটা কয়েন ভর্তি কৌটোর মতো ঝকং-ঝকং করছিল। তখন নেট ঘেঁটে এই দোকানটার নাম পেয়েছিল আদি। আজ ক্যামেরাটা ডেলিভারি নেওয়ার দিন।

ভিড় এড়িয়ে দোকানে গিয়ে ক্যামেরা নিতে আরও আধঘন্টা কেটে গেল। দোকান থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকাল আদি। হঠাৎ কোত্থেকে এত মেঘ এল! শহিদ মিনারের মাথার ওপর এক বস্তা কালো তুলো কে যেন উলটে দিয়ে গেছে। মেঘ জিনিসটা দু'চক্ষে সহ্য করতে পারে না আদি। বৃষ্টি, কাদা, পট হোল্‌স, জ্যাম, টেলিফোন বিকল, হাজারও সব সমস্যা। এবার ভাল বৃষ্টি হয়নি বর্ষাকালে। মনে হচ্ছে পুজোতে ভালই ঢালবে। দু'দিন পরেই মহালয়া। বৃষ্টি হলে কোটি কোটি টাকার সব পুজোর যে কী হবে!

ওদের সুকিয়া স্ট্রিটেও বেশ কয়েকটা বড় পুজো হয়। বিশেষ করে ওদের পাড়াতে তো হয়ই। দাদাভাই পুজোর আগে আয়োজনে খাটাখাটনি করত খুব। কিন্তু সপ্তমীর সকালবেলাতেই নিজেকে গুটিয়ে নিত। কেন নিত কে জানে! কোনও পুজোয় দাদাভাইকে পায়নি ও। তবে আদির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাদাভাইয়ের সঙ্গে দূরত্বও বাড়ছিল ওর। আর-একটা সময় পর থেকে দাদাভাই থাকল, কি গেল, সেসব পাত্তাও দিত না আদি।

পাড়ার পুজোয় আদি ঢোকে না কোনওদিনই। এসব উটকো ঝামেলা মনে হয়। আর যেহেতু সবাই আদির তিরিক্ষি মেজাজের কথা জানে, ওকে বিশেষ ঘাটায়ও না কেউ। পুজোর দিনগুলোয় ও নিজের পরিচিতদের আড্ডায় যায়। আর প্রচুর ড্রিঙ্ক করে। পুজো নিয়ে আর পাঁচটা বাঙালির মতো মাতামাতি ওর নেই।

তবে নিজে যতই পুজোর থেকে দূরে সরে থাকুক না কেন, আদি পুজোর ইকনমিক ইমপ্যাক্টটা বোঝে। তাই বৃষ্টি হলে কত মানুষের যে কত টাকা মার যাবে, সেটা ভেবে একটা অস্বস্তি হয় ওর।

হঠাৎ মোবাইলটা বেজে ওঠায় সচকিত হল আদি। গৌরের ফোন। ও ফোনটা ধরল, 'হ্যাঁ, স্যার। আয়াম অন মাই ওয়ে।'

'আরে ইয়ার, তু তো হামেশা ওয়ে মে হি রহতা হ্যায়। সুন এক বাত। মেরা এক মিটিং হ্যায়। আচানক ফিক্স হুয়া হ্যায়। তো, জরা লেট হোগা মেরা। তুই একটু ওয়েট করিস। আই হ্যাভ সামথিং টু টেল ইউ। কেমন?' গৌর মাঝেমধ্যে তুই করে বলে আদিকে। বলে, 'তু তো মেরা ছোটা ভাই হ্যায়।' আদি কিছু মনে করে না। গৌর খুশি থাকলেই হবে। আর গৌরকে খুশি রাখে ও। আসলে গৌর কখনও প্রশ্ন করে না আদির টাকাপয়সা সামলানো নিয়ে। ঘুষ-টুস যা দিতে হয় তাতে আদির কথাই বিশ্বাস করে গৌর। আর আদিও যথাসম্ভব সততা বজায় রাখে। হ্যাঁ, যথাসম্ভব। পুরোটা নয়। প্রতিটা ঘুষে ও পাঁচ পারসেন্ট কাটমানি খায়। আদির এসব ব্যাপারে ছুঁতমার্গ নেই। ওর মনে হয় যে, সমুদ্র থেকে এক ঘটি জল তুললে সমুদ্রের কিছু যায় আসে না। তবে হ্যাঁ, গৌরের কাজকর্ম খুব মন দিয়ে করে ও। সেখানে ফাঁক রাখে না।

'আরে ইয়ার তু সোচতা বহুত হ্যায়। ডোন্ট থিঙ্ক টু মাচ। কুচ রিপ্লাই তো দে।'

'স্যার আপনি বলেছেন যখন, আমি থাকব।'

গৌর শব্দ করে হাসল, 'এক আচ্ছা সারপ্রাইজ হ্যায় তেরে লিয়ে। আই থিঙ্ক ইউ উইল লাইক ইট। চলো', বাই ফর নাউ।'

আদি হাসল মনে মনে। গৌর সবার সঙ্গে এমন করে কথা বলে যেন তার কথাই চিন্তা করছে সবসময়। কিন্তু আদি জানে এই মিষ্টি কথার মানুষটার আড়ালে কী ভয়ংকর এক মানুষ রয়েছে। নিজের কাজের জন্য খুন-জখম করা গৌরের কাছে নস্যি।

এই বারাসতে জমিটা নিয়ে যে ঝামেলা হচ্ছে, তাতে ও জানে যে, গৌরের বিরক্তি বাড়ছে। সেটা যদি সহ্যের বাইরে চলে যায় তাহলে গৌর কিছু করতে পারে।

তাই আদি জানে 'ইউ উইল লাইক ইট-টা আসলে গৌরীয় বচন মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

এক মুহূর্ত ভাবল আদি। অফিসে কাজ নেই তেমন। তাই হুড়োহুড়ি করে না গেলেও চলবে। ও ভেবেছিল ট্যাক্সি নিয়ে যাবে। কিন্তু এবার ভাবল, এখান থেকে অফিসের দূরত্ব একটু বেশি হলেও, হেঁটেই যাবে অফিস। হাঁটতে খারাপ লাগে না আদির।

আবার ভিড় ঠেলে রাস্তা পেরিয়ে অন্যদিকের ফুটপাথে গিয়ে উঠল আদি। পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে হেড সেটটা লাগিয়ে নম্বর ডায়াল করল। দেখা যাক কথা বলতে বলতে হাঁটা যায় কিনা।

কলার টিউনে ভারী গলায় একটা পুরনো ইংরেজি গান চলছে। ধরতে দেরি করছে কেন? আদি একবার মাথা ঘুরিয়ে বিপুল জনস্রোত দেখল।

তারপর চুলে হাত বোলাল। কলার টিউনে গান বাজছে। সত্যি বড্ড দেরি করছে মেয়েটা। তাহলে কি...

খট শব্দে ফোনটা ধরল কেউ, 'হ্যালো? আদিত্য?' আদি থমকাল। বহু দিন পর গলাটা শুনছে। একসময়ের বন্ধুর গলা।

ও দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'হাই কনভ।'

'হ্যালো? তোর খবর কী?' কনভ হালকাভাবে জিজ্ঞেস করল।

আদি ভিড় ছাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে আকাশের দিকে তাকাল। মেঘ গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। মাতব্বরি মেরে যে, হাঁটতে গেল, এতে হিতে বিপরীত না হয়! হঠাৎ বৃষ্টিতে যদি ভিজে যায়? ছাতা তো নেই।

'হ্যালো আদি! হ্যালো...' কনভ বুঝতে পারছে না আদি লাইনে আছে, না কেটে গেছে।

লাইন। শব্দটা বড় অদ্ভুত। বিশেষত বাঙালির কাছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব জায়গায় লাইন দিতে হয় মানুষকে। তারপর লাইন বাড়ছে, লাইন করতে হবে, লাইন মারছে— এমন নানা রকম ব্যাপার-স্যাপার তো আছেই। এই কনভের কথাই ধরা যাক না। আদির চেয়ে দেড়-দু' বছরের ছোট, কিন্তু তুই-তোকারির বন্ধু। তবে ছিল, এখন আর নেই। এখন তো বহু দিন কথাই হয় না। আর আগে আদিদের বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকত। মহুলের সঙ্গে তো সেখানেই দেখা কনভের।

'আছি, আছি।' সামান্য ক্লান্ত গলায় বলল আদি। কনভকে স্রেফ নাচায় মহুল। তেমন পাত্তাই দেয় না। আর সে ব্যাটা এঁটুলির মতো লেগে থাকে মহুলের পিছনে। বিশাল বড়লোকের ছেলে। কাজকর্ম তো করতে হয় না বিশেষ। পঁচিশ লাখের গাড়ি চড়ে। দশটা ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঘোরে। শুনেছে খুব শিগগিরি বিদেশে চলে যাবে। নিজেকে দায়িত্ব নিয়ে এক পয়সাও রোজগার করতে হয় না। মহুলের কোনওদিন এমন আতা টাইপের ছেলে পছন্দ হয়? তবু মহুল কেন কনভকে এখনও ঝেড়ে ফেলেনি তা আদি জানে না।

'ক্যা ইয়ার বাত নেহি কর রাহা হ্যায় তু? কী বলতে ফোন করলি?' কনভের গলায় অসহিষ্ণুতা।

'মহুলের সঙ্গে দরকার ছিল।' আদি সামনের সিগনাল বন্ধ দেখে হালকা হেঁটে রাস্তা পার হল। এ দিকটা বেশ ফাঁকা। বড় বড় গাছ আছে। একটু দূরে ইডেন গার্ডেন্স দেখা যাচ্ছে। তার উঁচু লাইট টাওয়ারগুলো ঘিরেও যেন মেঘেদের জটলা বাড়ছে।

'কী দরকার রে?' কনভ হালকা চালে প্রশ্নটা করল। কিন্তু প্রশ্নটার ভেতরে একটা পোড়া গন্ধ পেল আদি। জ্বলছে, কনভ জ্বলছে।

আদি বলল, 'সেটা পার্সোনাল। তোকে বলব না। আর তুই মহুলের ফোন ধরেছিস কেন? মহুল কই?'

'ও একটু লু-তে গেছে, আর আমি ওর ফোন ধরেছি কেন তোকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?' কনভ হঠাৎ রেগে গেল।

মনে মনে হাসল আদি। ভাবল, ও তো জানে না আদির সঙ্গে মহুলের কেমন সম্পর্ক। ও ভাবল কনভকে নিয়ে একটু মজা করা যাক।

'শোন কনভ, রেগে লাভ নেই। আমার আর মহুলের মধ্যে একটা কনফিডেনশিয়াল রিলেশন আছে। সেটা, তোর সামনে ওপেন করব না। তুই ফোন রাখ, আমি পাঁচ মিনিট পরে ফোন করব।'

'শালা,' কনভ চিৎকার করল, 'দু'পয়সার যোগ্যতা নেই আর তুই এখানে মহুলকে নিয়ে এমন বলছিস? জানিস তোর মতো পাতি এগজিকিউটিভ আমার কফি এনে দেয়?'

আদি শব্দ করে হাসল। ওর মজা লাগল খুব। প্রিয় বন্ধু আজ আর এমনি বন্ধুও নেই। আসলে বন্ধুর মধ্যে কখনও-সখনও এমন সব ঘটনা বা মানুষ চলে আসে যে, 'বন্ধু' শব্দটার মেটামরফসিস ঘটে যায়। ওদের মধ্যে কি সেটা হয়েছে? কীসের জন্য আজ ওরা এমন করছে?

'সে যাই বলিস। আমায় কিন্তু বি এসসি দু'বার দিতে হয়নি।' আদি বলল।

'ইউ ফাকিং...' কনভ আর কিছু বলার আগে ফোনে আর একটা গলা পেল আদি। মহুল।

'কার সঙ্গে এমন অসভ্যতা করছ? আর আমার ফোন তোমার হাতে কেন?' মহুল এমন করে কথাটা বলল যেন এক্ষুনি কনভকে কান ধরে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দেবে।

'আমি... মানে...' কনভকে তোতলাতে দেখে মজা পেল আদি।

'আমায় দাও।' মহুলের গলাটা এবার স্পষ্ট করে এল, 'হ্যালো, হু ইজ দিস?'

'হাই মহুল। আদি হিয়ার।'

'ও হ্যালো ফ...বাডি? 'ফ' দিয়ে বহুল প্রচারিত শব্দটা বলতে গিয়ে বলল না মহুল। নিশ্চয়ই কনভ আছে বলেই বলল না।

আদির হঠাৎ খেয়াল হল যে-প্রস্তাব দেবে, সেটা নিয়ে ও কনভের সামনে কথা বলবে কী ভাবে? ও ঠিক সময় ফোন করেনি। নিজের ওপরই বিরক্ত লাগল আদির। কনভকে রাগানোর জন্য অতক্ষণ কথা বলা একদম ঠিক হয়নি ওর।

'হাই, আরে কথা বলছিস না কেন?' মহুলের গলায় চিরপরিচিত বিরক্তি আর তাড়া।

'হ্যাঁ, এই তো...,' আদি নিজেকে গুছিয়ে নিল, 'এখন কি কথা বলা যাবে?'

মহুল বুঝল সংকেতটা। হালকা গলায় বলল, 'আদি এক সেকেন্ড,' তারপর কনভের উদ্দেশে বলল, 'আরে ফেচ মি সাম কোলা কনভ। আয়াম ডাইং অব থার্স্ট।'

আদি হাসল মনে মনে। কনভকে কাটাতে চাইছে মহুল।

দশ সেকেন্ড পর মহুল বলল, 'নাউ টক, হি ইজ আউট। কেন ফোন করেছিস? ওয়ান্না ফাক টুডে?'

বড্ড কাঠ-কাঠ কথা বলে মেয়েটা। আরে যেখানে শরীরী মিলনের কথা হচ্ছে, সেখান একটু ভালভাবে তা বলবে। না, যা ইচ্ছে তাই বলছে। মহুলকে নিয়ে আর পারা যায় না। আদি সাবধানে আর-একটা রাস্তা পার হয়ে ইডেন গার্ডেন্সের পাশের ফুটপাথ ধরে এগোতে এগোতে বলল, 'হ্যাঁ মানে... আজ কি তোমার...'

'ঝেড়ে কাশ না। লাগাবি তার জন্য কত ন্যাকামো!' মহুলের হুল বড্ড বেশি।

'তোমার কি এই আটটা নাগাদ সময় হবে?' আদি জিজ্ঞেস করল।

দীর্ঘশ্বাস শোনাল মহুল, 'না রে আদি। আজ নয়।'

'কেন? কত দিন আমরা বেড শেয়ার করি না বলো তো?'

'আরে বাবা, আমার এখন অন্যরকম দিন চলছে। দ্য রেড সি ইজ ফ্লোয়িং

ইয়ার। বোঝ ব্যাপারটা। ইউ হ্যাভ নক্‌ড অন দ্য রং ডোর ডিয়ার। গো ফাইন্ড সামওয়ান এল্‌স।'

যা বাবা! বিরক্ত লাগল আদির। শালা আজ দিনটা পুরো ফালতু। হাইকোর্ট যাওয়ার রাস্তায় ঢুকে ঘড়ি দেখল আদি। হঠাৎ অফিসে যেতে ইচ্ছে করছে না ওর। মনে হচ্ছে পার্ক স্ট্রিট গিয়ে কোনও বারে বসে যায়। নয়তো কলেজ স্ট্রিটের গোপন ডেরায় গিয়ে ধোঁয়া টেনে পড়ে থাকে। কারণ ছাড়া, একদম কোনও কারণ ছাড়াই ভদ্র সমাজের দু'পায়ের ফাঁকে লাথ কষিয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে কোনও পাহাড়ে।

'কী রে, মুড অফ হয়ে গেল?' মহুলের গলায় ইয়ার্কি।

'নাঃ। ঠিক আছে।'

'তোর তো অনেক ক্যান্ডিডেট। যা না একজনের কাছে।'

'আমি রাখছি।' মহুলের সঙ্গে আর কথা বলার কোনও পয়েন্ট নেই।

'ঠিক আছে। পরে কোনওদিন ফোন করিস।'

আদি কিছু বলার আগেই কট করে ফোনটা নিজেই কেটে দিল মহুল।

হাইকোর্টের গথিক চার্চের মতো চুড়োটা দেখে প্রতিদিনই, কেন কে জানে, গা শিরশির করে ওঠে আদির। আজও করল। এখানে আসলে হঠাৎ মনে হয় গোটা দৃশ্যটা উত্তমকুমারের যুগে ফিরে গিয়েছে। প্রচুর লোক সাদা-কালো জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সিনেমার যুগ। আর তার ভেতর আজও লাল কোট পরা রং-চটা সাইকেল নিয়ে জিঙ্গল পাগলাকে দেখতে পেল আদি।

লাল কোটটা অবশ্য তেমন লাল নেই আর। বরং মাছের জমাটবাঁধা রক্তের মতো কালচে লাল হয়ে গেছে। জিঙ্গল পাগলা কোটের তলায় একটা শতছিন্ন জামা পরে, যার রং এখন আর বোঝা যায় না। নীচের প্যান্টটা বেগুনি রঙের আর দু'পায়ে দু'রঙের দুটো ছেঁড়া স্নিকার। মাথায় একটা সোনালি রঙের ফিতে ফেট্টির মতো বাঁধা। কাঁচাপাকা চাপ দাড়ি আর রোদে পোড়া তামাটে মুখ দেখলে লোকটার বয়স আন্দাজ করা একটু মুশকিল হয়। তবে ষাট-পঁষট্টি তো হবেই।

কিছু মানুষ আছে যারা জিঙ্গল পাগলার টার্গেট। তাদের দেখলেই এঁকেবেঁকে সাইকেল চালিয়ে তাদের সামনে এসে দু'লাইন গান গায় জিঙ্গল পাগলা। তারপর নিখুঁত ইংরেজিতে বলে, 'হাই, আয়াম জিঙ্গল অ্যান্ড ইউ আর লিসনিং দ্য ফেমাস সংস। প্লিজ শেয়ার ইওর ফরচুন।' তারপর হাত পেতে দাঁড়িয়ে পড়ে।

এইসব টার্গেটদের একজন হল আদি। দেখা হলেই দু'টাকার একটা কয়েন জিঙ্গলের বরাদ্দ। কম দিলে জিঙ্গল নেয় না, বেশি দিলেও নেয় না। বরং বলে, 'গ্রিড ইজ আ ডেড্‌লি সিন।'

তবে রোজ রোজ এই পাগলামো ভাল লাগে না আদির। না, অবশ্যই দু'টাকার জন্য নয়। ওর ভাল লাগে না ওই নাটুকেপনার জন্য। জিঙ্গল পাগলার ওই সাইকেল চালিয়ে আসা, লাফ মেরে সাইকেল থেকে নামা, গান গাওয়া—এ সবটাই বড্ড নাটুকে মনে হয় ওর। মনে হয় বাড়াবাড়ি। তবু দু'টাকা দেয় আদি। কী করবে? গরিব মানুষ তো।

আজও গরিব মানুষটার নজর এড়াতে পারল না ও। ওকে দেখেই হইহই করে সাইকেল চালিয়ে এসে পড়ল ওর সামনে। তারপর যথারীতি লাফ দিয়ে নামল সাইকেল থেকে। সাইকেলের লগবগে স্ট্যান্ডটা নামিয়ে হাসল চওড়া করে। তারপর দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে গান ধরল, 'জিঙ্গল বেল জিঙ্গল বেল জিঙ্গল অল দ্য ওয়ে/ তোমার সমস্ত মার এখন আমার গেছে সয়ে,' গান শেষ করে হেসে দু'হাত পাতল আদির সামনে তারপর বলল, 'প্লিজ, শেয়ার ইওর ফুরচুন।'

দু'টাকা রেডি করাই ছিল আদির। ও দিয়ে দিল। জিঙ্গল টাকাটা কোটের ভেতরের পকেটে ঢুকিয়ে আবার সাইকেলে বসে চলে গেল অন্য এক শ্রোতার দিকে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আদি। পৃথিবীতে এক এক পিস পাগল আছে বটে! তবে জিঙ্গলের এই সাইকেলটা নিয়ে খুব কৌতূহল হয় ওর। কোনও পাগলের কাছে তো এমন সাইকেল দেখেনি ও। তাহলে? তাছাড়া লোকটা এত ভাল ইংরেজি বলে কী করে? আর গানের গলাটাও বেশ। লোকটা আসলে কে? ছদ্মবেশি কেউ নয় তো? কোনও গুপ্তচর-টর নয় তো? আদি জানে, এসব নয়, তবে কিছু তো একটা গল্প আছেই। আফসোস হয় আদির যে, কোনওদিন এটা জানতে পারবে না ও।

হাইকোর্টের মুখোমুখি বড় সাদা বিল্ডিংটাতেই আদিদের অফিস। মার্চেন্ট মাল্টিপল্‌স লিমিটেড। ওখানে মান্ধাতার আমলের লিফ্‌ট চলে। আর তার সামনে সবসময় কেরোসিনের দোকানের মতো লাইন। আদি এই ঠাকুরদা লিফ্‌টে ওঠে না। বরং কাঠের সিঁড়িটাই প্রেফার করে।

মার্চেন্ট মাল্টিপল্‌সের বড় পেতলের নেমপ্লেটটার সামনে দাঁড়িয়ে ঘাম মুছল আদি। ভেতরটা পুরো এসি। ঘাম গায়ে বসলে ঠান্ডা লেগে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা হবে। আসলে বৃষ্টি তো হল না। বরং মেঘ করে পুরোটা ভ্যাপসা হয়ে আছে। সত্যি, পুজোয় না...আদি কাচের ভারী দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল।

কাঠের সিঁড়ি, পুরনো লিফ্‌ট আর বুড়ো দাদুর মতো বাড়ির ভেতরে এই অফিসটা যেন টাইম মেশিন করে দুশো বছর এগিয়ে যাওয়া কোনও পৃথিবী।

গোটা অফিসটা মার্বেলে মোড়া। ওর ভার্টিকাল ব্লাইন্ডস দেওয়া ঘষা কাচের ঘর সব। আর তার সঙ্গে আছে ঘষা কাচেরই পাঁচ ফুট উঁচু পার্টিশন দেওয়া কিউবিক্‌ল। এর একটায় বসে আদি।

'হাই আদি।' কিউবিক্‌লে বসে নিজের রোলিফ্লেক্স ক্যামেরাটা সামনের টেবিলে রাখামাত্র ও ডাকটা শুনল। রায়না সেন। গৌরের পিএ। মেয়েটা কাজকর্মে যেমন চৌখস তেমন শরীরেও সাংঘাতিক। তবে খুব বুদ্ধিমতী। প্রথম প্রথম ট্রাই নিয়েছিল আদি। পাত্তা পায়নি। বরং রায়না এমন মুখ করে তাকিয়েছিল যে, আদির নিজেকে খুব চিপ মনে হয়েছিল। তখন থেকে রায়নার প্রতি নিজের মনোভাব বদলেছে ও। তবু আজ শরীর ভায়া একটু গণ্ডগোল করছে বলেই বোধহয় রায়নার বুকের দিকে দু'-এক পলক বেশি তাকিয়ে ফেলল আদি। বুকের বোতাম দুটো কি ভেসে উঠছে টপের ওপর দিয়ে?

রায়নার গলার স্বর কঠিন হল, 'আদি লিসন। মিস্টার কুটিনহো তোমায় ডাকছে। এক্ষুনি।'

স্যামুয়েল কুটিনহো ওদের পার্টিকল বোর্ডের জেনারেল ম্যানেজার। সপ্তাহে দু'দিন এখানে আসেন ভদ্রলোক। মানুষটি সত্যি খুব ভাল। বলেন, 'আমি জিএম বলে স্যার-ট্যার বলবে না। কল মি স্যাম।'

রায়নার গলার স্বরে সতর্ক হল আদি। নিজেকে মনে মনে ধমকও দিল একটু। তারপর সময় নষ্ট না করে স্যামের ঘরের দিকে গেল।

স্যামুয়েল কুটিনহো। বছর পঞ্চাশের মানুষ। মাথায় ইয়াব্বড় টাক। তবে থুতনিতে ফরাসি কাটের দাড়ি। স্যামকে বললে বলে, ফ্রেঞ্চ নয় পর্তুগিজ কাট। বলে ফরাসিরা আবার এমন শিখল কবে থেকে?

'কাম ইন,' আদি নক করার একটু পরে স্যামের গলা শুনল। ও দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। আর সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারে ফুটে থাকা ফুলের অদ্ভুত এক মিষ্টি গন্ধ এসে নাকে লাগল ওর।

একটি মেয়ে বসে রয়েছে স্যামের টেবিলের এদিকে। কিন্তু দরজার দিকে পিছন বলে মুখটা দেখতে পাচ্ছে না আদি। কে মেয়েটা?

'বোসো আদি।' স্যাম মেয়েটার পাশের চেয়ারটা আদিকে দেখাল। আদি বসল। নদীর পাশের ফুলেরা যেন মাতোয়ারা হল আরও একটু বেশি।

'মিট হার, আওয়ার নিউ পাবলিক রিলেশন অফিসার। ও-ও এবার তোমার সঙ্গে নর্থ চব্বিশ পরগনাটা কভার করবে।'

এবার মেয়েটাকে দেখল আদি। দেখল কর্মক্ষেত্রে ওর রাইভালকে। কিন্তু দেখামাত্র কোথায় কী যেন হল আদির। যেন এমন একটা ঘর শরীরে খুলে গেল যেটার কথা ও নিজেই জানত না। ওর মনে হল, সেই ঘরের মেঝেয় কে যেন রেললাইন পেতে দিয়েছে আর তার ওপর দিয়ে ঝিকঝিক করে চলছে একলা রেলগাড়ি।

কে এই মেয়েটা? এমন পেঁয়াজ রঙের শিফনে মুড়ে কে এল ওর সামনে? সামান্য চাপা নাক। সামান্য লালচে চুল। সামান্য টোল পড়া থুতনি। তবু এই অসামান্য রূপ কার? রেলগাড়িটা বুকের ঠিক মাঝখানে চক্কর খাচ্ছে,

খুব চক্কর খাচ্ছে, বুঝল আদি।

আদির ফ্যালফ্যালে দৃষ্টির সামনে মেয়েটা যেন সামান্য হাসল। লজ্জা পেয়ে গেল আদি। লজ্জা পেল ও? ও নিজের হতভম্ব ভাব কাটানোর জন্য বলল, 'হাই, আয়াম আদিত্য ব্যানার্জি।'

'হাই,' মেয়েটা ছোট্ট করে মাথা নাড়ল। আদির মনে হল বহু দূর কোনও চার্চে অর্গান বেজে উঠল যেন। যেন এবার প্রার্থনা শুরু হবে। মেয়েটা আবার বলল, 'আয়াম সিংহ, মালিনী সিংহ।'

আদি নিজের বুকের ভেতরের চক্কর মারতে থাকা রেলগাড়িটা দেখে বুঝতে পারল না, কেন সেটা এমন পাক মারছে। বুঝতে পারল না এই মেয়েটি কি অফ স্টাম্পের বাইরের বল না ইয়র্কার!

৫

উঠোনের ওপর এসে পড়া রোদটা দেখে রাহি বোঝে যে, সাতটা বেজে গেছে। গানদাদু চলে গেল আজ। মালিদার মাটি কোপানো, নিরানো আর জলসাজি হয়ে গেছে। বোঝে পালোয়ান এতক্ষণে লেজ নাড়তে নাড়তে বাবার পিছন পিছন খেতের আল ধরে হাঁটছে। মা পিছনের তরকারি বাগানে গিয়ে ক্ষুদেকে দিয়ে আনাজ তোলাচ্ছে। জীবনদার হয়তো মাছ ধরাও হয়ে গেছে অনেকটা। পুশিদির বিড়ালটা পাঁচিলের ওপর বসে থাবা চাটছে এখন। বোঝে একটু দূরের ওই বাড়ির মানুষটারও হয়তো বারান্দায় বসে মাউথঅর্গান বাজানো শেষ।

আসলে রোদটা রাহির অ্যালার্ম ক্লক। ওকে ঘুমের রাজ্য থেকে এই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার সিঁড়ি। আজও সেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রাহি। বিছানায় শুয়ে দেখল বড় উঠোনটায় শিউলি বোঁটার মতো রোদ পড়ে ভেসে যাচ্ছে। খুলে রাখা জানলা দিয়ে শরতের হাওয়া হইহই করে ঢুকে পড়ছে ঘরে। আর উনিশ-বিশ নামের কাঠবেড়ালি পাশের বড় কাঁঠালচাঁপার থেকে দৌড়ে নেমে আসছে জানলার গোড়ায়।

রাহির আজ মাথাটা একটু ধরে আছে। আসলে শুতে শুতে অনেক রাত হয়েছে গতকাল। প্রায় দুটো। সন্ধিপুজো দেখছিল যে। কিন্তু পুরোটা দেখতে পারেনি। সাধুদার কাঁধে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখন মা-ই জোর করে শুতে

পাঠিয়েছিল। তাই তো উঠতে দেরি হয়ে গেল। আর দিনটা ওকে ফাঁকি দিয়ে গড়িয়ে গেল খানিকটা।

আজ নবমী। ঠাকুরদালান থেকে মন্ত্রপাঠের স্বর হালকা প্রজাপতির মতো উড়তে উড়তে আসছে এদিকে। পুরুতমশাইয়ের সংস্কৃত উচ্চারণটা ভাল। বাবা সকাল দশটার আগে ঢাক বাজাতে দেয় না। বলে, সবার অসুবিধে হবে। আর যখন বাজায় তখনও একটুখানি সময়ের জন্য। কারণ বাবার কথায়, রাহি পছন্দ করে না। মা রাগ করে বলে, 'আদিখ্যেতা।' বলে, 'বাপসোহাগি।' বলে, 'তোমার মতো করে মেয়ের মাথা আর কাউকে খেতে দেখিনি আমি।'

বাবা হাসে। কিছু বলে না। আসলে বাবা যেন অন্ধ রাহির প্রতি। রাহির মাঝে মাঝে মনে হয় এত আদর কি ওর প্রাপ্য? বাবা কি একটু বেশিই ভালবাসে না ওকে? একটু বেশিই কি প্রশ্রয় দেয় না? দাদার বেলায় তো বাবা এমন নয়। কারও বেলাই নয়। শুধু রাহি কিছু বললে বাবা না করে না। বা বলা যায় রাহিকে নিজের থেকে একদম কিছু বলতেই হয় না। ওর কী চাই না চাই, সবটাই বাবা যেন কীভাবে বুঝে যায় আর এনে দেয়।

চাপাডাঙার মতো একটা গ্রামে থেকেও কি নেই রাহির? কম্পিউটার থেকে স্কুটি। বাড়িতে ছোট্ট একটা জিম থেকে পাথর বাঁধানো রাস্তা, সব, সব করে দিয়েছে বাবা। ওর বন্ধুরা এসে তো বলে ওদের বাড়িটা ফাইভ স্টার রিসর্ট একটা। বলে, ইস এমন বাবা যদি ওদের থাকত!

এমন বাবা আর কারও থাকতে পারে না। রাহি জানে। এমন ঝাল, টক, নোনতা, মিষ্টির সমান মিশ্রণ আর কারও ভেতর থাকতেই পারে না। না হলে কি আর সবাই এমনি এমনি রাঘব চক্কোত্তির নামে মাথা নোয়ায়? এমনকী অঞ্চলের এমএলএ, এমপি পর্যন্ত বাবাকে খাতির করে। পুলিশ খাতির করে। আবার সাধারণ গ্রামের মানুষ, হাটুরে ভ্যাবাচ্যাকা সব মানুষও ভালবাসে বাবাকে। সবার ভালবাসা পাওয়া অত সোজা নয়। আর সবাই তো ছাড়, একজনের ভালবাসা পাওয়াই কত কঠিন!

একজন! বুকের ভেতরটা চলকে উঠল একটু। একটা মাউথঅর্গান যেন দেখতে পেল ও। দেখতে পেল দুটো অদ্ভুত নীল চোখ।

একেতেই মাথা ধরে আছে, তার ওপর হঠাৎ 'একজন'-এর কথা মনে পড়াতে মনটা কেমন যেন টলোমলো হয়ে গেল প্রথমেই। বাইরের রোদের দিকে তাকিয়ে রাহির মনে হল, এবারের শরৎটা যেন কেমন। যেন কেমন একটা নিঃসঙ্গতার মতো। একলা মেঘের মতো। বেখেয়ালি ফিঙের মতো।

বিছানা থেকে উঠল রাহি। জানালা দিয়ে দেখল নন্দঢাকি আর তার দুই সাগরেদ পালক লাগানো দুটো ইয়াব্বড় ঢাক নিয়ে যাচ্ছে। না, এখন বাজাবে না। বরং পুজো করবে। ঠাকুরের সিঁদুর থেকে একটু নিয়ে ঢাকের গায়ে লাগিয়ে নন্দ হাঁটু গেড়ে নিজের মনে কীসব প্রার্থনা জানায়। দেখে হাসি পায় রাহির। পুজো-আচ্চার ভেতরের কাজকর্মগুলো ভাল লাগে রাহির। কিন্তু কোথায় জানি মনের ভেতরে ঈশ্বরবিশ্বাসে একটা ঘাটতি আছে ওর। এটা কাউকে ও বলে না। কিন্তু ও নিজে জানে ঠাকুর প্রণাম করা, বা সন্ধিপুজো দেখার উৎসাহটা আসলে বানানো। বাবাকে খুশি করা। বাবার তো দেবদ্বিজে অতিরিক্ত ভক্তি। আসলে বাবাকে খুশি করতে পারলে রাহির নিজের ভাল লাগে। মনে হয় কিছু তো করছে মানুষটার জন্য। দাদা তো আর মানুষ নেই। সবসময় বাবার থেকে দূরে থাকে। তাই রাহি দেখে ওর থেকে বাবা যেন কোনও দুঃখ না পায়।

দুঃখ ব্যাপারটা রাহি পছন্দ করে না একদম। মনে হয় এর মতো খারাপ জিনিস পৃথিবীতে আর নেই। কেন রে বাবা? মানুষ কতদিন বাঁচে যে, তার মধ্যে আবার দুঃখ-টুঃখ পেতে হবে? হাসি আর মজা দিয়ে নিজের জীবনটাকে বানানো কি এতই কঠিন? তাই তো রাহি কক্ষনও দুঃখের সাপোর্টার নয়। বরং শাহরুখ খানের সাপোর্টার। ওঃ, কী আনন্দই না করতে পারে লোকটা! সব ছবিতে হাসি আর মজা। না, ঠিক সব ছবিতে নয়। তবে বেশির ভাগ ছবিতে। সেই আনন্দ আর হাসির ছবিগুলোই বেশি করে দেখে রাহি। বারবার দেখে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে। দুঃখ কী ও জানতেই চায় না।

কিন্তু চাওয়ার ওপর যদি সব নির্ভর করত তাহলে পৃথিবীর এত সমস্যা থাকত কি? আর পৃথিবীর কথা বাদ দাও, রাহির নিজেরও কি এত সমস্যা থাকত?

এই চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত রাহি যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। পড়াশোনা মোটামুটি করেছে, ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পাশ করে বাবার প্রতিষ্ঠা করা স্কুলেই চাকরি করছে। তবে মাইনেপত্তর নেয় না। সারাদিন বাচ্চাদের সঙ্গে থাকাটাই ওর আনন্দ। ওর সুখ।

কিন্তু সুখ কি ওর সহ্য হয় না? কষ্ট কি সবার মতো ওকে পেতেই হবে? না হলে, প্রায় মাস দুয়েক হল, কেন ওর এমন মনখারাপ হয়ে থাকে? বুকটা কেন এমন টুপুটুপু গ্লাস ভর্তি জল হয়ে আছে? কেন আচমকাই বড্ড কাঁদতে ইচ্ছে করে? মনে হয় সব থেকেও কী যেন নেই? কেন ক্লাসের বাইরের পুকুরটায় পানকৌড়ির ডুব দেখলে মনখারাপ হয়ে যায়? কেন মনে হয় বাগানের এত ফুল অনর্থক ফুটে রয়েছে? মনে হয় কেউ রাহিকে ভালই বাসে না?

কে রাহিকে ভালবাসে না? বাবা, মা থেকে শুরু করে পাড়াপ্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব সব্বাই খুব ভালবাসে রাহিকে। এমনকী দাদা যে অমন মানুষ, সেও খুব ভালবাসে ছোট বোনটাকে। তবু কেন মনে হয় কেউ ভালবাসে না? কেন মনে হয় একদিন পুকুরে ডুবে মরবে? সাধুদাকে দিয়ে একশোটা ঘুমের বড়ি কিনে আনিয়ে খাবে? কেন মনে হয় পাগলির মতো কাটিয়ে দেবে জীবনটা?

পাগলি! পাগলিই তো। বাবা তো রাহিকে 'পাগলি মা' বলেই ডাকে। আসলে চব্বিশ বছর বয়সই হয়েছে রাহির, কিন্তু মনে মনে বড়টি হয়নি একদম। ও জানে বাবার স্কুল বলেই চাকরি করতে পারছে, না হলে কবে চাকরি চলে যেত ওর! কোনও টিচার যদি টিফিনে শাড়ির আঁচল গুঁজে ছাত্রীদের সঙ্গে এক্কাদোক্কা খেলে, তাকে কি কেউ মানবে? যদি ছুটির পর ঢিল মেরে আম পাড়ে, তার ক্লাসে কি কেউ পড়া করে আসবে?

আসলে চাপাডাঙার সবাই জানে যে, রাঘব চক্কোত্তির ছোটমেয়েটি ছেলেমানুষ। তাই কেউ কিছু ধরে না। বরং উলটে প্রশ্রয় দেয়।

শুধু একজন দেয় না। কারণ সে লক্ষই করে না যে, রাহি বলে একটা মেয়ে এই পৃথিবীতে আছে। সে সারাদিন ফ্যাক্টরিতে কাজ করে আর সন্ধেবেলা মাউথঅর্গান নিয়ে, গিটার নিয়ে বসে থাকে বারান্দায়। আর কখনও কখনও ক্যামেরা কাঁধে গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ে ছবি তুলতে। তলতাবনির জঙ্গলে সে ঘুরে বেড়ায় একা।

তলতাবনির জঙ্গল এই অঞ্চলে বিখ্যাত। বা বলা যায় কুখ্যাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই জঙ্গলের একটা অংশকে পরিষ্কার করে হ্যাঙার তৈরি করা হয়েছিল। যুদ্ধবিমান রাখা হত ওখানে। বিদেশি সৈন্যদের জন্য একটা চার্চও তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এখন সব কিছুর কঙ্কাল পড়ে আছে। এরোপ্লেনের ভাঙা পাখনা, মেশিনগানের প্রায় নেই হয়ে যাওয়া শরীর, হেলমেটের ক্ষয়াটে মাথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এখানে ওখানে। আর রয়েছে অন্ধ, ফোকলা দৈত্যের মতো হ্যাঙার, লতানো গুল্মে ঢেকে যাওয়া বৃদ্ধ চার্চ।

রাহিদের এই চাপাডাঙা অঞ্চলটা বর্ডারের কাছে। ফলে ছায়াছন্ন কাজকর্ম ভালই হয় এখানে। তাছাড়া রাজনৈতিক টেনশনও আছে। এই দুইয়ের যোগফলে দু'-চারটে লাশ এখানে ওখানে বাতিল প্লাস্টিকের মতো প্রায়ই পড়ে থাকে। বিশেষ করে এই হ্যাঙার অঞ্চলে। তাই এ অঞ্চলের সবাই তলতাবনির জঙ্গলটা এড়িয়ে চলে। শুধু ওই একজন এসব মানে না। প্রায় দু'মাস তো দেখছে মানুষটাকে। সে এসব কেয়ারই করে না। বরং ফাঁক পেলেই ক্যামেরা কাঁধে ঢুকে পড়ে জঙ্গলে। ভয় লাগে রাহির। বুক কাঁপে। সেই দুপুরগুলোয় ভাত-ই খেতে পারে না ঠিকমতো। ছাত্রছাত্রীদের খাতা দেখতে বসলে ভুল ঠিক সব গুলিয়ে যায় একদম। নিজেকে এসবের ভেতর জড়াতে চায় না ও। কিন্তু পারে না। কেবলই মনটা গড়িয়ে যায় ওদিকে।

আর সমস্যা হচ্ছে, এসব কাউকে বলতে পারে না ও। এমনকী বন্ধু যে বন্ধু হোমি, ওকেও বলতে পারে না। শুধু মনে হয় ও হাসবে। একদম গুরুত্ব দেবে না। আর হোমির যা পেটপাতলা, দু'দিনের ভেতর চাপাডাঙার লোকাল হেডলাইন হয়ে যাবে খবরটা। তার চেয়ে এই ভাল। বুকের ভেতর টুপুটুপু হয়ে ভরে থাকা জলের গেলাস আর পেটের ভেতর নুড়ি কুড়নো ডুবুরি নিয়ে এই ভাল বেঁচে থাকা রাহির।

তবে মাঝে মাঝে বাবার পরিচিত কিছু মানুষ ওকে রাজনীতির ময়দানে ডাকে। বলে, 'তুমি এসো আমাদের সঙ্গে।' কিন্তু পাত্তা দেয় না ও।

এসব পার্টি-পলিটিক্স বোঝে না রাহি। আর বুঝতেও চায় না। এই ক্ষমতা-টমতা দিয়ে কী হবে? যতসব ঝঞ্ঝাট! তবু কী অবাক! মানুষ এর পিছনেই অন্ধের মতো ছোটে। দাদাকেই দেখো না।

চাপাডাঙার সবাই দাদাকে ভয় পায় খুব। চমক একটা ত্রাস সৃষ্টিকারী নাম। স্থানীয় এমএলএ সুধাদির খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ করে চমক। সেই সুধাদি পর্যন্ত চমককে সমীহ করে।

চমক বেঁটে। পাঁচ দু'-আড়াই হবে। রোগা, দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। দেখলে মনে হয় ভাজা বা সেদ্ধ কোনও মাছ-ই উল্টে খেতে পারবে না। কিন্তু চমক খতরনাক ছেলে। রাহি নিজে চমকের কাছে পিস্তল দেখেছে।

চমক বি-কম পাশ করার পর বাবা ওকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিল। বাবার কথা হচ্ছে, মানুষকে নিজের উপার্জনে দাঁড়াতে হয়। অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে যে-মানুষ ওঠে সে প্রকৃত মানুষ নয়। বাবা নিজের যা-কিছু রোজগার তা নিজেই করেছে। কারও সাহায্য নেয়নি। কিন্তু সবাই তো আর বাবা নয়। আর রাহি জানে, বাবার মতো পরিশ্রমী বা অধ্যাবসায় ওর দাদার নেই। চমকের সব কিছুই খুব দ্রুত চাই। ছোট থেকেই। সাইকেল চাই মানে তক্ষুনি চাই। বাইক চাই মানে একদিন দেরি করা যাবে না। এমনকী এই যে দীপাঞ্জলিকে বিয়ে করেছে সেটাও তড়িঘড়ি।

কলেজ থেকেই রাজনীতি করত চমক। কলেজের জিএস পর্যন্ত হয়েছিল। আর তার জন্য যেখানে যেখানে যা যা করতে হয়েছে, করেছে। বোমাবাজি থেকে ক্ষুর, রড দিয়ে মেরে বিরোধীদের চোয়াল ভেঙে দেওয়া থেকে ভয় দেখাতে বিরোধী প্রার্থীর বাড়ির কুকুরের গায়ে অ্যাসিড মারা—সব করেছে। আসলে চমক সব করতে পারে। সেই জন্যই সবাই এত ভয় পায় ওকে।

রাহি তো শুনেছে যে, চমক নাকি মানুষও মেরেছে। কিন্তু রাঘব চক্কোত্তির ছেলে বলে পার পেয়ে গিয়েছে। চমক দুর্দান্ত, ডানপিটে আর রগচটা হতে পারে, কিন্তু মানুষ মারবে? এতটা বিশ্বাস করে না রাহি। চমক অমন মানুষ হলে দীপার মতো মেয়ে কি আর ভালবাসত ওকে?

দীপা যেন চমকের উলটো পিঠ। যেমন নম্র, তেমন শান্ত। এই মেয়ে যে কী করে চমকের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল কে জানে।

আজ থেকে পাঁচ বছর আগের কথা। তখন চমক সুধাদির সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেছে। একটা রক্তদান শিবির উপলক্ষে দীপাদের বাড়িতে গিয়েছিল চাঁদা তুলতে। এমনিতে চমক এসব ব্যাপারে থাকে না। কিন্তু দীপার বাবা উমেশ রায় দশ হাজার টাকা দিতে অস্বীকার করেছিল। তাই শুভ কাজে দীপার বাবার সম্মতি আনতে সুধাদি চমককে পাঠিয়েছিল।

সেই ছিল দীপা আর চমকের প্রথম দেখা। তারপর যত সময় গড়িয়েছে ওদের সম্পর্ক তত ঘন হয়েছে। দীপার বাবার দুটো পেট্রল পাম্প ছাড়াও চালের হোলসেল কারবার আছে। দুটো মাছের ভেড়িও আছে। ফলে পয়সাওয়ালা মানুষ হিসেবে রাঘব চক্কোত্তিকে সে খুব একটা সমীহ করে না। বরং কিছুটা অবজ্ঞাই করে। আর জোর করে দশ হাজার টাকা আদায়টাকে খুব ভালভাবে নেয়নি ভদ্রলোক। চমকের বিরুদ্ধে থানায় জুলুমবাজির অভিযোগে ডায়েরিও করেছিল। কিন্তু রাঘবের হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা এগোয়নি।

তারপর উমেশ যখন জানল যে, মেয়ের সঙ্গে এই চমকই প্রেম করছে, তখন তো পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। দীপাকে বর্ধমানে পাঠিয়ে দেয়। চমক এক রাতে গিয়ে উমেশের পেট্রল পাম্পে ভাঙচুর চালায়। তারপর সোজা বাড়িতে ঢুকে উমেশকে বন্দুক নাচিয়ে শাসিয়ে আসে। উমেশও বাইরের থেকে গুন্ডা আনিয়ে চমককে মার খাওয়ানোর প্ল্যান করে। কিন্তু পারেনি। সাধুদার জন্য পারেনি।

তারপর মাস তিন-চারেক আচমকাই সব চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। সবাই ভেবেছিল অশান্তি বোধহয় মিটল। কিন্তু তখনই এক সন্ধেবেলা সব ওলটপালট হয়ে যায়। দিনটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে রাহির। সেদিন বৃষ্টি হয়েছিল।

'রাহি,' মায়ের ডাকে জানলার দিক থেকে মুখ ফেরাল ও। মা পুজোর জোগানের তদারক করে আর ক্ষুদেকে দিয়ে আনাজ তুলিয়ে এরই ভেতর চা নিয়ে এসেছে। রাহি মাকে দেখে অবাক হয়ে যায়। কী করে একটা মানুষ এত কিছুর ভার একা সামলায়? মায়ের বিয়ে হয়েছিল আঠারো বছর বয়সে তারপর থেকে এই পঞ্চাশ বছর অবধি মা-ই আসল দশভুজা।

'হাই মা,' রাহি বিছানায় বসেই আড়মোড়া ভাঙল।

'এ কী, নাইটি পরে আছিস?' মায়ের গলায় বিরক্তি, 'এমন ছেঁড়াফাটা জিনিস পরিস কেন রে? তোর কিছু নেই নাকি? তাছাড়া এমন পুজোর বাড়ি কে কখন এসে পড়বে। এমন উদলা হয়ে বসে আছিস!'

'যা গরম!' রাহি হাসল।

'তা এসি চালাসনি কেন? আর শরৎকালে এমন গরম এখন নেই যে, এরকম জামাকাপড় পরতে হবে।'

'এসি ভাল লাগে না, তুমি তো জানো। কেমন বদ্ধ আর শুকনো মনে হয়। আর তাছাড়া, আমার ঘরে কেউ আসবে না।'

'তাহলেও,' মা চায়ের কাপটা বেড সাইড টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'এমন জামাকাপড় কেউ পুজোর দিনে পরে?'

'আচ্ছা বাবা আচ্ছা,' রাহি বিছানার থেকে উঠে গালটা টিপে দিল মায়ের, বলল, 'মা, দাদা কোথায় গো?'

'কেন? কোথায় বেরল যেন।'

'আমার স্কুটির হ্যান্ডেল অ্যালাইনমেন্টটা নষ্ট হয়ে গেছে। ওকে বলেছিলাম ঠিক করিয়ে আনতে। ভেবেছিলাম হোমিকে নিয়ে গোবরডাঙা আর মহলন্দপুরের ঠাকুরগুলো দেখে আসব।'

'অত দূরে?' মা আঁতকে উঠল, 'পাগলি নাকি তুই? তাছাড়া বাড়িতে পুজো, কত লোকজন এসেছে। কোথায় এখানে থেকে একটু দেখাশোনা করবি, না বাড়ির মেয়ে ধিঙ্গিপনা করতে বেরবে! যেমন দাদা, তেমন তার বোন। দীপার হয়েছে এক জ্বালা। ও একা কত দিক সামলাবে? এবার একটু সংসারটার টুকটাক কাজের দায়িত্ব নে।'

'মা,' রাহি চায়ের কাপটা নিয়ে বিরক্ত হয়ে তাকাল, 'আজকেও তুমি শুরু করলে?'

'শেষ হয়েছে নাকি যে শুরু করব? একটু বড় হ রাহি। এমন ছেলেমানুষ হয়ে থাকিস না।'

'মা, প্লিজ তুমি এবার যাও। আমি ফ্রেশ হয়ে নেব এবার।'

বাথরুমটা রাহির খুব প্রিয় জায়গা। এখানে যেটুকু সময় কাটায় মন ভাল হয়ে যায় ওর। বাথরুমের দেওয়াল সমুদ্রনীল রঙের। বাথরুমে গিজার থেকে বাথটব সব আছে। সময় থাকলে বাথটবে শুয়ে পড়ে রাহি। কিন্তু আজ আর সময় নেই। কারণ পুজোমণ্ডপে যেতে হবে। আর দেরি হলে বাবা রাগ করবে। বাবা ওর ওপর রাগ করলে সবচেয়ে কষ্ট হয় রাহির।

আজ ব্রাশ-ট্রাশ সেরে শাওয়ার খুলে দাঁড়িয়ে পড়ল রাহি। ঠান্ডা জল মাথা বেয়ে লক্ষ লক্ষ আঙুলে চেপে ধরল শরীরটাকে। চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল ও। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা ফুঁড়ে কোত্থেকে যেন উদয় হল এক জোড়া চোখ। অমন অদ্ভুত নীল রঙের চোখ কোনওদিন দেখেনি রাহি। নিমেষে শরীরে গোলাপকাঁটা জেগে উঠল ওর। বৃন্ত দৃঢ় হল। গরম রক্তের স্রোত চলকে উঠল শিরায়। শ্বাস গাঢ় হয়ে উঠল।

রাহি চোখ খুলল সঙ্গে সঙ্গে। পাগলি, ছেলেমানুষ, যে যাই বলুক, রাহি নিজে জানে ও কতটা বড় হয়েছে। এইসব নিস্তব্ধ আর একান্ত মুহূর্তগুলো ওকে বড় করে দেয় আরও। রাহি বোঝে শরীরের কষ্টের মতো কষ্ট খুব কম আছে পৃথিবীতে। নিজের পছন্দের মানুষের থেকে দূরে থাকার কষ্টও খুব কম আছে।

আজ একটু সময় নিয়ে শরীর মুছল রাহি। বাবার রাগ হতে পারে দেরি হলে, এই সম্ভাবনাটা মনের ভেতরের কোন পুকুরে যে, ডুব মারল কে জানে! বরং নিজের হাতের স্পর্শটা ক্ষণিকের জন্য অন্যের মনে হল। মনে হল একজন পরম যত্ন নিয়ে শরীর থেকে সরিয়ে দিচ্ছে অতিরিক্ত জলের দৃষ্টি।

স্নান সেরে শাড়ি পরে সামান্যই সাজল রাহি। ও কখনওই কসমেটিক্সের বিজ্ঞাপন হয় না।

শরতের আকাশ আজ দারুণ ফর্মে আছে। দিগন্তজোড়া অ্যাকোরিয়ামের ভিতর হাওয়া মিঠাইয়ের মতো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। গাছগুলোও যেন আজ বাড়াবাড়ি রকমের সবুজ। এবার পুজোয় টুকটাক বৃষ্টি হচ্ছে। যেমন গতকালও হয়েছিল। কিন্তু কী এক জাদুতে যে এক রাতের ভেতর পুরো দৃশ্যপটই পালটে গেল কে জানে।

রাহি ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে দাঁড়াল। মুগডালের মতো রোদ আকাশের বাটি উলটে গড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। সেলোফোনের মতো পাতলা হাওয়া বইছে একটা। একটু দূরে সাধুদা বসে নারকেল ছাড়াচ্ছে। কাল বিজয়াদশমী। বাড়িতে নাড়ু হবে। যদিও অন্য কাজের লোকজনের এসব করার কথা। তারা করেও। তবু এই বিশেষ দিনটায় সাধুদা নারকেলের দায়িত্ব নেয়। নিজে নারকেল ছাড়ায়। দাঁড়িয়ে থেকে কোরানো, পাক, ছাঁচ সব নিজে তদারক করে। সাধুদার রান্নার হাত খুব ভাল। দেশি-বিদেশি নানা রকম রান্নায় মানুষটা সিদ্ধহস্ত। আসলে সাধুদা অনেক কিছুতেই সিদ্ধহস্ত। এ অঞ্চলের সবাই জানে রাঘব চক্কোত্তির ডান হাত হল সাধু সেনাপতি।

রাহি জন্মের সময় থেকেই এই মানুষটাকে দেখছে। লম্বা, পাকানো চেহারা। কাঁধ অবধি চুল। দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। মেটে মেটে গায়ের রং মানুষটার। ভাল গান করে, তবলা আর বেহালা বাজায়। আর দুর্দান্ত সাহস।

সাধুদা বিয়ে-শাদি করেনি। ওদের এই বিশাল কম্পাউন্ডের একধারে দু'কামরার ঘরে থাকে। নিজেই দুটো ফুটিয়ে খায়। রাহি কতবার বলেছে, 'তুমি আমাদের সঙ্গে খাও না কেন সাধুদা? আমাদের রান্না খারাপ?'

সাধুদা উত্তর দিয়েছে, 'না গো দিদি, খারাপ কেন হবে? আমার পেটেই ভাল জিনিস সহ্য হয় না। কুকুরের পেটে কি আর ঘি সহ্য হয়?'

'বাজে কথা বোলো না তো।' রাহি রাগ করেছে। কিন্তু সাধুদা কিচ্ছু মনে করেনি। বাবার চেয়ে প্রায় বছর দশেকের ছোট সাধুদা। মায়ের সমবয়সি। তবু সাধুদা বলে রাহি। জন্মের পর কথা বলার সময় থেকেই ডেকে আসছে এমনভাবে। মা রাগ করত প্রথম প্রথম। কিন্তু সাধুদা হাসত। বলত, 'থাক না বউঠান। ডাকটাই কি আসল? আসল তো মনটা। কে কাকে কী বলে ডাকে তার চেয়ে জরুরি হল, কে কাকে কী মনে ডাকে।'

ভীষণ সত্যি কথাটা। রাহি ছোটবেলায় না বুঝলেও এখন বোঝে। আসলে যে যতই ওকে ছেলেমানুষ বা পাগলি বলুক, রাহি যে কত কিছু বোঝে তা তো আর অন্যরা জানে না।

সাধুদা হাতের দা-টা পাশে রেখে ফতুয়ার হাতায় মুখ মুছল। মেটে রঙের মুখটা গর্জন তেল লাগানো মূর্তির মতো চকচক করছে। লম্বা লম্বা চুলগুলোর গোড়ায় স্ফটিকের মতো ঝুলছে ঘামের দানা। দেখো তো, পুজোর দিনে কীভাবে খেটে মরছে লোকটা!

রাহি বলল, 'কী গো সাধুদা একদম তো স্নান করে গেছ। এসব নিজে করো কেন?'

সাধু হাসল, 'পুজোর শেষের কাজ। অন্যরা কি তেমনভাবে করতে পারবে?'

'না পারলে অত পিঠে, পায়েস, নাড়ু খেতে হবে না। বাড়ি ভর্তি লোকজন আর তুমি এই বয়সে...'

'বয়স?' সাধুদা হাসল, 'বয়স মানে কী? শরীর কতটা পুরনো হল, তাই তো?'

'আচ্ছা, বাবা আচ্ছা...' রাহি রাগ দেখাল, 'কেবল ফিলজফি আর ফিলজফি। পড়াশোনাটা করলে না কেন বলো তো?'

সাধুদা আবার দা-টা তুলে নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ফলার ধারটা পরীক্ষা করল। তারপর বলল, 'তুই অত বকিস না তো। যা, মণ্ডপে যা। সারা রাত জেগে সকাল দশটা অবধি ঘুমিয়ে এখন আমার ওপর দিদিমণিগিরি হচ্ছে। দেখ, এরপর থেকে এমন ঘুমলে নন্দঢাকিকে বলব তোর জানলার পাশে দাঁড়িয়ে অ্যায়সা ঢাক বাজাতে যে তোর যেন চার মাস ঘুম না হয়।'

'অ্যাঁঃ, সাহস আছে? নন্দদার মাথার পিছনের ওই চারানার চুল তাহলে তুলে নেব আমি।'

সাধুদা হাসল, 'বড্ড চোপা হয়েছে তোর। যা এখন, আমায় কাজ করতে দে।'

'ভারি তো মঙ্গলে যাওয়ার রকেট বানাচ্ছ!'

সাধুদা বাঁ হাত দিয়ে একটা নতুন নারকোলের মাথা ধরে দা তুলে কোপ বসাতে বসাতে বলল, 'যা, মণ্ডপে যা। তবে সাবধানে, আজ ত্রয়ণ এসেছে।'

ত্রয়ণ। নিমেষের জন্য হলেও ভুরুটা একটু কুঁচকে গেল রাহির। ছেলেটাকে দেখলেই নিজের বোকামো মনে পড়ে যায় ওর। আর মনে পড়ে যায় তারপরের ঝামেলাগুলো। এই ছেলেটা আবার আজ এসেছে!

সকালটা আর তেমন ভাল লাগছে না রাহির। রোদটাকে মনে হচ্ছে পুড়ে যাওয়া ডাল। কেন আজ ত্রয়ণ এল? চমক কি ডেকে পাঠিয়েছে? না দীপা? চোয়াল শক্ত করল রাহি। ওর কিচ্ছু করার নেই। ও জানে বাবা অপেক্ষা করছে মণ্ডপে। নবমীর অঞ্জলিটা মিস করা যাবে না। শাড়ির আঁচলটাকে জড়িয়ে নিয়ে মণ্ডপের দিকে হাঁটা দিল রাহি।

রাহির জন্ম এই চাপাডাঙাতেই। সাতচল্লিশে পার্টিশন হওয়ার অনেক আগেই ওর ঠাকুরদারা বাংলাদেশ ছেড়ে এখানে চলে আসে। টাকাপয়সা সঙ্গে আনতে পেরেছিল প্রচুর। আর তার একটা অংশ দিয়েই এই খামারবাড়ির মতো জায়গাটা কেনা হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে মদের ডিলারশিপ, ধান-গমের পাইকারি, কলকাতায় দুটো খুব বড় ওষুধের দোকান, ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি নানা ব্যবসার মাধ্যমে রাঘব চক্কোত্তি তার সম্পদ আর প্রতিপত্তিকে আরও বহু গুণ বাড়িয়ে নিয়েছে।

আগে এই বাড়ির ভেতর একটা নুইয়ে পড়া ঠাকুরদালান ছিল। কিন্তু বছর চারেক হল সেটার পাশে নতুন ঠাকুরদালান আর মণ্ডপ করা হয়েছে। তবে পাশের পুরনো মণ্ডপটা কিন্তু ভাঙা হয়নি। রাঘবের মতে, এর ঐতিহাসিক একটা গুরুত্ব আছে। আসলে পুরনো মণ্ডপটার বয়স প্রায় চারশো বছর। পাতলা লাল ইট আর চুন-সুরকির গাঁথনি দিয়ে তৈরি। তার ওপর টেরাকোটার কাজ করা। হেরিটেজ বলেই মণ্ডপটাকে ভাঙা হয়নি।

নতুন মণ্ডপটাও পুরনো ধাঁচেই তৈরি। বিশেষ অর্ডার দিয়ে পাতলা ইট আনিয়ে বানানো মণ্ডপের গায়ে পোড়ামাটির মূর্তি বসানো হয়েছে টেরাকোটার শিল্প আনিয়ে। তারপর আলোও লাগানো হয়েছে সুন্দরভাবে। রাতেরবেলা আলো জ্বালাবার পর গোটা মণ্ডপটাকে অদ্ভুত সুন্দর দেখতে লাগে।

মণ্ডপের একটু দূরেই ত্রিপল টাঙিয়ে রান্নার বন্দোবস্ত হয়েছে। এমনিতে সবার জন্য খিচুড়ি, লাবড়া, চাটনি আর মিষ্টির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আর বিশেষ অতিথিদের জন্য পোলাও, দু'-তিন রকমের ভাজা, নিরামিষ তরকারির চারটে পদ, চাটনি, মিষ্টি ও পায়েস হয়েছে।

এই পুজোতে অঞ্চলের সমস্ত মান্যগণ্যদের নেমন্তন্ন করা হয়। আর রান্নার গুণে, ঠাকুরের গুণে বা হয়তো রাঘব চক্কোত্তির গুণেই মান্যগণ্যেরা আসেন পুজোতে। ওদের গেটের বাইরে এই পুজো উপলক্ষে বড় মেলাও বসে। সেখানে যাত্রাও হয়। চক্রবর্তী বাড়ির পুজোর কথা এখানে সবাই জানে।

মণ্ডপের সামনে শামিয়ানা টাঙানো। তার তলায় সার দিয়ে মানুষজন দাঁড়িয়ে। অঞ্জলির প্রস্তুতি চলছে। মণ্ডপের ওপর পুরুতমশাই মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে। আর তার পাশে রাঘব। মানুষটা ভীষণ শান্ত। চোখমুখ দেখলে মনে হয়, কাউকে জোরে কথা বলতে পারে না। এমন দিনেও খুব সাধারণ একটা ধুতি আর খদ্দরের চাদর গায়ে জড়িয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষটা।

রাহি জানে ওকে এই ভিড়ে যেতে হবে না। মণ্ডপের পাশের সিঁড়ি বেয়ে ও গিয়ে দাঁড়াবে বাবার পাশে। এখানে চমকেরও থাকার কথা। কিন্তু দাদাকে চট করে দেখতে পেল না রাহি। মা তো বলল বেরিয়েছে। কিন্তু কোথায় গেছে কে জানে! বাবা যে ভেতরে ভেতরে রেগে আছে তা খুব জানে ও। কিন্তু রেগে থাকলে কী হবে? চমককে বাবা সরাসরি কিছু বলে না। কেন, তা রাহি জানে না।

'তোর দেরি হল এত?' দীপার গলার স্বরে পাশে তাকাল রাহি। স্নানটান সেরে দীপা পুরো তৈরি।

রাহি বলল, 'তুই তো দেখছি অঞ্জলির ইউনিফর্ম পরে ফেলেছিস একদম।'

'ধ্যাৎ, তাড়াতাড়ি ওপরে চল।'

'কেন?' রাহি দীপার তাড়া দেখে অবাক হল।

'আরে, পনেরো মিনিট ধরে এই অঞ্জলিটা থামিয়ে রাখা হয়েছে

তোর জন্য।'

'সে কী? আমায় তো কেউ কিছু বলেনি।' রাহির খারাপ লাগল।

'বাপের আদুরে মেয়েকে কেউ কিছু বলে!' দীপা হাসল। ভারী সুন্দর হাসি। অন্য কেউ এমন বললে রাহির খারাপ লাগত। কিন্তু এখন লাগল না। কারণ, দীপার কথায় কোনও হুলই ছিল না। দীপা কখনও কাউকে কষ্ট দিয়ে কথা বলে না।

রাহি জিজ্ঞেস করল, 'দাদা ফেরেনি এখনও? দেখছি না তো!'

দীপার মুখটায় হঠাৎ মেঘ করল যেন। চারদিক একবার চট করে দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'গতকাল রাত তিনটে অবধি ওসব খেয়েছে। তারপর একটু আগে বেরিয়ে আবার ফিরে এসে খেতে বসেছে। মা জিজ্ঞেস করছিল। আমার এত লজ্জা লাগছিল বলতে। তাই বলেছি, বেরিয়েছে।'

রাহি দীপার হাত ধরে সিঁড়ির দিকে টানতে টানতে বলল, 'চল, এখানে দাঁড়িয়ে আর সময় নষ্ট করব না। আর শোন, দাদার এসব করতে লজ্জা লাগে না। তোর কেন লাগছে? তুই তো আর মদ খেয়ে কিছু করিসনি।'

দীপা মাথা নিচু করে নিল।

রাহি গিয়ে দাঁড়াতেই রাঘব হাসল। শান্ত প্রশ্রয়ের হাসি।

রাহি সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'বাবা সরি, এত দেরি হয়ে গেল। আসলে, কাল রাতে...'

রাঘব হাত তুলল, 'বাদ দে, কিচ্ছু দেরি হয়নি।' তারপর একটু সময় নিয়ে দীপাকে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে, চমক কই?'

দীপার মুখটা আবার কালো হয়ে গেল। মাথা নিচু করে নিল ও।

রাহি অবস্থা সামলাতে বলল, 'ও জানবে কী করে? দাদা তো সকালবেলা বেরিয়েছে শুনলাম। কেন? মা তোমায় কিছু বলেনি?'

রাঘব অবাক হয়ে গেল। কিন্তু কিছু বলল না। শুধু পুরোহিত মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল অঞ্জলি শুরু করার জন্য।

অঞ্জলির মন্ত্র রাহির কানে অর্ধেক গেল, অর্ধেক গেল না। আসলে কোনওদিনই যায় না। আর আজ যেন আরওই গেল না। কেন গেল না ঠিক বুঝতে পারল না ও। আসলে মানুষ নিজেই বোঝে না তার মন তার কাছে

নেই। বা হয়তো বোঝে কিন্তু সেটা নিজের কাছে স্বীকার করতে চায় না।

অঞ্জলি শেষ করে নামতেই হোমি এসে ধরল ওকে, 'এই তুই চা খাস তো সকালে। সেই নিয়েই অঞ্জলি দিলি!'

'তো?' অবাক হল রাহি।

'তো কী রে?' হোমি চোখ পাকাল, 'জানিস না এমন করতে নেই।'

হাসল রাহি। হোমিকে হাড়ে হাড়ে চেনে ও। খালি ভড়কি দেওয়ার চেষ্টা। নিজে কিন্তু অঞ্জলি দেয়নি। ঠাকুর-টাকুর বিশ্বাস করে না। বলে, 'আমার সঙ্গে ঠাকুর-দেবতাদের হেভি ফার।'

হোমি মেয়েটা খুব ভাল। এখন এমএ করছে। আর পাশাপাশি 'হেল্প আর্থ' নামে একটা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। ওরা গাছ সংরক্ষণ নিয়ে কাজকর্ম করে। হোমির কাছে নেচারই হল আসল ভগবান। ও বলে, 'পুরনো দিনের মানুষ প্রকৃতির পূজা করত। কারণ, তারা সকলে বিজ্ঞানটা বুঝত। আর এখনকার মানুষ বিজ্ঞানে বেশি পণ্ডিত হয়ে গেছে তো তাই বেসিকটা ভুলে গেছে।'

হোমি মাঝে মাঝেই রাহিকে বলে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে। বলে, 'দেখ, তুই রাঘব চক্রবর্তীর মেয়ে। এই অঞ্চলে তোর একটা আলাদা ওজন আছে। তুই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলে কত সুবিধে হবে বল তো? তাছাড়া জীবনটা শুধু ছেলেমানুষি করে কাটিয়ে দিবি? সাবস্ট্যানশিয়াল কিছু করবি না? তোরা যদি না আসিস তাহলে পৃথিবীতে কাজ হবে কী করে? বোঝ, রাহি বোঝ। পৃথিবীর খুব দুর্দিন। আমাদের কাছাকাছি, পাশাপাশি দাঁড়াতে হবে। বুঝলি?'

'পৃথিবী?' হোমির কথায় অবাক হয়ে তাকিয়েছিল রাহি। কী, বলে কী মেয়েটা? কোথায় পৃথিবী আর কোথায় রাহি? পৃথিবীর দুর্দিনে ও কী করবে? এই বিশাল পৃথিবীর তুলনায় ও কে? ওর কী এমন গুরুত্ব?

রাহি আলতো কিল মারল হোমির পিঠে। তারপর বলল, 'বিকেলে বেরোবি? স্কুটিটা দাদাকে বলেছি ঠিক করে এনে দিতে।'

'বিকেলে?' হোমি একটু ভাবল, 'মা বলেছিল, বাড়িতে থাকতে। মাসি, গুন্ডা সব আসবে কিন্তু...বাই দ্য ওয়ে, কীভাবে বেরোবি? এই পুজোর দিনে কোনও গ্যারাজ তোর গাড়ি ঠিক করে দেবে?'

রাহি কিছু বলার আগেই পিছন থেকে একটা গলা বলে উঠল, 'কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে, রাঘব চক্কোত্তির মেয়ের স্কুটি ঠিক করবে না? পুজো হোক বা কারফিউ, গাড়ি ঠিক হবেই।'

রাহি চোয়াল শক্ত করল। ত্রয়ণের গলায় সবসময় কেমন যেন কাঁটা থাকে। সামান্য কথাও কেমন বিষ হয়ে আসে যেন। রাহির বিরক্ত লাগে। আর ওই সিড়িঙ্গে চাপ দাড়িওয়ালা ছেলেটার চেহারাটাও বদখত লাগে। টিপিক্যাল আঁতেল। সব বোঝে আর সব বিষয় নিয়ে শেষকথা বলার জন্য যেন মুখিয়ে থাকে। সবাই ভাবে খুব ভাল ছেলে। কিন্তু রাহি তো জানে ত্রয়ণ কী জিনিস।

'কেমন আছ হোমি?' ত্রয়ণ সামনে এসে দাঁড়াল।

'চলছে।' হোমি কাঁধ ঝাঁকাল। যেন কাঁধে আরশোলা বসেছে।

ত্রয়ণ এবার তাকাল রাহির দিকে। মুখে চটচটে একটা হাসি। রাহির মনে হল থাপ্পড় মেরে চোয়াল ভেঙে দেয়।

ত্রয়ণ জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ রাহি? সব ভাল তো?'

রাহি বলল, 'চলছে একরকম। তুমি হঠাৎ এলে?'

ত্রয়ণ বলল, 'তোমায় দেখতে ইচ্ছে করল তো। তাই...'

'মানে?' রাহি ছিটকে উঠল। হোমির চোখে-মুখেও আশ্চর্য ভাব।

ত্রয়ণ হাসল, 'জাস্ট জোকিং। সেন্স অব হিউমার তো পুরো নষ্ট হয়ে গেছে দেখছি। জেঠু নেমন্তন্ন করল, আর দিদিও বলল, তাই...'

বাবা তো নেমন্তন্ন প্রতি বছরই করে। আর দিদি মানে দীপা? ও তো ত্রয়ণকে পছন্দ করে না খুব একটা। বলে এই মামাতো ভাইটা নাকি চিরকালের সৃষ্টিছাড়া। বলে, ও একটা কলঙ্ক। সারাদিন মাঠেঘাটে ঘুরে নাকি পার্টি করে বেড়ায়। উমেশ রায়দের বাড়িতে অবশ্য টাকা ছাড়া অন্য কিছুতেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। দীপা হয়তো সেই শুনেই বলে।

কিন্তু আসলে তা নয়। পার্টির হয়ে কাজ করা তো খারাপ কিছু নয়। সেই জন্য যে, ত্রয়ণকে খারাপ বলতে হবে তা মানে না রাহি। ত্রয়ণ খারাপ অন্য কারণে। সেটা একমাত্র ও জানে।

হোমি বলল, 'রাহি, আমি আসি রে। দুপুরে মায়ের সঙ্গে কথা বলে তোকে ফোনে জানিয়ে দেব যে, আদৌ আমার যাওয়া হবে কিনা।'

'প্লিজ, চেষ্টা করিস। মহলন্দপুরে নাকি জ্যান্ত দুর্গা এসেছে। লক্ষ্মী-সরস্বতী-গণেশ সব নাকি জ্যান্ত। শুধু পেঁচা-ইঁদুর-সিংহ-হাঁসগুলো মাটির। চল না খুব মজা হবে। ক্যামেরা নিয়ে যাব।'

ত্রয়ণ বলল, 'ফালতু কনসেপ্ট। এসব মানুষজন করে কী করে? পুজোতেও সিরিয়াসনেস নেই। আমি গতকাল দেখেছি। ছাইমাখা মাগুর মাছের মতো লাগছে সবক'টাকে।'

'হোক, তবু দেখব।' রাহি বলল।

হোমি আর কিছু না বলে হাত নেড়ে চলে গেল।

ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। দ্বিতীয় দফায় অঞ্জলি শুরু হবে। এবার ভিড় যেন আরও বেশি। রাহি জানে ত্রয়ণের সামনে দাঁড়ালে ও আরও মাথা খাবে। ও আলতো পায়ে সরে এল ত্রয়ণের সামনে থেকে। ত্রয়ণও আসত, কিন্তু মোক্ষম সময়ে মা আর দীপা এসে আটকে দিল ত্রয়ণকে।

রাহি কী করবে বুঝতে না পেরে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। আর ঠিক তখনই সাধুদা এসে দাঁড়াল ওর সামনে।

'তুমি? নারকোল দিয়ে রকেট বানানো শেষ?' রাহি সিরিয়াস মুখে বলল।

'খালি ইয়ার্কি, না?' সাধু হাসল। তারপর বলল, 'চল, চমক ডাকছে তোকে।'

'দাদা!' রাহি অবাক হল একটু।

'হ্যাঁ রে, চমক বারান্দায় এসেছিল। মাইকে মন্ত্র শুনে আবার ঘরে ঢুকে গেছে। পরে বেরিয়ে আমায় বলল তোকে ডেকে দিতে।'

'ওফ্! তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করলে নাড়ি-নক্ষত্র সব বলে দাও।'

'ঠিক আছে, চল।' সাধুদা হাত ধরে টানল রাহিকে।

বারান্দা দিয়ে উঠে বাড়ির একদম অন্য দিকে দোতলায় চমকের ঘর। বাড়ির অন্য কেউ বিশেষ আসে না এখানে। এমনকী মা-ও নয়। যা আসার রাহিই আসে।

এই ঘরের দরজাটা মোটা ঘষা কাচের। স্লাইডিং। সাধুদা গিয়ে টোকা দিল দরজায়। রাহি চাপা গলায় বলল, 'তুমিও যাবে?'

সাধু নিরুপায় মুখে বলল, 'কী করব? আমাকেও যে ডেকেছে।'

দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে মিঠে-কড়া একটা হাওয়া এসে ঝাপটা মারল রাহির মুখে। এখনও বোতল খুলে বসে আছে? রাহির মাথা গরম হয়ে গেল।

'আয়,' চমক সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'ডেকেছিস?' রাহি ভুরু কুঁচকে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল। তার মধ্যেও দেখল সাধুদা দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার বাইরে।

'গন্ধ পাচ্ছিস?' চমক হাসল।

'কেন ডেকেছিস বল।' রাহি বিরক্তি লুকনোর চেষ্টাই করল না।

'আরে বলিস না,' চমক না কামানো গালে হাত ঘষে বলল, 'বর্ডার থেকে বাইশ পেটি মাল ঢুকেছে। দেখ না জোর করে এক পেটি আমায় গছিয়ে দিল। বললাম নেব না। শোনে কথা? খাঁটি স্কটল্যান্ডের জিনিস। ঝরনার জলে তৈরি। ওক কাস্কে জমানো ছিল বহু দিন। গন্ধে গোলাপ ফেল। তাই আমি এই পুণ্য প্রভাতে চেখে দেখছিলাম।'

'বাজে কথা বলিস না। বাবাকে সবার সামনে অমন করে হেনস্তা করলি কেন? তোর জন্য সবার সামনে অপমান হতে হল। প্রতিবার আমি আর তুই অঞ্জলিতে থাকি। এবার গেলি না কেন?'

'এবার?' চমক একটু অন্যমনস্ক হল যেন। বলল, 'জীবন কি আর এক থাকে রে রাহি? পাল্টায়। সব পাল্টায়। গতবারের আমিটার সঙ্গে এবারে আমিটাও তো এক নই। আমার যে, তৃতীয় চক্ষু খুলে গেছে। তাই ভগবানের দরকার আর আমার নেই।'

'মানে!' রাহি অবাক হল। সাতসকালে বড্ড বেশি খেয়েছে কি? অবশ্য, আশ্চর্য কিছু নয়। চমক যখন খায় তখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না ওর।

'বাদ দে,' রাহির রাগ হচ্ছে খুব। ও বলল, 'ডেকেছিস কেন? আর সাধুদাকেও বা দাঁড় করিয়ে রেখেছিস কেন?'

'সাধুদা?' চমক দরজার দিকে তাকিয়ে হাসল আপন মনে। তারপর বলল, 'লোকটা খুব লয়াল না? কুকুরের মতো।'

'কী যা তা বকছিস?' রাহির মাথা ঠিক থাকছে না আর, 'কেন ডেকেছিস?'

'গিফ্ট।' চমক টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা প্যাকেট তুলল টেবিল থেকে। ক্যালকুলেটারের মতো মাপের প্যাক করা একটা জিনিস।

'কী এটা?'

'পাম-টপ কম্পিউটার। তোর পুজোর গিফ্ট। মালয়েশিয়ার জিনিস। সরি, দিতে লেট হয়ে গেল।'

'পাম-টপ!' রাহি অবাক হল। চমক এমন একটা জিনিস দিল!

'হ্যাঁ, আর এটা সাধুদার,' চমক ঘরের কোণে বড় একটা প্যাকেট দেখিয়ে বলল।

'সাধুদার গিফ্ট?' রাহি অবাক হল খুব। চমকের কী হয়েছে? কোনওদিন তো সাধুদার জন্য কিছু আনে না! তাহলে?

'অবাক হচ্ছিস কেন?' চমক হাসল। তারপর এগিয়ে বিছানার মাথার কাছের থেকে হলুদ তরল পূর্ণ গ্লাসটা তুলে বলল, 'সাধুদা আমাদের ফ্যামেলির জন্য যা করেছে, তাতে কি এটা ডিসার্ভ করে না?' তারপর সাধুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটাতে মাইক্রোওয়েভ আছে। তোমার রান্নার সুবিধে হবে।'

সাধু দরজায় বাইরে থেকে ইতস্তত করল।

চমক আবার বলল, 'কেন এমন করছ? নাও এটা।'

রাহি অবাক হয়ে চমকের দিকে তাকাল। একটু কি বেশি বিষণ্ণ লাগছে দাদাকে? মনটা কি একটু বেশি খারাপ ওর?

'তোরা আয়।' চমক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অন্যমনস্কভাবে গ্লাসটা দেখল। রাহি কী বলবে বুঝতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সাধুদাও রাহির পিছন পিছন চলে এল। ঘর থেকে বেরিয়েই রাহির মনে পড়ল, যাঃ স্কুটির

ব্যাপারটা যে, জিজ্ঞেসই করা হল না।

আসলে চমককে দেখে কেমন যেন লাগল রাহির। এমন কোনওদিন লাগে না। কেন মনখারাপ চমকের? দীপা জানে কি?

কিন্তু এই নিয়ে বেশি চিন্তা করতে পারল না রাহি তার আগেই হইচই করে খুদে এসে হাজির হল।

সাধু হাতের প্যাকেটটা বেলগাছের গোড়ায় রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী রে খুদে এমন লাফাচ্ছিস কেন?'

খুদে হাউমাউ করে বলল, 'পেছনের কাচের ঘরে গোরু ঢুকে গেছে। আর ক্যামেরাদা ওকে বের করতে গেলে...'

পুরো কথা শোনা হল না। ক্যামেরাদা? তবে ও এসেছে? ছমছমে বুক নিয়ে দূরে কাচের ঘরের দিকে তাকাল রাহি। দেখল, সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ওদের দিকে আসছে সে। বুকের ভেতরের টুপুটুপু ভর্তি জলের গ্লাসটা এবার চলকাল একটু। শয়ে শয়ে ডুবুরি নেমে পড়ল পেটের ভেতর। ওর মনে হল চাপাডাঙার হাওয়ায় কি অক্সিজেন কমে এল হঠাৎ?

৬

নীল দুটো চোখ তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে আকাশে এখন আলো। আর তাতে ডুবে এই জঙ্গলের লতাপাতা, গাছপালা ও পুরনো চার্চের গন্ধের মধ্যে নীল দুটো চোখ তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

জলটা একদম স্থির। কাচের মতো। তলতাবনির এত ভেতরে চট করে কেউ আসে না। ফলে এই ছোট্ট জলাশয়টা প্রায় ব্যবহারই হয় না। কাচের মতো জল বুকে নিয়ে সে শুধু অপেক্ষা করে। কার অপেক্ষা করে?

সেই জলের ধারে ঝুঁকে রয়েছে ও। আর ওর নীল দুটো চোখ তাকিয়ে দেখছে ওকেই। অক্টোবরের প্রায় শেষ এখন। ঠান্ডা গুটিসুটি মেরে ঢুকে পড়তে চাইছে জীবনে, জঙ্গলে। জলের ওপার থেকে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। ভাঙা হ্যাঙার আর আগাছায় ঢেকে যাওয়া চার্চের ফাঁকফোকর দিয়ে টুকরো টুকরো হাওয়ার ভেতর ঢুকে আসছে শীত।

জলাশয় থেকে এক আঁজলা জল তুলে ঘাড়ে, মুখে দিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ভেজা আঙুলগুলো চুলের মধ্যে চালিয়ে দিল কিগান। প্রেশারটা বেড়েছে বোধহয়। ডাক্তারকাকা বলত, 'ঠাকুরমার ধাঁচ। অল্প বয়স থেকেই হাই প্রেশার।'

হৈমবতী হাসতেন, বলতেন, 'হবেই তো। আমার নাতি কি অন্যের মতো হবে নাকি?' অন্যের মতো কী করে হবে কিগান? ঠিকমতো জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তো শুধু ঠাকুরমাকেই দেখে এসেছে ও।

পাশের পেয়ারা গাছের ডালে ঝোলানো ক্যামেরাটা খুলে গলায় ঝুলিয়ে নিল কিগান। ক্যামেরাটা দামি। ডিএসএলআর। সিক্সটিন পয়েন্ট ওয়ান মেগা পিক্সেল। কিগানের খুব শখের জিনিস।

গিটার, মাউথঅর্গান আর ক্যামেরা। শখ বলতে এই। এ ছাড়া তো একাই থাকে ও। সেই ছোট্ট থেকে প্রায় একাই থাকে। হ্যাঁ, চেনা-পরিচিতি অনেক হয়েছে জীবনে। কিন্তু বন্ধু? মনে করতে পারে না কিগান।

আসলে যেন কিছুই মনে করতে পারে না ও। সবই যেন কেমন ধোঁয়াশা। যেন সব কিছুর ওপর কয়েক হাজার বছরের ধুলো জমে আছে। আর তার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে আসে এক একটা মুখ। এক একটা মুহূর্ত। কিগান বোঝে, ও নিজেই ধুলোয় ঢেকেছে সব। বোঝে, এ ধোঁয়াশাও ওরই তৈরি। আসলে সব কিছু ভুলতে চায় ও। ওর কষ্ট, যন্ত্রণা আর অপমান। সব ভুলে যেতে চায়।

আর-একটা হাওয়ার ওড়না ভেসে এল বিকেলের ওপর দিয়ে। আর সঙ্গে করে নিয়ে এল জল, জঙ্গল আর আলোর গন্ধ।

আলোর গন্ধ থাকে? থাকে। কিগান জানে, প্রতিটা আলোর একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। ছোট থেকেই সকালের প্রথম আলোটা ঘরে ঢোকামাত্র তার গন্ধ পেত ও। উত্তর কলকাতার গলি, ঠাকুরমার চন্দন, ধূপ আর কর্পূর ছুঁয়ে ভেসে আসা অদ্ভুত এক আলোর গন্ধ পেত কিগান। সেই ছোট থেকেই কিগান বুঝেছিল প্রতিটা মানুষের মতো প্রতিটা সময়ের আলোরও আলাদা আলাদা গন্ধ থাকে।

এখন এই জঙ্গলে দাঁড়িয়ে শেষ বিকেলের আলোর অন্য এক গন্ধ পেল কিগান। ক্যামেরাটা হাতে তুলে ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে দূরে ভাঙা হ্যাঙারের ফাঁক দিয়ে ডুবন্ত সূর্যের দিকে ফোকাস করল ও।

বাবার সবসময়ের সঙ্গী ছিল ক্যামেরা। ছোট থেকেই নাকি ক্যামেরার প্রতি, ছবির প্রতি, বাবার একটা অদ্ভুত আগ্রহ ছিল। ঠাকুরমা বাবাকে প্রথম ক্যামেরা কিনে দিয়েছিল চোদ্দো বছর বয়সে। তারপর থেকে বত্রিশ বছর বয়স অবধি আর কোনওদিনই ক্যামেরা ছাড়া থাকেনি বাবা।

হ্যাঁ, বত্রিশ বছর। বত্রিশ বছর বয়সেই তো মারা যায় বাবা আর মা। তখন চার বছর বয়স কিগানের।

তাই ওর কাছে বাবা আর মায়ের প্রায় পুরোটাই গল্পের মতো করে শোনা, আর প্রচুর ছবির মধ্যে দেখা। তবে মাঝে মাঝে হঠাৎ একটা বিশাল বড় লেক দেখতে পায় ও। তার পাশের প্লাস্টিকের ওপর পড়ে থাকা একটা অদ্ভুত মাছ দেখতে পায়। দেখতে পায় কোথায় যেন বরফ পড়ছে। আর টেপরেকর্ডারে নিচু স্বরে বাজছে ক্রিসমাসের গান। দেখতে পায় পাথরের বাড়ির মাথায় বসানো চৌকো পাথরের চিমনি দিয়ে গোল্লা-গোল্লা ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আর অদ্ভুত আলোর ভেতর ঝাঁকড়া লাল মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চেরি ট্রি।

বাবা-মায়ের স্মৃতি বলতে মুলত এই। কিন্তু এর ভেতর বাবা-মা কোথায়? কিগান জানে, যখন-যখন ও এইসব জিনিস দেখেছে ওর দু'পাশে মা আর বাবা থাকত। তাই স্পষ্ট না হলেও মনের মধ্যে, স্পর্শের মধ্যে আর এইসব টুকরো-টাকরা ছবির মধ্যে বাবা-মাকে অনুভব করতে পারে কিগান অর্ক ব্যানার্জি।

বাইশ বছর বয়সে ঘর ছেড়েছিল কিগানের বাবা অর্কপ্রভ। প্রথমে দিল্লি, তারপর চেন্নাই। আর সব শেষে মুম্বই। আর তারপর পঁচিশ বছর বয়সে বিদেশি কাগজে চাকরি নিয়ে সোজা ইংল্যান্ডে।

কিয়েরা ফেরেল ছিল অর্কপ্রভর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। ওই কাগজেরই স্পেশ্যাল করেসপন্ডেন্ট। নানা জায়গায় কিয়েরার সঙ্গে ঘুরতে হত অর্কপ্রভকে। আর সব জায়গার থেকেই নানা পিকচার পোস্টকার্ড সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে মায়ের কাছে পাঠাত অর্কপ্রভ। তাতে নানা ঘটনার কথা সঙ্গে দু'-এক লাইন কিয়েরার কথাও থাকত।

কিন্তু ক্রমশ সেইসব পোস্টকার্ডে ঘটনার কথা কমতে থাকে আর কিয়েরার প্রসঙ্গ বাড়তে থাকে. হৈমবতী বুঝতে পারছিলেন যে, ব্যাপারটা খুব একটা ভাল দিকে গড়াচ্ছে না। ছেলের কথার ভাঁজ কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু আগ বাড়িয়ে কিছু বলতেও পারেননি স্পষ্ট করে। শুধু লিখেছিলেন, ভবিষ্যতে যা পদক্ষেপ নেবে অর্কপ্রভ তা যেন বুঝেশুনে নেয়।

তবে সে চিঠি অর্কপ্রভর কাছে পৌঁছনোর আগেই সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে আর-একটা খাম এসে পৌঁছয়। চিঠিতে অর্কপ্রভ লেখে যে, সে কিয়েরাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে আর কিয়েরা তাতে রাজি হয়েছে। সেই চিঠির সঙ্গে বারোটা ছবিও অর্কপ্রভ পাঠিয়েছিল। কিয়েরার ছবি। অর্কপ্রভর তোলা।

সেসময় গোটা পরিবারেই এই নিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছিল। বাড়ির লোকজন আর আত্মীয়স্বজন সবাই একজোট হয়ে বলেছিল, অর্কপ্রভকে ত্যাগ করা হোক। বলা হয়েছিল যে, অর্কপ্রভকে সমস্ত অংশীদারী থেকে বরখাস্ত করা হোক ও তাকে যে ত্যাজ্য ঘোষণা করা হল সেই কথাটাও জানিয়ে দেওয়া হোক।

সেই মর্মে হৈমবতীর আর-এক ছেলে সূর্যশেখর চিঠি লিখে জানিয়েও দেয় অর্কপ্রভকে। উত্তরে অর্কপ্রভ নিজেদের বিয়ের ছবি পাঠিয়েছিল। আর লিখেছিল যে, কারও কোনও ভয় নেই। সম্পত্তির এক কানাকড়িও সে দাবি করবে না।

এই সব কিছুর ভেতরই হৈমবতী ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই সরাসরি যোগ দেননি। বরং কিয়েরার ছবি দেখে মেয়েটাকে ভালই লেগেছিল ওঁর। যত্ন করে রেখেও দিয়েছিলেন সমস্ত ছবি। সেসব একটু বড় হওয়ার পর হৈমবতীর কাছে কিগান দেখেওছে।

হৈমবতী কিগানকে বলেওছিলেন যে, 'জানিস তোর মাকে আমার বেশ

পছন্দও হয়েছিল। অমন রং, চোখ, নাক। অমন ঘন কালো চুল আর নীল চোখ। ক'জনের হয় রে। শুধু অন্য জাত বলে একটু খটকা লাগছিল। তবে অর্ক যা করেছে ভালই করেছে। কলের পুতুলের মতো অন্যের বেছে দেওয়া মেয়ের সঙ্গে জীবন না কাটিয়ে নিজের পছন্দের মানুষকে বিয়ে করেছে। সারাজীবন তো এই আফসোস থাকবে না যে, যাকে চাইলাম তাকে পেলাম না!'

মায়ের ছবিগুলো দেখেছে কিগান। এখনও দেখে। নানা জায়গায় নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বসে রয়েছে মা। কোনও সময় হাসছে, কোনও ছবিতে সামান্য গম্ভীর। আবার কোনও ছবিতে কেমন যেন আনমনা। বাবা যত পেরেছে, মায়ের ছবি তুলে গেছে। যেন সমস্ত রকমভাবে মাকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল বাবা।

কিগান মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে যেন নিজেকেই দেখতে পায়। যেন মায়ের মুখ-চোখ কেউ যত্ন করে কেটে বসিয়ে দিয়েছে কিগানের মুখে। অমন নীল চোখ আর কারও নেই এ তল্লাটে। সবাই মনে রেখে দেয় কিগানের মুখ। আর ওর ওই নীল চোখ দুটো। নিজের ভেতর মাকে দেখতে পায় ও। দেখতে পায় চৌকো চিমনি দিয়ে ধোঁয়ার গোল্লা উঠছে। আর শুনতে পায় ঠাকুরমার গলা, 'মাতৃমুখী পুত্র, সুখী হয়।'

'সুখ' শব্দটার মানে ঠিক বোঝে না কিগান। ছোট্ট চেরি ট্রি-র কাছে গিয়ে দাঁড়ানো আবছা ছোটবেলাটা কি সুখের মধ্যে পড়ে? বাবা-মায়ের অস্পষ্ট মুখটা কি কোনও অদ্ভুত অনুভূতি এনে দেয় ওকে? নাকি ঠাকুরমার কাছে চলে আসার পর উত্তর কলকাতার সেই লম্বা ছাদ, ঠাকুরমার কাছে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা বৃষ্টি রাত বা গলি ক্রিকেটে সবা জেঠার বারান্দায় বল তুলে দিয়ে ছয় মারাটা সুখ?

আসলে সেই ছোট্ট থেকে কিগানের জীবনে এমন সব তীব্র বাঁক ও ভাঙন এসেছে যে, সুখ-টুখের মতো ব্যাপারগুলো গুলিয়ে গেছে একদম। তবে হ্যাঁ, দুঃখটা স্পষ্ট টের পায় ও। ছোট থেকেই টের পায়।

সিন্থিয়া নামে একজন ন্যানি ছিল কিগানের। মহিলা কালো আর মোটা। মাথায় কেমন ছোট ছোট গোল্লা করে বেঁধে রাখত চুল। বাবা-মা দু'জনকেই কাজে বেরোতে হত বলে সকাল আটটার ভেতর চলে আসত সিন্থিয়া।

সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল খুব। কিগানের মনে আছে ওদের অ্যাপার্টমেন্টের পিছন দিকে যে-লোহার সিঁড়ির পাশে ফুলের টব রাখা থাকত তাতে বৃষ্টির জল জমে একদম উপচে পড়ছিল। আর লাল-হলুদ ফুলগুলো নিরুপায় হয়ে তাকিয়েছিল এ ওর দিকে।

উল্টো দিকে একটা বিলবোর্ডের তলায় ধূসর রঙের পায়রারা বসেছিল সার দিয়ে। কিগান কাচের জানলার গায়ে নাক লাগিয়ে দেখেছিল নীচে ছাতা মাথায় বাবা আর মা একটা গাড়িতেই দৌড়ে উঠে গেল। শুধু গাড়িতে ঢোকার মুখে মা যেন একবার পার্পল ছাতা সরিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়েছিল।

তারপরের সময়গুলো যেন জল পড়ে লেপ্টে যাওয়া ফাউন্টেন পেনের লেখা। যেন ঘষা কাচের ওপারে কিছু মানুষের নড়াচড়া। যেন বহু দূরের কোনও আবছা গলার স্বর।

কিগানের মনে আছে সিন্থিয়ার দৌড়ে আসা। পুলিশ গাড়ির ভেজা শীতল সারি। অনেক লোক। ক্যামেরা। আর 'রোড অ্যাক্সিডেন্ট', 'রোড অ্যাক্সিডেন্ট' শব্দ দুটো। কিছু বুঝতে পারেনি কিগান। এখনও যেন কিছু পারে না। শুধু মনে হয় সার বেঁধে বসে থাকা ধূসর পায়রা। মনে হয় পার্পল ছাতা সরিয়ে উঁকি দেওয়া মায়ের হাসি একটা মুখ।

হৈমবতী কারও কথা শোনেননি। প্রচুর পয়সা ছিল। কারও ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না হৈমবতী। তাই নিজেই লন্ডনে গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন নাতিকে।

অ্যাপার্টমেন্টে ফরসা মোটা হৈমবতীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল কিগান। ওকে বলা হয়েছিল গ্র্যান্ড মাদার। বলা হয়েছিল, ওঁর সঙ্গে এবার থেকে থাকতে হবে ওকে। হৈমবতী জড়িয়ে ধরেছিলেন কিগানকে। খুব সুন্দর একটা গন্ধ পেয়েছিল কিগান। ঝাঁঝালো, মিষ্টি আর নির্ভরতার গন্ধ। এই গন্ধটা তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত হঠাৎ হঠাৎ ভেসে আসে কিগানের কাছে।

হৈমবতী বলেছিলেন, 'আমার সঙ্গে থাকবে তুমি। আমাদের অনেক দূর যেতে হবে, কেমন?'

অনেক দূর যেতে হবে। অনেক অনেক দূর যেতে হবে। সেই ছোট থেকে কিগান বুঝেছিল ওকে অনেক দূর যেতে হবে, একা।

আজ দীপাবলী। ফ্যাক্টরি ছুটি। অবশ্য সবার ছুটি নয়। বয়লার একবার ফায়ার করতে সময় লাগে কিছুটা। তাই বয়লার নেভানো যায় না। বয়লার চলছে। কিগানকে শুধু সন্ধের দিকে একবার ফ্যাক্টরিতে রুটিন ভিজিট করতে হবে। গত কয়েকদিন ধরে বয়লার নিয়ে একটা গণ্ডগোল চলছে। যদিও সেটা কিগান খানিকটা মিটিয়েছে। তবু পুরোটা মেটেনি। আসলে বয়লারম্যান যারা আছে তাদের মধ্যে সন্ধের শিফ্‌টে যে থাকে, সেই অজিত ছেলেটা খুব ত্যাঁদড়। কথায় কথায় ইউনিয়ন দেখায়। প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে কিগানকে গোটা প্রোডাকশনের চেনটা দেখতে হয়। কারণ, একটা কোথাও গণ্ডগোল হলে পুরো প্রোডাকশনের ওপর প্রভাব পড়ে।

রুহান বলেছিল, 'এসব প্রোডাকশন ম্যানেজার-ফ্যানেজার হতে যেও না। পুরো বাঁশের কাজ। থ্যাঙ্কলেস জব। প্রোডাকশন যখন স্মুদ চলবে কেউ নাম করবে না। কিন্তু যখনই আটকাবে, সে এক ঘণ্টার জন্য হলেও, গালাগাল দিয়ে বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বে। কলকাতা ছেড়ে মরতে কেন যে, অত দূর যাচ্ছ?'

মরতে কি? না, বাঁচতে? কেন কলকাতা ছেড়েছে কিগান? না ছেড়ে কি কোনও উপায় ছিল না?

কিগানের ঘাড়ের কাছটা ব্যথা করছে। মাথাটাও ঘুরছে যেন। প্রেশারটি কি আবার বাড়ল? শ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে বেশ। বুকে কষ্ট হচ্ছে। ভেবেছিল সব পিছনে ছেড়ে আসবে। কলকাতার সব ভুলে যাবে এই গ্রামে এসে। কিন্তু গত দু'-আড়াই মাসে তা আর হল কই? এখনও তো কষ্ট হয় ওর। তীব্র একটা যন্ত্রণা পাক খায় শরীরে, মনে। কাউকে বলতে পারে না সে কথা। বলতে পারবেও না কোনওদিন। আসলে ও যে কী মনে করে, তা কোনওদিন বলতে পারবে না দিঘিকে। কোনওদিন বলতে পারবে না যে, দিঘির চুল থেকেও ও অন্য এক আলোর গন্ধ পেত।

একা হতে খুব ভাল লাগে কিগানের। আর এই তলতাবনির জঙ্গল ওকে একা হতে সাহায্য করে। তাই এই পুজোর দিনে ও কোলাহল ছেড়ে ঢুকে এসেছে এই গাছপালাদের ভিড়ে। ছবি তুলেছে মনমতো। আর বসে থেকেছে। হেমন্তের অরণ্যে নির্জন হয়ে যেতে চেয়েছে কিগান।

সূর্যটা আর আকাশে নেই। একটা মনমরা বেগুনি রঙের আলো ধীরে ধীরে চেপে বসছে জঙ্গলের শরীরে। জলাশয়ের ওপারে এলোমেলো ঝোপের ভেতরে জোনাকিরা স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ। মশাও মুকুটের মতো ঘন হয়ে আসছে মাথার ওপর। এবার ফিরতে হবে।

কিগান ক্যামেরাটাকে ব্যাগে ভরে জঙ্গল থেকে বেরনোর জন্য এগলো। এখান থেকে বেরিয়ে সোজা ফ্যাক্টরি যাবে। তারপর বাড়ি।

ফ্যাক্টরির কাছেই একটা বাড়ির দোতলাটা ভাড়া নিয়েছে কিগান। অফিসই রেন্ট দেয়। চমক জোগাড় করে দিয়েছে বাড়িটা।

বুধিয়া নামে বছর আঠারোর একটা ছেলে কিগানের কাজকর্ম আর রান্নাবান্না করে দেয়। কলকাতা থেকে এই চাপাডাঙায় ট্রান্সফার নিয়ে আসার পরে কোথায় থাকবে ঠিক করতে পারছিল না কিগান। তখন ফ্যাক্টরির শশীবাবু আলাপ করিয়ে দিয়েছিল চমকের সঙ্গে। চমকই এই বাড়িটা ঠিক করে দিয়েছিল কিগানকে।

রোগা, বেঁটে আর নিপাট ভালমানুষের মতো চেহারার ছেলেটাকে প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি কিগান। কিন্তু এখন এখানে থাকতে থাকতে ওর দাপট বুঝতে পারছে।

বাড়িটার মালিক মানিক রায়। ভদ্রলোক এখানকার স্থানীয় এমএলএ সুধাদির দলেই আছেন। ওঁর চাল-গমের পাইকারি কারবার আছে। মানুষটা সদাশয়। সর্বক্ষণ হাসি লেগেই রয়েছে মুখে। কিগানকে দেখে বলেছিলেন, 'আমাদের গ্রামে বহুদিন পর আবার আপনিই সাহেব এলেন।'

'সাহেব?' কিগান অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে।

'নন? এমন সুন্দর গায়ের রং, নীল চোখ, আপনি সাহেব না হলে কি আর এই ভুসোকালি, আমি সাহেব?'

'আমার বাবা বাঙালি।' কিগান চেষ্টা করেছিল বোঝাতে, 'মা আইরিশ, কিন্তু বাবা বাঙালি।'

'তা হলেও, আমার কী সৌভাগ্য যে আপনি আমার বাড়িতে থাকবেন!'

কিগান আর কথা বাড়ায়নি। বুঝেছিল যে, কলোনিয়াল হ্যাংওভার কাটতে এখনও অনেক দেরি আছে এদের। গায়ের রঙের জন্য এখনও যে কত কিছু সামলাতে হয় মানুষকে!

তবে সেই সূত্রে চমকের সঙ্গে আলাপ ওর। আর এখন যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তবে সবটাই চমকের দিক থেকে। চমকের একটু হামলে পড়া স্বভাব আছে। মাঝেমধ্যে খাবার-দাবার নিয়ে হাজির হয় কিগানের ডেরায়। সঙ্গে মদও আনে। কিগান নিজে এসব খায় না। কিন্তু চমককে বারণও করে না। শুধুমাত্র মাত্রা ছাড়াতে না করে।

আজ কালীপুজো, কিগান জানে চমক আজকেও হানা দিতে পারে বাড়িতে। তবে আজ এসব ভাল লাগছে না কিগানের। আজ চমক আসলে ফিরিয়ে দেবে। কেন, কিগান জানে না, কিন্তু যে-কোনও উৎসবের সময়ই কিগানের মন খুব খারাপ হয়ে থাকে।

আজ আলোর উৎসব। ফ্যাক্টরিটাকেও ছোট ছোট আলো দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। দূরে, বিশাল লম্বা ওয়াটার রিজার্ভারটা দেখা যাচ্ছে। তার লম্বা সেন্ট্রাল কলামে আলোর সাপ পেঁচিয়ে উঠেছে। কিগান স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল। আর হঠাৎই ওর মনে পড়ে গেল সেই রিজার্ভারটার কথা। মনে পড়ে গেল তার চারপাশে গুটিয়ে আসা সন্ধের কথাও। কিগান মাথা নাড়ল। তারপর সামনের দৃশ্যে মনোযোগ দিল। ওর মনে হল, গোটা ফ্যাক্টরিটাকেই কেমন যেন ভিনগ্রহের আকাশযান মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এটা কোত্থেকে এল হঠাৎ? আগে তো এখানে ছিল না!

কিগান মেন গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল। গেটের ডান দিকে সিকিউরিটির ঘর। তাতে চারজন বসে থাকে। বাইরের কেউ ঢুকতে গেলে তাদের আগাপাশতলা চেক করে, ফোটো তুলে তবে ঢুকতে দেওয়া হয়।

আজও গেটের পাশের ঘরে রিটায়ার্ড ক্যাপ্টেন গুরুং বসেছিল। এখানকার সিকিউরিটি ইন চিফ। কিগানকে দেখে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বলল, 'কিগান ভাই, কার্ড পাঞ্চ করবে না?'

'না,' কিগান হাসল, 'আরে, আমি একরকম ছুটিতেই আছি ক্যাপ্টেন। কিন্তু বাড়িতেও তো কিছু করার নেই, তাই ভাবলাম বয়লারটা দেখে যাই।'

'একরকম ছুটি মানে?' গুরুং হাসল, 'তুমি ছুটি নাও না কেন বলো তো?'

'নেব, একদিন নেব।' কিগান হাসল।

'ঠিক আছে, অন্তত লগ-এ সই করে ঢোকো।' গুরুং হেসে ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল।

ঘরটা ছোট। কেমন যেন গুমোট। এখানে এরা বসে থাকে কী করে, ভাবল কিগান। সই করে ও বেরিয়ে এল ঘরের থেকে।'

গুরুং বলল, 'আরে চলো আমাদের গ্রামে। দেখবে মন একদম ফ্রেশ হয়ে গেছে। পাহাড়, চা-বাগান, মেঘ, ঝরনা, সুন্দরী মেয়ের দল, কী নেই? চলো একবার, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কী ঠিক হবে? আমার তো কিছু ভুল নেই।' কিগান হেসে তাকাল গুরুংয়ের দিকে।

গুরুং বলল, 'আমার কি এমনি এমনি বয়স হয়েছে নাকি? সারাজীবন আর্মিতে কি আমি ঘোড়ার ঘাস কেটেছি মনে হয় তোমার? যাক গে, পাহাড়ে চলো, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পাহাড়? কিগান গেছে পাহাড়ে। বেশ কয়েকবার ঘুরতে গেছে কিগান। বহুদিন আগে পাহাড় ওকে কষ্ট দিয়েছিল খুব। তবু পাহাড় খুব পছন্দের জায়গা ওর। সেই পাহাড়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে? সমস্ত কিছু আবার

হয়ে যাবে জলের মতো সহজ।

গুরুং ঘর ছেড়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে দাঁড়াল কিগানের পাশে। কাঁধে হাত রেখে বলল, 'ভুল নেই তো? তাহলে এবার বিয়ে করো একটা। দেখবে ঠিক হয়ে যাবে সব।'

সব ঠিক, সব ঠিক হয়ে যাবে। সবাই এক সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা বলে কেন? জীবন কি হিন্দি সিনেমা যে, শেষ হওয়ার আগে সব ঠিক হবে, সব গুছিয়ে উঠবে? কত মানুষ তো অসমাপ্ত কাজ, অসমাপ্ত বন্ধুত্ব, অসমাপ্ত সম্পর্ক রেখে দিয়ে ফট করে মারা যায়। তার বেলা? সব কি ঠিক হতেই হবে? এই 'সব ঠিক হওয়া'র কনসেপ্টটা ঠিক বুঝতে পারে না কিগান।

তা ছাড়া, বিয়ে! কাকে করবে? সেই কলেজ জীবনে বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল জিয়ানাকে। তার এত বছর পরে আর-একজনকে। কিন্তু...কোনওমতে চিন্তার রাশটা থামাল কিগান। যা সম্ভব নয়, তা বলে লাভ নেই। ভেবেও লাভ নেই।

কিগান হাসল, 'খুব বিয়ের কথা বলছ ক্যাপ্টেন! ভাবির জন্য মন-কেমন করছে?'

'আর ভাবি,' গুরুং হাসল, 'প্রথম প্রথম অমন ছিল। এখন বিয়ের বাইশ

বছর হয়ে গেছে। মন আর কেমন করে না।'

কিগান বলল, 'ঠিক আছে ক্যাপ্টেন, আমি একটু পিছনের দিকে যাব। বয়লার রুমের দিকে। তাহলে আসি?'

ফ্যাক্টরি চত্বরটা বেশ বড়। বয়লার রুম পিছন দিকে। অর্থাৎ, অনেকটা হাঁটতে হবে কিগানকে।

আজ ফ্যাক্টরি প্রায় শুনশান। শুধু হঠাৎ হঠাৎ সিকিউরিটির দু'-চারজন বেতের লাঠি হাতে ঘুরছে। আর কখনও কখনও দু'-একজন লেবারের মুখ দেখা যাচ্ছে।

কিগান হাঁটতে হাঁটতে আকাশের দিকে তাকাল। নানা রঙের বাজি ফাটছে। কোনওটা লাল, কোনওটা সবুজ, আবার কোনওটা সাদা। মানুষজন প্রাণপণে তথাকথিত বড় অনুষ্ঠানের শেষটা উপভোগ করতে চাইছে।

বয়লার রুমের কাছাকাছি যেতেই হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল কিগান। আরে এগুলো কী? এগুলো আবার ব্যাগের বাইরে বেরিয়ে এসেছে? আসলে কেউ দেখেনি কেন? এ শিফ্‌টে তো অজিত থাকে। ও দেখছে না কেন?

কিগান প্রায় দৌড়ে গেল বয়লার রুমের দিকে। দেখল, বাইরে একটা

চেয়ারে বসে সামনে একটা চেয়ারে পা তুলে কানে ইয়ারফোন গুঁজে প্রবল বেগে মাথা নাড়ছে অজিত। মনে হচ্ছে যে-কোনও মুহূর্তে ওর মাথাটা খুলে পড়ে গিয়ে ড্রপ খাবে মাটিতে। কিগানের রাগ হয়ে গেল। আচ্ছা ছেলে তো! কোম্পানি কি ওকে গান শোনার জন্য মাইনে দিচ্ছে নাকি?

'অজিত।' কিগান সামনে গিয়ে ডাকল।

অজিত শুনতেই পেল না। বরং মাথা নাড়ার বেগ যেন বাড়ল বেশ। হয়তো গানটা তার ক্লাইমেক্সের দিকে যাচ্ছে।

'অজিত।' কিগান এগিয়ে গিয়ে অজিতের কাঁধ ধরে ধাক্কা দিল।

'অ্যাঁ?' অজিত ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল। কান থেকে ইয়ারফোনটা খুলল।

'তুমি গান শুনছ?'

'তো কী হয়েছে?' অজিত মুখের ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা মুছে ফেলে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

'কালেক্টর ব্যাগ ফাটছে কী করে? এই দেখো বয়লার রুমের পিছনে আবার ফ্লাই অ্যাশ উড়ছে।'

'ব্যাগ ফেটেছে!' অজিত ঠোঁট চাটল। তাকিয়ে দেখল চারদিক। সত্যি পাতলা মিহি ছাই ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়।

'না তো এমনি-এমনি ছাই উড়ছে নাকি? আর তুমি গান শুনছ?'

অজিত পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুলটা কয়েক বার আঁচড়ে নিয়ে বলল, 'আমি কী করে বুঝব যে, এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যাগ ফেটে আবার বয়লারে ছাই উড়বে?'

'বুঝতে তো কেউ বলেনি। তোমার তো নজর রাখার কাজ। আর তুমি গান চালিয়ে মাথা নাড়াচ্ছ?'

অজিত হাসল, 'আপনি ফালতু টেনশন নিচ্ছেন স্যার। কিচ্ছু হবে না। না হয় ছাই উড়ল। গ্রামে ছড়াল। গ্রামের লোকদের একটু অসুবিধে হল। তাই বলে আমরা ভয় পাব কেন?'

'তর্ক কোরো না।' কিগান চোয়াল শক্ত করল।

'রিপোর্ট করবেন তো?' অজিতের গলায় ধার, 'করুন রিপোর্ট। আমিও ইউনিয়নে বলব।'

'ইউনিয়নের ভয় দেখিও না। তুমি কাজে অবহেলা করবে আর ইউনিয়ন দেখাবে?'

অজিত হাসল, 'আপনি স্যার ফালতু ক্যাচাল করছেন। ব্যাগ ফেটেছে, পাল্টে দিচ্ছি। ফালতু মটকা গরম করছেন কেন? আর যখন সময় হবে তখন ইউনিয়ন কেন অনেক কিছুই দেখাব। যা আপনি দেখেননি।'

কিগান চোয়াল শক্ত করে তাকাল অজিতের দিকে। ছেলেটা বেঁটে, মোটা। মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল। কিগানের ছ' ফুট দুই চেহারার সামনে লিলিপুট। ও যদি কলেজ জীবনের কিগান হত তাহলে এখনই অজিতকে তুলে দূরে এই ওয়েস্ট বিন-এ গুঁজে দেওয়া ওর কাছে দশ সেকেন্ডের ব্যাপার হত। কিন্তু এ-কিগান সেই কিগান নয়। এ-কিগানের বয়স হচ্ছে। প্রেশারের সমস্যা আছে। হাঁটুতে চোট আছে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল সেই দামাল কিগানটাকে খুব দক্ষ হাতে মেরে ফেলা হয়েছে এগারো বছর আগে।

না, সম্পূর্ণ মেরে ফেলা নয়। একজনকে দেখে নিজের অজান্তেই বেঁচে উঠেছিল কিগান। আবার হাসতে শুরু করেছিল। কিন্তু সেটাও গণ্ডগোল হয়ে গেল। আর সেই গণ্ডগোলটা এমনভাবে হল যাতে ও ছিটকে পড়ল এত দূরে। আজ কিগানের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র হারিয়ে গেছে। আজ কিগান সম্পূর্ণ প্রতিরোধহীন। প্রতিক্রিয়াহীন। কিগান বেঁচে আছে বেঁচে থাকতে হয় বলে।

কিগান অজিতের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'এসব কেন বলছ? কাজ করতে বলেছি, করবে। আর যদি কিছু দেখাতে চাও, দেখিও। কেমন?'

অজিত, কিগানের শান্ত গলা শুনেই বোধহয় থমকাল একটু। তারপর ঠোঁট চেটে হেঁ হেঁ করে বলল, 'না, না, স্যার তা নয়...'

'গ্রামের লোকজন যদি ফ্লাই অ্যাশ কেন উড়ছে বলে এবার তেড়ে আসে আমি তোমায় এগিয়ে দেব। কেমন! তখন ইউনিয়নে বোলো।' কিগান অজিতকে কথা শেষ না করতে দিয়ে হাঁটা দিল অন্যদিকে।

ফ্যাক্টরির এদিকটায় অন্ধকার। পিছনের দিক বলেই। বাউন্ডারির ওয়ালের গায়ে একটা বড় ক্র্যাকও দেখা দিয়েছে। কিগান মেনটেনেন্সে খবর দিয়েছিল। এখনও যে, কাজ হয়নি বুঝতে পারছে। তবু ক্র্যাকটা কতটা বেড়েছে তা দেখে নেওয়ার জন্য কিগান এগিয়ে গেল।

দেওয়ালটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে, মাথায় কাঁটাতারের ফেনসিং। দূরে লাগানো আলোয় আবছাভাবে ফাটলটা দেখা যাচ্ছে। হাত দিল কিগান। একটু বেড়েছে। গত মাসে দেওয়ালের আর-এক দিকে একটা বড় গর্ত হয়ে গিয়েছিল। পাম্প হাউস থেকে দুটো মোটর চুরি যায়। মেনটেনেন্স আর গুরুং চিঠি খেয়েছিল সেজন্য। চিঠি মানে শো-কজ। গুরুংয়ের দোষ ছিল না। তবে ওর একটা ছেলে সে রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আসলে মেনটেনেন্সের শশীবাবু খুব গেঁতো। চব্বিশ মাসে বছর। করছি করব করে কাটিয়ে দেয় সময়। এই যে, দেওয়ালটা ফেটেছে সেটার দিকে নজরই দিচ্ছে না। একটা কেলেঙ্কারি যখন হবে তখন লেজ ঘাড়ে করে দৌড়বে।

কিগান ভাবল, কাল সকালেই একবার শশীবাবুকে ঝাড় দিতে হবে। লোকটার নিজের ভালর জন্যই।

ক্যামেরার ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে আবার ফ্যাক্টরির দিকে গেল কিগান। আর ঠিক তখনই দেখল সিকিউরিটির একটা ছেলে দৌড়ে আসছে ওর দিকে।

'কী হল?' কিগান জিজ্ঞেস করল।

ছেলেটা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'স্যার, বড় সাহেব আর জিএম সাহেব এসেছেন। আপনাকে ডাকছেন। আপনি চলুন।'

'স্যার!' কিগান অবাক হল। এই দীপাবলির রাতে স্যার এসেছে? অবাক তো! কেন? অবশ্য ও জানে না প্রতি বছরই আসে কিনা। হয়তো কাজ আছে। কিগান জানে বস ফ্যাক্টরিতে এলে কোথায় বসে। ও সেই দিকে হাঁটা দিল।

গৌর রওশন দিওয়ানের তিরিশ লাখি সিলভার রঙের লম্বা গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে মূল অফিস বিল্ডিংয়ের বাইরে। বয়স্ক ড্রাইভারটি বাইরে দাঁড়িয়ে টুপিটা খুলে ঝাড়ছে। লোকটি ভাল। কম কথা বলে, কিগানকে দেখে হাসল। কিগানও হেসে দুটো সিঁড়ি করে লাফিয়ে উঠে গেল ওপরে।

কনফারেন্স রুমের পাশে গৌরের প্রাইভেট চেম্বার। দরজার কাছে গৌরের সর্বক্ষণের সঙ্গী বেয়ারাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও কিগানকে দেখে হেসে ছোট্ট কলিংবেলটা টিপল। চল্লিশ সেকেন্ড পরে দরজাটা খুলে দিল গৌর নিজে।

আজ সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিতে অন্যরকম লাগছে মানুষটাকে। গলায় দড়ির মতো মোটা সোনার চেনটা চকচক করছে।

গৌর হাসল কিগানকে দেখে। চওড়া প্রাণখোলা হাসি, 'আরে কিগান, তু কাঁহা থা ইয়ার? কব সে তুঝে খোঁজ রাহা থা। আর এ কী? দিওয়ালিতেও এমন সাদা-মাঠা ড্রেস পরে আছিস? তু বহত ভেজ হ্যায়। চল অন্দর আ।'

গৌরের কথাবার্তার ধরনটাই এমন। খুব মাই ডিয়ার টাইপ। তাই 'তুই' করে বললেও কেউ কিছু মনে করে না।

ঘরে ঢুকে দেখল স্যামও রয়েছে। স্যামুয়েল কুটিনহো এমনি হাসিখুশি। কিন্তু আজ স্যামের মুখ গম্ভীর। হাসিখুশি মানুষটা এমন হয়ে আছে কেন?

কিগান ওদের সামনের সোফায় বসল। টেবিলে খুব দামি স্কচ আর মাংসের দু'-তিন রকমের প্রিপারেশন রাখা।

'বৈঠা কিউ হ্যাঁয়? এক ড্রিংক বনা আপনে লিয়ে।' গৌর সামনে সোফায় শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে বলল।

'নো স্যার,' কিগান হাসল, 'অ্যালকোহল সহ্য হয় না।'

'তাই!' গৌর হাসল, 'আচ্ছা তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। এমন অদ্ভুত নাম কেন তোর? ক্যায়া মতলব হ্যায় ইসকা?'

কিগান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ছোট থেকে এক উত্তর বারবার দিতে হয়েছে ওকে। ও বলল, 'স্যার কিগান মানে লিট্‌ল অ্যান্ড ফিয়ারি, অর্ক মানে সূর্য, সান।'

'লেকিন অ্যায়সা মিক্সড নাম কিউ হ্যায় তেরা?' গৌর যেন আজ গল্পের

মুডে রয়েছে।

কিগান বলল, 'মা রেখেছিল। মা, আইরিশ ছিল। কিয়েরা ফেরেল।'

'ছিল মানে?' গৌর আজ একটু বেশি পার্সোনাল হচ্ছে যেন।

'আই ওয়াজ ফোর, হোয়েন দে বোথ ডায়েড।' কিগান শান্ত গলায় বলল। আজ নিজের বলা কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ও দেখতে পেল সারসার ধূসর পায়রা। পার্পল ছাতা সরিয়ে উঁকি দেওয়া মায়ের মুখ।

'সরি। এক্সট্রিমলি সরি।' গ্লাসটা টেবিলে রেখে সোজা হয়ে বসল গৌর। তারপর হাত নাড়িয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে বলল, 'রহনে দে উও সব। তারপর বল এই জায়গা কেমন লাগছে?'

'ভাল। কাম অ্যান্ড কোয়ায়েট।'

'তুই তো নিজেই জোর করে এলি।' গৌর হঠাৎ উঠে এসে কিগানের পাশে বসল। গ্লাসটা আবার তুলে নিল টেবিল থেকে। গোল গোল করে ঘুরিয়ে সরষের তেলের মতো তরলটাকে নাড়াল। তাতে ভাসমান দু'খণ্ড বরফের কিউব পরস্পর ধাক্কা খেল। ঠুংঠাং শব্দ করল। গৌর সেই দিকে তাকিয়ে বলল, 'তো, রাঘববাবুর সঙ্গে কথা হল? শুনলাম তো যে, দুর্গাপুজোয় ইউ ওয়্যার ইনভাইটেড।'

অবাক হল কিগান। লোকটা এও জানে? কে খবর দেয় এত?

গৌর হাসল, 'আরে আমি সব খবর রাখি। তার ওপর তোকে টম ক্রুজের মতো দেখতে, তোর খবর তো হাওয়ার আগে ছুটবে।'

'হ্যাঁ স্যার, গেছিলাম।' কিগান কথাটা বাড়তে না দিয়ে ছোট করে বলল।

'তো? ল্যান্ড নিয়ে কথা হল?' গৌর সটান তাকাল কিগানের দিকে

'স্যার?' কিগান চমকে গেল একটু।

'ল্যান্ড, জমি। কথা হল এ নিয়ে?' গৌর এবার স্থির। গলাটাও আর অত বন্ধুত্বপূর্ণ নেই।

'কোন ল্যান্ড স্যার?' কিগান অবাক হল।

গৌর ভুরু কুঁচকে স্যামের দিকে তাকাল, 'স্যাম আপনে বোলা নেহি ইসকো?'

স্যাম থতমত খেল। বলল, 'না স্যার, মানে...'

'হাউ ক্যালাস অফ ইউ।' গৌর দাঁতে দাঁত ঘষল, 'ইয়ার, আপ লোক মেরে গান্ডকে পিছে কিউ লগে হো? আর আমারও মাথায় লোক আছে। প্রেসিডেন্ট আমায় ভাল করে বাম্বু দেবে। জুস ফ্যাক্টরির সঙ্গে মিনারেল ওয়াটারের কাজটাও চালু করা দরকার, দ্যাট রাঘব চক্রবর্তী, জমিটা বিক্রি করেও ওই একটা ভাইটাল পিস কেন আটকে রেখেছে বুঝতে পারছি না। আরে বাবা, ফালতু সেন্টিমেন্ট দিয়ে কি জীবন চলে? তাছাড়া আমি বলেছিলাম, আপনি যা টাকা নেবেন আমরা দেব। আর তাতেই বুড়োর ইগোতে লাগল। বলে আমরা নাকি টাকার গরম দেখাচ্ছি! শালা, ইগোইস্ট! ওই সামান্য কথায় জমিটা আটকে দিয়েছে! তু মুঝে বতা কিগান, মিনারেল ওয়াটার কে লিয়ে ও জমিন তো চাহিয়ে না? নেহি তো ক্যায়সে চলেগা? আর তোকে ব্যাপারটা নিয়ে রাঘববাবুকে বোঝাতে হবে। আমরা অফিশিয়ালি ওঁকে কনভিন্স করতে পারছি না, তু জরা পার্সোনালি দেখ। কাম হোনা চাহিয়ে।'

ওদের প্যার্টিকল বোর্ডের পাশেই মার্চেন্ট মাল্টিপল্‌স একটা বড় জমি কিনেছে টেট্রাপ্যাকে গ্রেপ আর অরেঞ্জ জুস তৈরি করবে বলে। তার সঙ্গে মিনারেল ওয়াটারও তৈরি করতে চায় ওরা। কিন্তু তার জন্য জমি আর দিচ্ছে না রাঘব চক্রবর্তী। কেন? না ওই জমিটা নাকি স্পেশ্যাল। আর গৌর নাকি অসভ্যের মতো টাকা দেখিয়ে কথা বলেছে রাঘবকে। তাই রাঘব চক্রবর্তী বলেছেন যে, জমিটা বিক্রির জন্য নয়। কিন্তু গৌর কি আর সেসব বুঝবে? ওর তো ব্যবসা হলেই হয়। এর সবটাই জানে কিগান। কিন্তু তবু গৌরের মুখ থেকে না শুনে নিজে কিছু বলতে চায়নি।

কিগান পুজোর দিন গিয়েছিল বটে ওখানে। রাঘববাবু নিজে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু অমন ভিড়ে কথা হয়নি ঠিক। সামান্য কুশল বিনিময় হয়েছিল মাত্র। আর কিগানের মূল আকর্ষণ ছিল অর্কিড। একটা বড় গ্লাস হাউস করেছে রাঘববাবুরা। সেখানে প্রচুর অর্কিড রাখা। তার ছবি তোলাতেই মূল নজর ছিল। আর সেখানেই হঠাৎ রাঘববাবুদেরই একটা গোরু ঢুকে পড়ে। সেটা বের করতে গিয়ে হাতে সামান্য ব্যথাও পেয়েছিল কিগান। অবশ্য তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাধুদা আর রাহি এসে পড়েছিল।

আচ্ছা, রাঘব চক্রবর্তীর সঙ্গে কি এসব নিয়ে কথা বলতে পারে কিগান? ও তো প্রোডাকশনের দায়িত্বে আছে। পাবলিক রিলেশনের লোকজন এসব সামলাক না। আদিকে বলছে না কেন গৌর?

গৌর একটা চিকেন উইং তুলে কিগানকে বলল, 'তু তো হিরো হ্যায়। জান পহেচান বড়াহ। তারপর কনভিন্স কর। ফর দ্যাট ল্যান্ড আমি ভাল প্রাইস দেব। টাকা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

'টাকা!' কিগান বলল, 'রাঘব চক্রবর্তী তেমন লোক নয়।'

'দুর,' গৌর হো হো করে হাসল, 'কেউই তেমন থাকে না। তাদের তেমন করে নিতে হয়। এভরি ওয়ান ইন দিস ফাকিং ওয়ার্ল্ড ইজ সেলেবল। শুধু প্রাইস ঠিক করতে হয়। জাস্ট নো রাঘব চক্রবর্তীজ প্রাইস। কেমন?'

কিগান ভাবল, ব্যাপারটা যদি তেমন সহজ হত, তবে গৌর কেন পারল না? কেন গৌরের টাকার সঙ্গে গৌরকেও দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলেন রাঘববাবু? এইসব টাকাপয়সা কোথাও কোথাও ভোঁতা হয়ে যায়। হঠাৎ স্যামের ফোনটা বেজে উঠল। স্যাম পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে নামটা দেখে বিরক্ত হল যেন। বলল, 'ওঃ, আজকেও পিছু ছাড়বে না।' তারপর ফোনটা কেটে, একদম সুইচ অফ করে দিল।

গৌর হাসল, 'কৌন থা স্যাম? গার্ল ফ্রেন্ড?'

'না স্যার,' স্যামও হাসল, 'নট দ্যাট লাকি। ওই প্রোজেকশন কর্পের মেয়েটা।'

'আরে, মেয়ে? অর, আপনে ডিসকানেক্ট কর দিয়া?' গৌর চুকচুক শব্দ করে মাথা নাড়ল, 'আপ পাগল হো?'

স্যাম বলল, 'স্যার ওই জুস ফ্যাক্টরির প্রজেক্টটা নিয়ে মাথা খাচ্ছে। জাস্ট স্পেসিফিকেশন দিয়েছি সবে, তাতেও দিনে চল্লিশবার ফোন আসছে।'

'কৌন সা কোম্পানি? কে এমন করছে?' গৌর আর-একটা বড় ড্রিঙ্ক বানাল।

স্যাম বিরক্ত মুখে নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'প্রোজেকশন কর্পের একটা মেয়ে। ওদের ছ'জনকে তো ওয়াটার বার্ড তুলে নিয়েছে। ফলে মেয়েটা সেল্‌স টিমে নতুন। মাথা খেয়ে নিচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে।'

'আপ তো লাকি হো।' গৌর হালকা গলায় কথাটা বলে কিগানের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

'না স্যার,' স্যামের মুখে বিরক্তি, 'কিছুই এখনও হয়নি, আর মাথা খাচ্ছে! ওই জমিটা যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ তো আর কাজ শুরু করা যাবে না। কে ঝামেলা হ্যান্ডেল করবে?'

'তা মেয়েটার নাম কী? হ্যাভ ইউ মেট হার?'

'কলকাতায় একবার মিট করেছি। ম্যারেড। বাট কোয়ায়েট চার্মিং, আই মাস্ট সে।' স্যাম এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করল, বলল, 'লাস্ট টেন ইয়ার্স শি ওয়াজ আউট অব ইন্ডিয়া।'

'তাই? ইন্টারেস্টিং।' গৌর হাসল, 'নাম কী?'

'নাম?' এক মুহূর্ত ভাবল স্যাম। তারপর বলল, 'আ লিট্‌ল আনইউজুয়াল। ইয়েস, বোস, জিয়ানা বোস।'

আলতো একটা কুয়াশার পর্দা উড়ল কোথাও? ভোরের কলকাতা থেকে কে যেন লঘু পায়ে হেঁটে এল এত বছর পর। এত বছর পর একটা রোদ এসে পড়ল ক্লাস ঘরে। কে যেন গেয়ে উঠল, 'আমি কান পেতে রই...'

কিগান বুঝল, এই নীল রঙের গ্রহটা বড্ড বেশি গোল আর বড্ড ছোট। এখানে বারবার যার সঙ্গে দেখা হওয়ার নয়, তার সামনেই পড়তে হয়। যে, কথা শুনতে ইচ্ছে করে না, সে কথাই শুনতে হয়। যে-স্মৃতি ভুলতে চায় তাই ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথায়। কিগান বুঝল, ও কলকাতা আর অতীত ছেড়ে আসতে চাইলেও তারা ছাড়ছে না কিগানকে।

কিগান মাথা নিচু করল। ভাবল, জিয়ানা কি তবে এই চাপাডাঙাতেও আসবে? আবার কি এই কিগানের দেখা হবে সেই কলেজবেলার কিগানের সঙ্গে?

৭

মোবাইল ফোনটা নতুন অফিস থেকে দিয়েছে। কিন্তু খুব একটা দামি নয়। বরং একদম সাধারণ। ছোট রঙিন স্ক্রিন। তাতে ছানাকাটা ছবি আসে। তবু মোবাইল তো! প্রোজেকশন কর্প-এ ওকে সুখেনদাই ঢুকিয়েছেন। আর বলেছেন, 'আমি দেখি তুই ক'টা চাকরি পালটাতে পারিস। মাইরি রুহান, খেলাটা তো গেছেই, মানুষ হিসেবেও এমন ক্যালাস কেন তুই?'

প্রোজেকশন কর্প-এ সুপারভাইজার পদে ঢুকেছে রুহান। কিন্তু আসলে টুকটাক কাজ ওকে দেওয়া হয়। জব সাইটে মাল পৌঁছে দেওয়া, লেবার পেমেন্টের টাকা নিয়ে যাওয়া, বাজার থেকে খুচখাচ ফিটিং কেনা ইত্যাদি মিসলেনিয়াস কাজ করে ও। মাসে চার হাজার টাকা প্লাস টিএ। কনট্রাক্ট-এ রাখা হয়েছে ওকে। অন্যান্য বেনিফিট নেই।

তবে বেনিফিট-টিট নিয়ে কখনওই চিন্তা করে না রুহান। সুখেনদার কল্যাণে চাকরি যে পেয়েছে, এই অনেক। না হলে ওর যোগ্যতায় কি আর এসব হত নাকি? আগের চাকরিটা যেদিন গেল সেদিন বাড়ি ফিরে মায়ের হাতে যা হেনস্থা হয়েছিল ও!

মা। মনে পড়লেই ভয় লাগে রুহানের। দিনকে দিন মা যেন আর

সহ্যই করতে পারছে না রুহানকে। রুহান সামনে আসলেই যেন মায়ের প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে। চাকরি গেল যেদিন সেদিন তো রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিল রুহান। ভেবেছিল ডাক্তার-টাক্তার ডাকতে হবে বোধহয়।

দু'টি মাসের মাইনের খাম হাতে নিয়ে বাড়িতে ফিরে প্রথমেই তোপের মুখে পড়েছিল রুহান। মা বসেছিল ঘরে। মুখচোখ লাল। ও বুঝতে পারেনি কেন এমন করে রয়েছে মা। তাই জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হয়েছে মা? শরীর খারাপ?'

'তোর মতো জানোয়ার ছেলে থাকলে শরীর, মন সব খারাপ থাকে।'

'কেন? আমি কী করলাম?' রুহান অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মায়ের দিকে।

'জানোয়ার, খেয়ার বাপের বাড়ি গিয়েছিলি কেন তুই?'

'কাকিমার বাপের বাড়ি? কে বলল তোমায়?' রুহান অপ্রস্তুত হয়েছিল খুব।

'ও, লুকিয়ে-চুরিয়ে আজকাল এসব করা হচ্ছে! খেয়ার মা ফোন করে বলছিল যে, তুই খুব ভাল। খাবার পৌঁছে দিয়েছিস। ভাল! হুঁঃ। ঘরের শত্রু বিভীষণ! কাকা-কাকিমা চাকরের মতো খাটাচ্ছে আর তুই খাটছিস। গোরু একটা। সারাজীবন এমন গোরু হয়ে থাকবি তুই? বাবাকে খেয়েছিস এবার আমায় খাবি?'

'মা,' রুহান চিৎকার করে উঠেছিল, 'কী যা-তা বলছ? কেন তোমায় খাব?'

'অ্যাঁ, আমার জন্য কী করেছিস তুই? কী করেছিস আমার জন্য?' মা চিৎকার করছিল সমানে, 'ও, তা করবি কেন? আমার জন্য করলে তো আর

আমি ফোন করে তোর নামে অন্যের কাছে সুখ্যাতি করব না। মা তো আপদ, মরলেই হয়!'

'কেন এমন বলছ মা?' রুহানের ক্লান্ত লাগছিল, 'তোমার জন্য কিছুই করিনি আমি?'

রুহানের মনে পড়ে যাচ্ছিল সব। নন্দার মুখটা ভেসে উঠছিল চোখের সামনে।

'না, কিচ্ছু করিসনি। বরং আমার স্বামীকে খেয়েছিস।' মা হাঁফাচ্ছিল রীতিমতো।

রুহান কী করবে, কী বলবে, বুঝতে পারছিল না। ও পকেট থেকে মাইনের খামটা বের করে মায়ের দিকে দিয়ে রাগটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, 'মা, বাদ দাও। এটা রাখো। দু'মাসের টাকা।'

'দু'মাসের? কেন?' মা থমকে গিয়েছিল।

ভুল। আবার ভুল। রুহান যে সারাজীবনে কত ভুল করবে! কষ্ট হচ্ছিল নিজের নির্বুদ্ধিতায়। ভাবছিল, কী করতে গিয়ে কী বলে ফেলল।

মা বুঝে গিয়েছিল এক লহমায়। তারপর বলেছিল, 'ও এই কাজটাও খুইয়েছিস? ইতর একটা! অকম্মার ঢেঁকি! লোকের হয়ে বিনি পয়সায় চাকরগিরি করতে পারো আর একটা ঢঙের চাকরি রাখতে পারো না। তোর জন্য কি এবার লোকের বাড়িতে ঝি-গিরি করব নাকি? ক্লাব থেকেও তো এক পয়সা আনিস না। অমন বাপের এমন অপদার্থ ছেলে হল কী করে?'

মা চিৎকার করতে করতে হঠাৎ টলে পড়ে গিয়েছিল বিছানায়। রুহান ভয় পেয়ে দৌড়ে গিয়েছিল মায়ের দিকে। মা চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। কোনও কথা বলছিল না। খাবার জলের গ্লাস থেকে হাতে জল নিয়ে মায়ের

মুখে ঝাপটা মেরেছিল রুহান।

চোখ মেলে মা বলেছিল, 'মরিনি এখনও। অত সহজে মরব না। দেখব তুই অধঃপাতের কোন চরম সীমায় যেতে পারিস।'

অধঃপতন! রুহান মাথা নিচু করেছিল। চুরির অপবাদে চাকরি যাওয়া। প্রেমিকাকে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ছেড়ে আসা। খেলার টিম থেকে বাদ হয়ে যাওয়া। বাবার মৃত্যুর কারণ হিসেবে চিহ্নিত হওয়া। আর কোথায় পতিত হবে রুহান? আর কত দূর নামবে ও?

ভাগ্যিস সেপ্টেম্বর থেকেই এই প্রোজেকশন কর্প-এ সুখেনদা ঢুকিয়ে দিয়েছেন রুহানকে। না হলে কপালে যে কত ভোগান্তি ছিল! রুহান এই কাজটা আর হারাতে চায় না। কোম্পানিটা খুব ভাল। এক বছর ভাল কাজ করলে বলেছে পার্মানেন্ট করে নেবে। এবার চাকরি গেলে সুখেনদা আর কিছু করবেন না। মানে, রুহানের আর নিজের কিছু বলার মুখ থাকবে না। তাই কাজটা মন দিয়েই করছে। এই যেমন আজ রোববার, তবু দরকার বলে কাজে বেরিয়েছে।

প্রোজেকশন কর্প ত্রিপুরায় একটা বড় সোয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লান্টের অর্ডার পেয়েছে। সেখানে অনেকগুলো রিডাকশন গিয়ার লাগবে। এখন, রিডাকশন গিয়ারের মেক, অর্থাৎ কোন কোম্পানির রিডাকশন গিয়ার হবে তা বলে দেওয়া রয়েছে অর্ডারে। কিন্তু প্রোজেকশন কর্প খুব খারাপ দামে কাজটা নিয়েছিল, তাও দেড় বছর আগের রেটে। কিন্তু সব কিছুরই তো দাম বেড়ে গিয়েছে। ফলে লস নির্ঘাত হবে।

ঠনঠনিয়ায় কিছু দোকান আছে যেখানে ব্র্যান্ডেড কোম্পানির নামে ডুপ্লিকেট জিনিস বিক্রি হয়। প্রোজেকশন কর্প তেমন একজন দোকানির সঙ্গে কথা বলে মাল নেবে ঠিক করেছে।

আজ রোববার, দোকান বন্ধ, কিন্তু তবু দোকানের লোকটি তার ম্যানেজারকে পাঠাচ্ছে কিছু ক্যাশ নেবে বলে।

নিজের ঘড়িটা বেশ কিছুদিন হল নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এখন আর ঘড়ি-টড়ি পরে না রুহান। তাছাড়া মোবাইল তো সময় বলেই দেয়। মোবাইলেই সময় দেখল ও। দেড়টা বাজে এখন। এবার এখান থেকে কাজ সেরে দেশপ্রিয় পার্কে যেতে হবে। একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আছে। ওই টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ধাঁচের। খেললে দু'হাজার টাকা পাওয়া যাবে। একটা মারোয়াড়ি কোম্পানি আয়োজন করেছে টুর্নামেন্টটার। ষোলোটা টিম খেলবে। চ্যাম্পিয়ন হলে পাঁচ লক্ষ টাকা পাবে টিম। তবে টিম মানে নানা ছোটখাটো ক্লাব টিম। তারা বেশির ভাগই কলকাতার এ-ডিভিশন ক্লাবগুলো থেকে প্লেয়ার তুলে আনে। আর টাকার জন্য প্লেয়ারও খেপ খেলে দেয়।

রুহান এসব খেপটেপ খেলত না একদম। ওর মনে হত, ফাস্ট বালারদের জীবন এমনিতেই প্রচুর চোট-আঘাতের হয়। তার ওপর যদি কেউ বেশি চাপ দেয়, তাহলে খেলোয়াড় জীবন অনেক ছোট হয়ে যাবে। তাই যে যতই টাকার প্রলোভন দেখাক, স্টার ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার পর রুহান আর এই ছোটখাটো ঘুঘনি-পাউরুটির খেলায় ঢোকেনি।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্য। তিরিশ বছর বয়স হয়ে গেছে ওর। বড় খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্নরা ধরাশায়ী হয়েছে একে-একে। এখন শুধু ভয়, স্টার যদি বাতিল করে দেয় ওকে! যদি বলে দেয়, ভাই এবার এসো। তবে? তবে কী হবে? কোথায় যাবে ও এই বয়সে?

তাই ফসল তুলে নিতে হবে। যেখানে যতটা রোজগার করা যায়, সবটা করে ফেলতে হবে। তবু বহু বছরের অভ্যেস, তাই হালকা দ্বিধা ছিল। কারণ, জগুদা।

জগুদা শুধু স্টার ইউনিয়নে ওকে আনেনি। বরং হাতে ধরে বল করা শিখিয়েছে। বুঝিয়েছে, ফাস্ট বোলিং মানে গায়ের জোর দেখানোই নয় শুধু। এ আরও বেশি কিছু। আরও জীবন্ত কিছু। অতটা দৌড়ে এসে যে অমন জোরে বলটা ছুড়ছে, সে তো শুধু আর নিজের শক্তির পরীক্ষা দিচ্ছে না। সে জীবনীশক্তি আর মস্তিষ্কশক্তিরও পরীক্ষা দিচ্ছে।

জগুদাই প্রথম বুঝিয়েছিল যে, ফাস্ট বল করা মানেই সব বলকে জোরে করতে হবে, এমন নয়। বরং ভাল বোলার সবসময় গায়ের জোরের চেয়ে বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেবে। তখন জগুদা একদম চোখে চোখে রাখত রুহানকে। পান থেকে চুন খসলে বকে শেষ করে দিত।

এমনই এক সময় নৈহাটির একটা টিম কলকাতায় এসে রুহানকে ওদের হয়ে একটা টুর্নামেন্ট খেলতে বলে। বলে, দশ হাজার টাকা দেবে। সে টিম জিতুক বা হারুক, যাই হোক না কেন। রুহানের আনন্দ হয়েছিল খুব। তাছাড়া সংসারে টাকাটাও দরকার ছিল। তবে লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়। ও ভেবেছিল জগুদাকে বলেই যাবে। জগুদার তো না বলার কারণই নেই।

কিন্তু জগুদা রেগে গিয়েছিল ভীষণ। রুহান যখন কথাটা বলেছিল জগুদার হাতে একটা স্টাম্প ছিল। রুহানের কথাটা শুনে জগুদা প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলেছিল, 'না, না, একদম নয়। খবরদার ওই পথ মাড়াবি না।'

'কেন জগুদা?' রুহান অবাক হয়েছিল।

'কেন মানে? আমি বলছি বলে।' জগুদা বিরক্ত হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে।

'কেন বলছ?' রুহানের মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। বয়সে যারা বড় হয় তারা মাঝে মাঝে এমনভাবে কথা বলে যেন মাথা কিনে নিয়েছে। সম্মান করা হয় বলে কি যা ইচ্ছে তাই বলবে নাকি!

'বলছি যখন শুনতে আপত্তি কোথায় তোর?' জগুদার চোখ দুটো যেন জ্বলছিল।

'কেন বলবে তো? জানো ওরা টাকা দেবে? দশ হাজার টাকা।'

'টাকা?' নাক কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়েছিল জগুদা, 'তো? টাকা দেবে তো কী হয়েছে? মাথা কিনেছে নাকি?'

'আমার টাকাটা দরকার জগুদা। খুব দরকার।'

'দশ হাজার টাকার জন্য ভবিষ্যতের দশ লাখ বাদ দিবি?'

'মানে?' রুহান অবাক হয়েছিল।

'গাধা তুই? আস্ত গাধা নাকি? স্টার থেকে এবার তোর বেঙ্গলে চান্স হতে পারে। আর সে এমন ভিখিরিগিরি করার জন্য খেপ খেলে বেড়াবে? লজ্জা লাগছে না?' বিরক্ততে হাতের স্টাম্পটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল জগুদা।

'কিন্তু টাকাটা যে এখন ইম্পর্ট্যান্ট।' রুহান আর কী বলবে বুঝতে পারছিল না।

'ইম্পর্ট্যান্ট। হ্যাঁ, ইম্পর্ট্যান্ট। জানি। কিন্তু শুধু টাকাটাই চিনবি? আর কিছু ভাববি না? এদেশে মানুষ মেরেও হাজার হাজার টাকা রোজগার করা যায়। লোক ঠকিয়ে রোজগার করা যায়। ইম্পর্ট্যান্ট বলে তাই এগুলোও করবি? নাথিং ইজ ইম্পর্ট্যান্ট আনলেস উই মেক ইট সো। আরে টাকাটাই শুধু দেখিস? ডিগনিটি কিছু নয়? ফাস্ট বোলারের শরীরটাই সব। বাজে জায়গায় খেলে এই শরীরটার ক্ষমতা কমাবি কেন? জানিস, এইসব খেপ খেলার মাঠ কেমন হয়? তারপর কত ম্যাচ খেলতে হয়? ফালতু চোট হয়ে গেলে কী করবি? শুধু টাকা আর টাকা। লোভ। এত লোভ কেন তোদের?'

জগুদার উত্তেজিত চেহারা আর চিৎকারে আশপাশে লোক জমে গিয়েছিল। অন্যান্য যারা প্র্যাকটিস করছিল তারা নেট ছেড়ে চলে এসেছিল। দু'-চারজন কর্মকর্তা আশপাশের আড্ডা ছেড়ে উঠে এসেছিল। আর সব্বাই অদ্ভুত এক চোখে দেখছিল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা রুহানকে।

রুহান, উত্তেজিত জগুদার সামনে থেকে সরতেও পারছিল না। আবার সবার অমন, 'এই ব্যাটা চোর' ধরনের দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেও খারাপ লাগছিল। আসলে কষ্ট হচ্ছিল রুহানের। মনখারাপ হচ্ছিল। ও কী এমন কথা বলেছে যে, জগুদা এমন রাগ করল? ও তো ইচ্ছে করলে না বলেও খেলতে যেতে পারত। জগুদা জানতে পারত? সততা দেখাতে গিয়ে এ কেমন ঝঞ্ঝাট হল রে ভাই!

জগুদার রাগও যেন কমছিল না। এক নাগাড়ে বলেই যাচ্ছিল যা খুশি কথা। রুহান মাথা নিচু করেছিল শুধু। শেষে জগুদা বলেছিল, 'আমি যদি শুনি তুই খেলতে গেছিস, তাহলে তোর একদিন কী আমার একদিন। যেমন রাস্তায় ছিলি তেমনই রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেব তোকে।'

জগুদার রুদ্রমূর্তি আর শেষের কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল রুহান। ও রাস্তায় পড়ে ছিল? রাস্তা থেকে ওকে কুড়িয়ে এনেছে? জগুদা এমনটা বলতে পারল!

বাড়ি ফেরার পথে খুব কান্না পেয়েছিল রুহানের। সবার সামনে জগুদা এমন বলতে পারল! মনে হয়েছিল আর মাঠে যাবে না কোনওদিন। কী হবে মাঠে গিয়ে? ও ছোট, সামান্য প্লেয়ার তাই কি ওকে অসম্মান করা, খারাপ কথা বলা সহজ? আর রাস্তার ছেলে তো ও নয়। বাবা যদি অমনভাবে মারা না যেত ও কি আর এই অবস্থায় থাকত? দিব্যি তো রেজাল্ট ভাল হচ্ছিল ক্রমশ। বাবা যে হঠাৎ কেন মারা গেল?

বাড়িতে ফিরে যথারীতি মায়ের গঞ্জনা শুনে ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছিল না। তাছাড়া বন্ধুবান্ধবও তো কেউ নেই রুহানের। আর যে ছিল, সেই কিগান থাকত নর্থে। সুকিয়া স্ট্রিটে।

আচমকা মায়ের ডাক শুনতে পেয়েছিল ও। মুখ ঘুরিয়ে দেখেছিল ছাদের দরজার কাছে মায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে জগুদা।

জগুদা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছিল ওর দিকে আর মা আবার নেমে গিয়েছিল নীচে।

রুহান যতই রেগে থাকুক বা ওর যতই মনখারাপ হোক কোনওদিনই কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারে না। জগুদাই বলে যে, ওর ফাস্ট বোলার হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল এই নরম স্বভাব। পৃথিবীর অধিকাংশ ফাস্ট বোলাররা অ্যাগ্রেসিভ হয়।

রুহান তর্ক করত, বলত, 'কোর্টনি ওয়াল্‌শ? তিনি তো অমন নন।'

'আরে পাগলা,' জগুদা হাসত খুব, 'একসেপশন এগজ্যাম্পেল হতে পারে নাকি?'

সেই জগুদা এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল রুহানের। দূরে বজবজ লাইন ও তার সবুজ-হলুদ ট্রেনের দিকে তাকিয়ে জগুদা হাতে ধরা একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট ছাদের পাঁচিলের ওপর রেখে বলেছিল, 'পেঁয়াজি আছে। বুধনের পেঁয়াজি। যদিও এসব খাওয়া আমার ছেলেদের আমি এনডর্স করি না। তাও, আজ খা।'

রুহান কিছু না বলে দূরে তাকিয়েছিল।

জগুদা বলেছিল, 'কী রে খুব রেগে আছিস? নে, খা তো।'

গোল ঘুটের মতো দেখতে পেঁয়াজি হাতে নিয়েছিল রুহান।

জগুদা সামনে দিয়ে যাওয়া ট্রেনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'লোকাল ট্রেনের সঙ্গে দূরপাল্লার মেল ট্রেনের পার্থক্য কী জানিস?'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল রুহান। ও বুঝেছিল উত্তরটা জগুদাই দেবে।

'শোন,' জগুদা শুরু করেছিল, 'মেল ট্রেন লোকাল ট্রেনের মতো সব স্টেশনে দাঁড়ায় না। সে অধিকাংশ স্টেশন টপকে গন্তব্যের দিকে দৌড়য়। সে খেয়াল করে না, কার কী মনে হয়। জীবনে দূরে যেতে হলে বারবার থামলে হয় না। লোকাল ট্রেন হয়ে থাকলে, ইন্ডিয়া কাপ আসবে?'

চোখে জল এসে গিয়েছিল রুহানের। ও তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'ওঃ, লঙ্কা এত ঝাল যে, চোখে জল চলে এল।'

জগুদা হেসে বলেছিল, 'লঙ্কা? আমি বারণ করেছিলাম, তাই দেয়নি। কান্না খারাপ নয়, তবে না আসতে দেওয়াই ভাল। ক্যাকটাসের জলের দরকার হয় না। যত রগড়ানি খাবি, বলের বিষ তত বাড়বে। বুঝেছিস?'

এতগুলো বছর তো বুঝেইছিল রুহান। কিন্তু তাতে হলটা কী? সত্যি কী হল? সব যেন কেমন গুলিয়ে ঘেঁটে গেছে রুহানের। নন্দা, মা, খেলা। সব কিছুতেই এত মার খাচ্ছে যে, কী বলবে? আর কিছু বলতে ইচ্ছে করে না ওর। ভাবতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু জীবন এমন হয়ে গেছে যে, ভাবতেই হয়।

গত দু'দিন আগে হঠাৎ আবেশ এসেছিল বাড়িতে। একদম আচমকা এসেছিল। অবশ্য ও এমনভাবেই আসে। আবার হঠাৎ হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়। এমন ছেলে কোনওদিন দেখেনি রুহান। পয়সার জন্য যেন সব করতে পারে আবেশ।

বহু দিন পর আবেশকে দেখে একটু অবাকই হয়েছিল রুহান। জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী রে তুই? এতদিন পর? ছিলি কোথায়?'

আবেশ হেসেছিল, 'দরজায় দাঁড়িয়েই তিনটে প্রশ্নের উত্তর শুনবি?'

'আয়, আয়।' রুহান ডেকে নিয়ে গিয়ে আবেশকে নিজের ঘরে বসিয়েছিল।

আবেশ চোখ ঘুরিয়ে ঘরটা দেখছিল ভাল করে। লাল মেঝে। তবে মাঝে মাঝে খোশটা উঠে গেছে। দেওয়ালটার চুনকামে এখন সেঁকা পাউরুটির মতো রং ধরেছে। তাতেও ভিভ রিচার্ডস আর ম্যালকম মার্শালের প্রায় জ্বলে যাওয়া পোস্টার। সেগুন কাঠের খাট। যদিও কালো হয়ে গিয়েছে। একটা গদার মতো দেখতে পাখা আর টেবিল চেয়ার। আর টেবিলের তলায় ক্রিকেটের কিট। এইসব সামান্য তুচ্ছ জিনিসপত্রগুলো খুব মন দিয়ে সময় নিয়ে দেখছিল আবেশ।

অবাক হওয়ার সঙ্গে বিরক্তিও লাগছিল রুহানের। ফাটা জামা পরা মানুষকে যদি কেউ খুঁটিয়ে দেখে তার কি বিরক্তি লাগবে না? ও বলেছিল, 'কী রে শালা, অমন করে কী দেখছিস!'

আবেশ হিঃ হিঃ করে হেসেছিল খুব। বলেছিল, 'দেখছিলাম যে, ধোনির বাড়ির সঙ্গে তোরটার কতটা মিল!'

'মারব শালা লাথ,' রুহান ঠোঁট কামড়ে বলেছিল, 'তোর মাথা খারাপ?'

'না রে, তোর খারাপ। ভালই তো খেলতিস! তা এমন ক্যালানে হয়ে গেলি কেন? আর ওই টুকটাক যে ম্যাজিক দেখাতিস, তা কি দেখাস? না সেটাও গেছে?'

রুহান মাথা নিচু করে নিয়েছিল। ম্যাজিক দেখাত বটে রুহান। কিন্তু সে তো সামান্য শখ। আবেশের মনে আছে সেটা!

আবেশ হেসে ওর বিছানায় আধশোয়া হয়ে বলেছিল, 'তোদের ওই জগু মাস্টার শালা হেভি খিটকেল, তোর পেছনে দিয়ে নিজে লোকাল টুর্নামেন্টে টাকা প্যাঁদাচ্ছে।'

'মানে?' সোজা হয়ে বসেছিল রুহান। আবেশ কী বলছে? অবশ্য আবেশ সবসময় এমন ভুলভাল কথাই বলে, ওর কথাকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়ার কোনও মানে হয় না।

আবেশ আর রুহান সেই স্কুলজীবনের বন্ধু। একসঙ্গে সব ক্রিকেট খেলত ওরা। তখন আর একজন, ওদের চেয়ে সামান্য জুনিয়র, তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আদিত্য। আদি। যদিও আদিকে অনেকদিন দেখে না ও। শুনেছে এখন ভাল চাকরি করে। ব্যস ওইটুকুই।

আর আদির সূত্রে ওদের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে যেত রুহান। তখন কী করে যেন আদির জ্যাঠতুতো দাদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। ক্রমশ সেটা বাড়তে বাড়তে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আর আদির সঙ্গে সেই শুরু হয় দূরত্ব। বা বলা যায়, আদি যেন নিজেই ক্রমশ সরিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। কেন, রুহান জানে না। তবে কিগানের সঙ্গে দেখা হওয়াটা দারুণ ব্যাপার ছিল ওর কাছে। এখনও আছে। শুধু হঠাৎ কী যে হল মধ্যে থেকে!

আজও কিগানকে প্রথম দেখার দিনটা স্পষ্ট মনে আছে ওর।

শীতকাল ছিল সেটা। সকালবেলা আবেশ আর রুহান একরকম হামলা চালিয়েছিল আদিদের বাড়ি। বা আরও সঠিকভাবে বললে আদির ঠাকুরমার কাছে। আদির ঠাকুরমা ছিল অদ্ভুত মানুষ। যেমন সুন্দরী, তেমন পার্সোনালিটি। রান্নাবান্না, সেলাই, কথাবার্তা, সবেতেই দারুণ।

একদিন এই কথাটা এমন করেই বলেছিল রুহান। তাতে ঠাকুরমা বলেছিল, 'এমন করে বলছিস যেন আবার আমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছিস। এই এত কিছু যা বলছিস সেই পারাগুলো বেঁচে থাকার মধ্যেই পড়ে। তার বেশি কিছু নয়, বুঝলি?'

না, ঠিক বোঝেনি রুহান। ও এমন কথাবার্তা কোনওদিনই ঠিক বোঝে না। মানুষ মাঝে মাঝে বাংলা ভাষাতে কথা বললেও ঠিক বাংলা মানেতে বলে না। কিন্তু রুহান একটা জিনিস বোঝে, যাতে নিজের ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না, তা মেনে নিতে কোনও সমস্যা তৈরি করতে নেই।

আবেশ আর ওর সেই সময় রোববারগুলোর টার্গেট থাকত আদির বাড়িতে গিয়ে ওর ঠাকুরমার হাতের ঘিয়ে ভাজা লুচি আর কালোজিরে দিয়ে আলুর সাদা তরকারি খাওয়া। প্রথম দিন যেদিন গিয়েছিল সেদিনই খেয়েছিল। তার পরে আরও চারদিন খেয়েছিল। এর দু'সপ্তাহ পরে আবেশের প্ররোচনায় আবার হানা দিয়েছিল আদিদের বাড়িতে। মানে ঠাকুরমার কাছে।

সেদিন গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল রুহান। লুচি আর সাদা তরকারির সঙ্গে, চাকা চাকা বেগুনভাজা, কড়াপাকের সন্দেশ আর রাবড়িও রয়েছে।

আবেশ আনন্দের সঙ্গে প্রায় চিৎকার করে বলেছিল, 'আরেব্বাস, এত কিছু!'

'আমার নাতির জন্য।' ঠাকুরমা মুখ টিপে হেসেছিল।

'কে, আদি? কেন আদির আজ জন্মদিন?'

'না আদির জন্য নয়, এ আমার বড় নাতির জন্য। বাইরে গিয়েছিল। আজ এসেছে। আসবে একটু পরে। তখন দেখবি। একেবারে রাজপুত্র।'

তা সেই শীতের সকালে প্রথম রাজদর্শন হয়েছিল রুহানের।

এখন কোথায় কিগান? কত মাস হয়ে গেল দেখা নেই! কথা নেই! তখন মোবাইল ছিল না। কথা বলতে পারেনি। কিন্তু এখন তো পারে রুহান। তবে বলে না কেন? লজ্জা? কার লজ্জা? যা হয়েছে তা সত্যিই কি কিগানের জন্য হয়েছে? সবাই তো তাই বলে। শুধু আদি? আদি কী বলে?

'কী রে শালা, এবার মাটি থেকে উঠে-টুঠে যাবি নাকি সমাধি অবস্থায়?' একটা ছোট্ট বালিশ নিয়ে আধশোয়া অবস্থাতেই আবেশ ছুড়ে মেরেছিল রুহানের দিকে।

রুহান বালিশটা ধরে কোলের কাছে নিয়ে রেখে বসেছিল। তারপর বলেছিল, 'বল, কেন এসেছিস?'

'মার্চেন্ট মাল্টিপল্‌স লিমিটেড-এর নাম শুনেছিস?' আবেশ দরজার দিকে তাকিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই বের করেছিল।

'আরে মা আছে বাড়িতে।' প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রুহান উঠে দাঁড়িয়েছিল।

'তো, দরজা বন্ধ করে দে। মাইরি, মায়ের কত বাধ্য! শালা, তুই সেই স্কুললাইফ থেকেই ঢ্যামনা রয়ে গেলি। ঘোমটার তলায় খ্যামটা নেচেই বয়স বাড়ল তোর। আমার মুখ খোলাস না। জিওগ্রাফির মিসেস বড়ুয়াকে লাগানোর সময় মায়ের 'নো অবজেকশন' নিয়েছিলি? আবার তার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছিস? আমায় সিগারেট দেখাচ্ছে!'

'চুপ কর। প্লিজ চুপ কর।' রুহান দৌড়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

'শালা, মিসেস রবিনসনের কেস। তুই মাইরি আর ফালতু চো...'

'চুপ কর না।' রুহান এবার বালিশটা পালটা ছুড়ে মেরেছিল আবেশকে। তারপর বলেছিল, 'কী জন্য এসেছিস, বল।'

'তার চেষ্টাই তো করছিলাম। তুই এমন করলি যেন বাড়িতে বসে অ্যাটম বোমে আগুন লাগাচ্ছি!' মুখ দিয়ে একটা বিরক্তির শব্দ করে সিগারেট ধরিয়ে শুরু করেছিল আবেশ, 'আদির সঙ্গে দেখা করতে ওদের অফিসে গিয়েছিলাম। তাছাড়া মিজোরাম থেকে এসে কাজেরও দরকার ছিল। তাই...'

'দাঁড়া, দাঁড়া,' অবাক হয়েছিল রুহান, 'মিজোরাম? সেখানে কী করছিলি?'

'কুকুর ধরছিলাম।' আবেশ ছোট্ট করে বলেছিল।

'কুকুর? মানে? কেন?'

'আচ্ছা মুশকিল! তাতে তোর কী? আমি কুকুর ধরি বা তিমি, তাতে তোর কিছু এসে যায়? কী বলতে এসেছি শোন।'

'ওকে, ওকে...' কৌতূহলটা অনেক কষ্টে চেপে রুহান মনঃসংযোগ করেছিল।

'শোন, মার্চেন্ট মাল্টিপল্‌স, একটা টোয়েন্টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট করতে চলেছে। ছ'টা টিম তৈরি করে তাদের মধ্যে লিগ সিস্টেমে খেলাবে। সেখান থেকে প্রথম চারজনকে নিয়ে সেমিফাইনাল, তারপর ফাইনাল।'

'তা, তুই এর মধ্যে এলি কীভাবে?'

'আরে, আমি আদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ওর অফিসে। আদিকে ওর বস কথাটা বলছিল আদির কিউবিকলের সামনে দাঁড়িয়ে। লোকটার নাম গৌর রওশন দিওয়ান। খুব চালাক-চতুর। আর অদ্ভুত ফ্রেন্ডলি। কে বলবে পুরো এই ইস্টার্ন জোনটার মাথা? কোনও ঘ্যাম নেই। তা, আদিকে বলল যে, ওদের ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়ানোর জন্য মুম্বইয়ের একজন নায়ককে ওরা কনট্র্যাক্ট করছে বিজ্ঞাপনের জন্য। সঙ্গে এখন যেটা বাজারে চলছে, টি-টোয়েন্টি, তাই অ্যারেঞ্জ করতে চায়। সেই নিয়ে একটা রিপোর্ট আদিকে দিয়েছে। তখন আদি আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল যে, আমি ভাল খেলতাম। কলেজ খেলেছি। সেকেন্ড ডিভিশন খেলেছি। তখন গৌর আদিকে বলল, তাহলে আমায় গোটা প্ল্যানটার সঙ্গে যোগ করে নিতে। তো, সেই নিয়ে আমি কাজ করছি।'

'আরেব্বাস, চাকরি। এভাবে পেয়ে গেলি?' অবাক হয়েছিল রুহান।

'ইল্লি আর কী? চাকরি নয়, কাজটা করতে হবে। ব্যস। কী টাকাপয়সা পাব জানি না। আদি বলেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে। তাই গিয়েছিলাম। আর গিয়ে এটা জুটে গেল।' আবেশ সিগারেটটা শেষ করে, ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিতে গিয়ে ফেলে দিয়ে আবার এসে বসেছিল।

'সে কী রে! কাজ করবি, টাকার কথা জানিস না!' খুব অবাক হয়েছিল রুহান।

'সবসময় টাকাটা দেখতে নেই। এমনিও কাজ করতে হয়, বুঝলি?'

'অ্যাঁ?' রুহান ভুরু তুলেছিল, 'শালা, এ যে, ভূতের মুখে রামনাম। নিশ্চয় কিছু পুল তোর আছে এর ভেতর। নেই?'

'শোন, ওদের চারিদিকে নানা কাজকর্ম হয়। এই টুর্নামেন্টটা ভাল করে উতরে দিতে পারলে অন্যরকম একটা হিল্লে হয়ে যাবে আমার। বুঝলি?' আবেশ হেসেছিল।

'তা আমি কী করব? আমার কাছে কেন এসেছিস?'

'সেটাই তো বলছি। শোন, নর্থ, সাউথ, ইস্ট আর ওয়েস্ট কলকাতা থেকে চারটে টিম, সঙ্গে নর্থ চব্বিশ পরগনা আর সাউথ চব্বিশ পরগনা থেকে একটা করে মোট ছ'টা টিম করতে হবে। সাউথ কলকাতা থেকে যে-টিমটা হবে তাতে তুই থাকবি।'

'আমি? হঠাৎ?'

'মনে হল তোর কথা। বলটা খুব ভাল করতিস তুই। একবার কলেজের একটা ম্যাচে মনে আছে কীভাবে ছ' উইকেট নিয়েছিলি? তা, পারবি না খেলতে?'

'পারব। কিন্তু সেই ফর্ম নেই রে আর! ভাল পারি না। কী হয়েছে কে জানে! কিন্তু সত্যি এখন মার খাই খুব। স্টার-এও ফার্স্ট টিমে নেই। আর চান্সও পাব না। আমায় বাছলে তোর বদনাম হয়ে যাবে। ভাল করে ভেবে দেখ।'

'শালা, বড্ড বাজে কথা বলিস।' আবেশ বিছানা থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল ওর সামনে, 'কী হয়েছে তোর রুহান? এমন গোঁত্তা খেয়ে আছিস কেন? সবসময় 'হবে না', 'পারব না'। এমন করছিস কেন?'

'না, মানে, জগুদা জানলে রাগ করবে।'

খেঁকিয়ে উঠেছিল আবেশ, 'তোদের সাউথের ক্লাবটাকে কোচ করবে জগুদা। সুখেনদা না কে একজন আছেন তোদের ক্লাবে। সে মার্চেন্ট মাল্টিপল্‌সের কনসালটেন্ট। খবর শুনে ও-ই নিজের থেকে লিস্ট ধরিয়েছে আদির হাতে। শালা, স্টারের কর্মকর্তা তো তাই তার চোদ্দো গুষ্টির প্লেয়ার আর কোচদের এনে ঢোকাচ্ছে সব টিমে। বটুক নামে তোদের বেস্ট ব্যাট্‌সম্যানটাকে নর্থের টিমে পুরেছে। সুখেনদাই তোর নাম দিয়েছে। জগু মালটা তেন্ডাই-মেন্ডাই করছিল, কিন্তু ধোপে টেকেনি। শালা নিজে কামাবে, কিন্তু তোকে কামাতে দেবে না। গান্ডু!'

'ওভাবে বলিস না। জগুদা আমার ভাল চায়।' রুহান নিচু গলায় বলেছিল।

'সেই জন্য টিমে নেয় না! রোজগারের জায়গায় কাঠি করে! তুই শালা মানুষ হবি না। কী করে যে, মিসেস বড়ুয়াকে তুই...'

'আঃ, চুপ কর না!' রুহান যেন জোর পাচ্ছিল না গলায়।

'শোন, পার ম্যাচ দশ হাজার পাবি। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলে পনেরো এক্সট্রা। চ্যাম্পিয়ন হলে কুড়ি লাখ টাকা প্রাইজ মানির ফাইভ পারসেন্ট। নেমে পড়। ফালতু মটকা গরম করিস না। নেক্সট সোমবার চলে আসবি এই ঠিকানায়। কনট্র্যাক্ট সই করে যাবি। আর এই নিয়ে একদম ঝোলাবি না।' আবেশ একটা কার্ড দিয়েছিল ওকে।

আবেশ চলে যাওয়ার পর রুহান মাথা নিচু করে বসেছিল। কোথায় ছিল আবেশ এতদিন? হঠাৎ কোত্থেকে এসে এমন একটা প্রস্তাব দিয়ে গেল! মার্চেন্ট মাল্টিপল্‌সের নাম ও শুনেছে। খুব বড় কোম্পানি। অনেক কিছু

বানায়। এদের টুর্নামেন্ট তো বড়ই হবে।

পরের সোমবার কনট্র্যাক্ট সই করে প্রথম ম্যাচের আগাম হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছিল। ভালই লেগেছিল। তবে জগুদা ওখানে বসে থাকলেও একদম কথা বলেনি। এমনকী গত দু'দিন সকালের প্র্যাকটিসেও কথা বলেনি। আজ গেলে খেলাবে কিনা কে জানে। পায়ের চোটটা নেই আর। তবু জগুদা প্র্যাকটিস ম্যাচেও চান্স দেয় না।

নভেম্বরের প্রথম। তবুও গরম আছে বেশ। এই দুপুর দুটোয় সূর্যর যা মেজাজ তাতে মানুষ গলে যেতে পারে। নন্দা বলত, 'আমার একদম গরম পোষায় না। বিয়ের পর শোওয়ার ঘরে এসি লাগাবে তো?'

বিয়ের পর! আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন মুখটা তেতো হয়ে গেল রুহানের। এই অঞ্চলে প্রচুর বিয়ের কার্ডের দোকান। আজ বন্ধ, কিন্তু তবু তাদের হোর্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে। নন্দা ওকে বিয়ের কথা বলত বারবার। ভালবাসত, খুব ভালবাসত মেয়েটা ওকে। ও-ও তো বাসত। কিন্তু টাকাপয়সার ব্যাপারে এমন খচখচ করত, অপরাধী মনে হত নিজেকে। আর অপরাধবোধ নিয়ে কক্ষনও প্রেমের পূর্ণতা আসে না।

'আরে দাদা সরি, অনেক দেরি হয়ে গেল।' আচমকা গলার স্বরে সংবিৎ ফিরল রুহানের। লোকটা ঠিক চিনতে পেরেছে। আসলে রুহান ফোনে বলেছিল যে, আমহার্স্ট স্ট্রিট মোড়ে যে-মিষ্টির দোকান রয়েছে তার সামনে হলুদ রঙের টি-শার্ট পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। লোকটা ঠিক চিনেছে।

লোকটা পকেট থেকে একটা দশ টাকা বের করে বলল, 'নিন, মিলিয়ে নিন, আমি সেই লোক কিনা।'

অফিসে এইভাবে লোক চেনা আর টাকা লেনদেন হওয়ার প্রক্রিয়া ও গল্প যখন প্রথম শুনেছিল, খুব আশ্চর্য হয়েছিল রুহান। যেন ফুটপাথের গোয়েন্দা গল্পের প্লট। কিন্তু তারপর শুনেছিল বহু জায়গাতেই এমনভাবে কেনাকাটা, লেনদেন হয়।

অফিস থেকেই ওকে একটা কাগজে একটা নম্বর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, এই নম্বরের নোট যে দেখাবে তাকে যেন দেওয়া হয় টাকা। লোকটা নম্বর দেখানো মাত্র হাতের প্লাস্টিকে মুড়ে রাখা চোদ্দো হাজার টাকা লোকটার হাতে দিয়ে দিল রুহান। তারপর যেমন হঠাৎ করে এসেছিল লোকটা, তেমন হঠাৎ করে চলে গেল টাকা পাওয়া মাত্র।

এবার মাঠ। রুহান সময় দেখল মোবাইলে। প্রায় তিনটে বাজে। এখান থেকে বাসে করে দেশপ্রিয় পার্ক পৌঁছতে গেলে এ খেলা তো বাদ দাও, পরের খেলাও শেষ হয়ে যাবে। গা চড়চড় করছে, তবু শিয়ালদার দিকে যেতে থাকা একটা ট্যাক্সি ধরল রুহান।

রুহানের কাছে শুধু ছোট একটা ব্যাগ রয়েছে। তাতে ওর জুতো আর মোজাটা রাখা আছে। বাকি জার্সি তো টিমের কাছেই পাওয়া যাবে।

রুহান ট্যাক্সির জানলা দিয়ে শহর দেখতে দেখতে যেতে লাগল। না, টেনশন হচ্ছে না তেমন। কারণ, জগুদার যা মুড দেখেছে, তাতে ও নিশ্চিত যে, ওকে জগুদা খেলাবে না কিছুতেই। ফলে পুরো ম্যাচ খেললে দশ হাজার। আর রিজার্ভে ফুলদানির মতো বসে থাকলে পাঁচ হাজার। আর সেই পাঁচ তো কনট্র্যাক্ট সইয়ের সময়ই পেয়ে গিয়েছে। ফলে আজ ট্যাক্সি ভাড়াটা

গোটাটাই লস। জগুদার যে কী শত্রুতা ওর সঙ্গে!

দেশপ্রিয় পার্কের মাঠটা আলো, হোর্ডিং, নতুন চুনের দাগ আর ম্যাটিং উইকেট দিয়ে সাজানো হয়েছে। আর লোকজনও হয়েছে মোটামুটি।

এই ধরনের রংচঙে ক্রিকেটের একটা মজা আছে। খেলা কী হবে ঠিক নেই কিন্তু হাবভাবে একদম চকচকে মহার্ঘ হয়ে থাকে। মনে হয়, এর চেয়ে ভাল আর কিছু নেই।

ওদের টিমের নাম 'সাউদার্ন ব্রিজ'। দক্ষিণা বাতাস যে এই হেমন্তের সময় কোত্থেকে বইছে, তা বুঝতে পারল না রুহান। কারণ ট্যাক্সি থেকে নেমেই একদম বাঘের সামনে পড়ল। জগুদা!

এ ক'দিন জগুদা কথা বলেনি। কিন্তু আজ দেখামাত্র দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর নিজের থেকেই এগিয়ে এসে বলল, 'কনট্র্যাক্ট সই করেই একদম ট্যাক্সি থেকে নামছিস? পরে, ম্যাচ খেললে তো কানে দুল, গলায় হার এসবও চড়াবি!'

রুহান থতমত খেল। আমতা আমতা করে বলল, 'না জগুদা, ওই নর্থ থেকে আসছি। অফিসের কাজ ছিল। দেরি হয়ে গেছে তো!'

'দেরি নয়। অনেক কিছুই হয়েছে। চল তাড়াতাড়ি, ড্রেস করবি। তোকে দলে রাখা হয়েছে।' জগুদা আর না দাঁড়িয়ে মাঠের লোহার গেট পেরিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে।

বাকি পাঁচ হাজার! প্রথম এটাই মনে এল রুহানের। আর সঙ্গে সঙ্গে খারাপ লাগল। ইস্, টাকা আর টাকা! শুধু টাকা ছাড়া কি ও নিজে কিছু ভাবতে পারে না? ওর তো ভাবা উচিত যে, নর্থ কলকাতার টিম, 'গ্লেসিয়ার নর্থ'-এর প্রধান ব্যাট্‌সম্যান বটুককে প্রথম বলেই তুলতে হবে। তা নয়, ও ভাবছে টাকা। কোনও সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান এমন ভাবে? ও নিজে দু'বছর আগে এমন ভাবত? নিজের ওপরই নিজের বিরক্ত লাগল রুহানের।

নিজেদের টেন্টে গিয়ে ড্রেস করে এক কোনায় চুপ করে বসল রুহান। প্রতিটা ম্যাচে নামার আগে ও চুপ করে বসে একটু সময়। নিজের ভেতরের বাকি সব কিছু বের করে শুধু খেলোয়াড় মানুষটুকুকে ধরে রাখে।

কিন্তু আজ তখনই এল আবেশ। গলায় অফিশিয়ালের কার্ড আর মুখে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যস্ত লোকের বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে এসে বলল, 'আরে, সেদিন তোকে যে বললাম, প্যান দিতে। তা দিলি না তো নম্বরটা। আরে বাবা, টাকা নিবি আর নিয়ম মানবি না?'

'প্যান?' রুহান অবাক হল, 'কেন, তোকে বললাম না আমার ওসব নেই।'

'নেই? সে কী?' আবেশ এমন করে আঁতকে উঠল যেন কলকাতার থেকে হাওড়া ব্রিজ গায়েব হয়ে গিয়েছে!

'হ্যাঁ, তোকে বললাম তো। তাতে যা টাকা কাটার তা কাটবি। আমি আর কী বলব? এখন একটু কনসেন্ট্রেট করি! একটু স্পেস দে।'

আবেশ আরও কিছু বলতে গিয়েছিল কিন্তু তার আগেই একটা নরম মেয়েলি গলা আবেশকে পিছন থেকে ডাকল, 'বাদ দিন। ম্যাচের পরে যা বলার বলবেন, এখন এখানে আমাদের না থাকাই ভাল।'

গলার স্বরের ভেতরে কী ছিল ঠিক স্পষ্ট করে বলতে পারবে না রুহান কিন্তু একটা অদ্ভুত ঠান্ডা হাওয়া যেন পাক খেয়ে উঠল রুহানের ভেতরে। সাউদার্ন ব্রিজ! ও নিজের অজান্তেই ঝুঁকে পড়ে আবেশের পিছনে দাঁড়ানো অমন সুন্দর স্বরের অধীশ্বরীকে দেখল।

গোল পাহাড়ি গড়নের মুখ। সামান্য চাপা নাক। কী অদ্ভুত সুন্দর আর মিষ্টি দেখতে! গলা শুকিয়ে এল রুহানের। হাঁটুতে জোর কমে এল হঠাৎ। মনে হল, কিছু না ধরলে পড়ে যাবে এক্ষুনি। এ কে?

'ওভাবে তাকাস না।' জগুদা আজ যেন যাত্রা দলের বিবেকের পাঠ নিয়েছে। সবেতেই স্টেজে উঠে নীতিকথা ঝাড়ছে!

রুহান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সামলাল নিজেকে। বলল, 'না... মানে... ইয়ে...'

'আমি বুঝতে পারছি, কী!' জগুদা মুখটা ব্যাজার করল, 'বটুককে শর্ট বল দিবি না। ভাল পুল করে। আর অফ স্ট্যাম্প-এর বাইরে রাখতে গিয়ে ওয়াইড দিস না।'

রুহান টালুমালু চোখে তাকাল জগুদার দিকে। কী বলছে লোকটা? মাথায় ঢুকছে না কেন রুহানের?

রুহান যেন নিজের অজান্তেই বলে ফেলল, 'আচ্ছা জগুদা, ভদ্রমহিলার নাম কী?'

জগুদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, 'আজ মার খাবি। বুঝেছি, খুব মার খাবি।'

মার? সে তো সারাজীবন খেয়েছে রুহান। এখনও খায়। কিন্তু আজ এই মেয়েটার সামনে মার খাবে? এই মেয়েটার সামনে ওকে নাস্তানাবুদ করবে ব্যাট্‌সম্যান? রুহানের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। ও জগুদার দিকে তাকিয়ে, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আজ আমায় বোলিংটা ওপেন করতে দাও। তারপর দেখছি।'

জগুদা অল্প হেসে চলে যাওয়ার আগে নিজের মনেই যেন বলল, 'মালিনী সিংহ। মালিনী সিংহ নাম মেয়েটার। এর বেশি জানতে হলে পারফর্ম কর।'

রুহান দেশপ্রিয় পার্কের নেড়া হতে থাকা গাছের মাথায় বসানো সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভাবল, 'শর্ট বা ওয়াইড এবার দেব না। কিছুতেই দেব না।'

৮

গুন্ডার পাশে ছেলেটাকে মনে হচ্ছে টুথপিক। তার ওপর এমন আগোছালো জামাকাপড় পরে রয়েছে ছেলেটা যে, আরও হাস্যকর লাগছে। ছেলেটা বিশেষ কথাও বলছে না। শুধু হুঁ হাঁ করছে প্রথম থেকে।

নভেম্বরের বারো আনা হয়ে গেলেও ঠান্ডা তেমন পড়ছে না। দিঘির মনে হয় আজকাল সব কিছুই কেমন যেন উলটোপালটা হয়ে আছে। ঠিকমতো বৃষ্টি হয় না, গরমে ডিম আপনা থেকে সেদ্ধ হয়ে যায়। ঠান্ডা পড়ি পড়ি করেও ঠিক ঠান্ডাও পড়ে না। আজ থেকে দশ বছর আগেও কিন্তু এমন ছিল না। খুব বাজে লাগে দিঘির। চাপা রাগ হয়। মনে হয় কিছু একটা করে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না কী করবে! আসলে দিঘির সমস্যা এটাই। লোকে হয়তো ওকে খুব সাহসী, স্ট্রেট ফরোওয়ার্ড আর অ্যাগ্রেসিভ ভাবে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে দিঘি বোঝে ও কতটা নিস্তব্ধ, চুপচাপ, ইনট্রোভার্ট। তাই অনেক সময়ই কিছু করতে চাইলেও ঠিক পারে না। ওর গলা বুজে আসে কষ্টে। কিন্তু তবু কিছু বলতে পারে না।

আর কষ্টগুলোও খুব বেয়াড়া ধরনের। জলের মতো। কোথায় যেন পড়েছিল দিঘি যে, পৃথিবীতে সমস্ত জলই নিজেদের ভেতরে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। মানুষের মনের দুঃখগুলোও ঠিক তেমনই। সবক'টা দুঃখই যেন এ ওর ল্যাজা-মুড়ো ধরে রেখেছে। একটায় টান লাগলে সবক'টা এসে হুড়মুড়িয়ে পড়ে এ ওর ঘাড়ে।

এই যে নভেম্বরের প্রায় শেষে এসে ঠান্ডাটা পড়ল না তার জন্য যে মনখারাপটা হালকাভাবে শুরু হয়েছিল সেটা ক্রমশ এ-গলি ও-গলি দিয়ে এসে পড়ল রাজপথে। এই শেষ বিকেলের আলোয় কলেজ স্কোয়ারের জলের পাড়ে বসে আচমকাই যেন জীবনটা ফিরে গেল তিন বছর আগে এক পুজোর সকালে। কেন এমন হল? একটা বিকেল কী করে মনে করায় সকালকে? মানুষের চিন্তার পদ্ধতিটা কী? মনের পদ্ধতিটাই বা কী? দিঘি বোঝে না। যেন খানিক বুঝতেও চায় না। ওর শুধু মনে পড়ে সেই সকালটুকু।

তখন সবে সুকিয়া স্ট্রিটে এসেছিল ওরা। নর্থ কলকাতার সঙ্গে আস্তে আস্তে পরিচয় হচ্ছিল দিঘির। সব যে ভাল লাগছিল তা নয়, কিন্তু তবু একটা অন্যরকমের স্বাদ পাচ্ছিল ও। দেখছিল এখানে এখনও অনেক পুরনো বাড়িঘর থেকে গিয়েছে। জাফরি-আঁটা ছাদ থেকে গিয়েছে। শ্বেতপাথরের টেবিল আর কালো কাঠের চেয়ারওয়ালা কেবিন থেকে গিয়েছে। থেকে গিয়েছে করি বরগার বাড়ি, লম্বা সিঁড়ি, জট পাকানো ইলেকট্রিকের তারের মিটার ঘর। এর মাঝে মাঝে কাচের কনফেকশনারি, মোবাইলের দোকান, অটোমেটিক সিগন্যালও এসে গিয়েছে। দিঘি দেখেছিল গুরুচণ্ডালি দোষের একটা শহর ক্রমশ যেন বদলে দিচ্ছে, মানিয়ে নিচ্ছে তার নিজের বেঁচে থাকার ব্যাকরণ।

অষ্টমীর পুজো ছিল সেদিন। বাদুড়বাগানের প্যান্ডেলে অঞ্জলি দিয়ে মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরেছিল দিঘি। মা বলেছিল, 'চল, পাশের বাড়ির মাসিমাকে গিয়ে প্রণাম করে আসি। তুই তো ঠিকমতো কাউকে চিনলিই না এ পাড়ায়।'

আসলে সুকিয়া স্ট্রিটের এই বাড়িটা মা পেয়েছিল উত্তরাধিকার সূত্রে। এটা দিঘিদের মামারবাড়ি ছিল। দিঘির দাদু-দিদিমা না থাকলেও, মামা ছিল এক। কিন্তু সে বিয়ে করেনি। এত বড় বাড়িটায় মামা একা থাকত। অবশ্য ঠিক একা নয়। মহুল এসে মাঝে মাঝে থাকত মামার সঙ্গে। ফলে মহুলের সঙ্গে এ পাড়ার সবার পরিচয় ছিল। কিন্তু মামা আচমকা মারা যাওয়ার পর ওরা যখন দক্ষিণ কলকাতা থেকে এখানে এসে উঠল, দিঘি যেন নতুন এক পৃথিবীতে এসে পড়েছিল। মা নিশ্চয়ই বুঝেছিল দিঘির মনের অবস্থা। তাই দিঘিকে নিয়ে মাঝে মাঝেই এ-বাড়ি ও-বাড়ি গিয়ে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিত। মায়ের ছোটবেলার জায়গা যে। মাকে যে সবাই চেনে এখানে।

সেদিন বাড়িতে পায়েস করেছিল মা। সঙ্গে আলুর দম আর লুচি। তাই থালায় সাজিয়ে নিয়ে মায়ের সঙ্গে পাশের বাড়ির ঠাকুরমার কাছে গিয়েছিল। মা যাওয়ার আগে দিঘিকে বলেছিল, 'আমি মাসিমা বললেও তুই ঠাকুরমা বলবি। হৈম মাসিমা এক আশ্চর্য মহিলা। চল, তোর ভাল লাগবে।'

সুন্দরী দিঘি বহু দেখেছে। কিন্তু আশি বছর বয়সেও যে, কোনও মানুষ এতটা সুন্দরী থাকতে পারে তা ঠাকুরমাকে না দেখলে বুঝতেই পারত না দিঘি।

সোনার গোল ফ্রেমের চশমা পরে, ঠাকুরমা একটা বই পড়ছিলেন। মাকে দেখে বই রেখে খাট থেকে নেমে এসেছিলেন বৃদ্ধা, 'আরে মম, তুই?'

মা থালাটা দেখিয়ে হেসে বলেছিল, 'বলছি, আগে এটা কোথায় রাখব বলো তো?'

ঠাকুরমা বলেছিলেন, 'কী এনেছিস আবার পাকামি করে?'

'ওই সামান্য লুচি-আলুর দম আছে।'

'ও,' হেসেছিল ঠাকুরমা, 'দাঁড়া,' বলে, 'খুশি, খুশি,' ডাক দিয়েছিলেন।

মধ্যবয়স্কা একজন কাজের মহিলা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

ঠাকুরমা বলেছিল, 'হাতের থালাটা নিয়ে গিয়ে খাবার টেবিলে রাখ। আর দা'ভাই কই?'

খুশি বলেছিল, 'নিজের ঘরে আছে। ক্যামেরাটা ভেঙে কীসব করছে।'

'ক্যামেরা ভেঙে?' ঠাকুরমা ভুরু কুঁচকেছিলেন এক মুহূর্তের জন্য। তারপর হেসে বলেছিলেন, 'ও লেন্স পরিষ্কার করছে। যা তো, বল আমি ডাকছি।'

'কাকে ডাকলে গো?' মা জিজ্ঞেস করেছিল।

'কেন, বুঝতে পারছিস না? অর্কর ছেলে, কিগান।'

'ও,' মায়ের যেন মনে পড়ে গিয়েছিল সব, 'তাই তো! দেখো দেখি, আমিও বোকা, সব কেমন যেন ভুলে যাই আজকাল। থাইরয়েডের জন্যই কি? তা, কই ও?'

ঠাকুরমা কিছু বলার আগেই স্বরটা শুনেছিল দিঘি। দরজার বাইরে থেকে নরম একটা স্বর বলেছিল, 'ডাকছিলে ঠাকুরমা?'

মায়ের সঙ্গে দিঘিও ঘুরে তাকিয়েছিল। আর তাকে দেখেছিল প্রথম। বারান্দা দিয়ে আসা কাচের মতো রোদ এসে পড়েছিল দরজার কাছে। আর সেই রোদের চৌখুপির মাঝে দাঁড়িয়েছিল সে। লম্বা, দোহারা চেহারা। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। কোঁকড়া এলোমেলো চুল আর দুটো অদ্ভুত নীল রঙের চোখ।

কোথায় এসে দাঁড়িয়েছিল কিগান? ওই রোদের চৌকোর মাঝখানে? না, দিঘির মনের মাঝখানে? টলমল করে উঠেছিল দিঘির মন। বাঙালিদের এমন নীল চোখ হয়!

ঠাকুরমা আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ওদের সঙ্গে। মা কিগানের গাল টিপে, চুল ঘেঁটে আদর করে দিয়েছিল। কথাও বলেছিল কীসব। কিন্তু দিঘির কিচ্ছু কানে ঢোকেনি। ও শুধু দেখছিল কিগানকে। আর ওর বুকের ভেতর একটা গোটা দিঘি টলমল করছিল যেন।

সেই শুরু, তারপর, দিঘি প্রায় রোজই যেত ঠাকুরমার কাছে। ঠাকুরমার কাছে? দিঘি অন্তত তাই বলত মাকে। মাঝে মাঝে অবশ্য কিগানের কথাও বলত। বলত অঙ্ক বা বিজ্ঞানের কোনও কিছু বুঝে নিতে চায় ও কিগানের থেকে। দিঘি বলত, 'কিগানদা এত ভাল বোঝায় না!'

দিঘি মাকে বোঝাত। নিজেকেও। কিন্তু সব কিছুর তলায় তলায় একটা অবুঝ কাঠবেড়ালি নেচে বেড়াত। সে তার বাদাম খুঁজে বেড়াত। তারপর কোত্থেকে যে কী হল! পুজো শেষ হয়ে, ক্রিসমাস ছুঁয়ে, সরস্বতী পুজো

টপকে সময় এসে দাঁড়াল দোলের দিনে। আর সেই দিনের থেকেই কীভাবে যেন পালটে গেল দিঘির বেঁচে থাকা।

'কী রে, তখন থেকে দেখছি চুপ মেরে আছিস। কী হয়েছে তোর?' কংক্রিটের বেঞ্চটাতে একটা থাপ্পড় মেরে বলল গুন্ডা।

সামান্য চমকে উঠলেও পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল দিঘি। বলল, 'না, মানে ভাবলাম যে নভেম্বর শেষ হতে চলল, কিন্তু দেখ, ঠান্ডার নামগন্ধ নেই। ক্লাইমেটের যে কী অবস্থা হয়েছে না! খুব খারাপ সময় আসছে।'

'আসছে?' রোগা ছেলেটা এতক্ষণে প্রথম স্পষ্ট ভাষায় কিছু বলল।

দিঘির সঙ্গে স্নেহা, রূপ আর জয়ও তাকাল ছেলেটার দিকে।

গুন্ডা বলল, 'যাক ত্রয়ণদা, তুমি যে কথা বলতে পারো তা সবাই অন্তত বুঝতে পারল।'

ত্রয়ণ বাঁ হাতের স্টিল ব্যান্ডের সস্তার ঘড়িটা ঠিক করে নিয়ে বলল, 'তোমাদের তাহলে সত্যি মনে হয় যে, খারাপ সময় আসছে। এখনও আসেনি!'

'না, মানে...' জয় চিরকাল সব বিষয়েই কিছু না-কিছু বলতে চায়। কিন্তু কিছুতেই কোনও কথা শেষ করতে পারে না।

'কী, মানে?' ত্রয়ণ জয়ের দিকে তাকাল প্রথমে, তারপর সবার দিকে ঘুরে ঘুরে এসে থামল দিঘির কাছে। বলল, 'আর কত খারাপ সময় আসবে বলে মনে হয় তোমার? তোমাদের কলেজের ভোট সামনে। এই গুন্ডা তোমাদের ক্লাস রিপ্রেজেন্ট করে। ওর কথায় জাস্ট তোমাদের কলেজে ঘুরে গেলাম। ক্যাম্পেনিং দেখলাম। কথা শুনলাম। বুঝলাম যে, কিছুদিনের মধ্যে বোধহয় মারামারিও হয়ে যাবে একচোট। তারপর ভোটে একটা দল জিতবে। ক্ষমতা পেয়ে যাবে। কিন্তু তাতে কি কলেজটার কিছুমাত্র অদল-বদল হবে? পাতি কথায়, উন্নতি হবে কিছু?'

গুন্ডা বলল, 'কেন হবে না? নিশ্চয়ই হবে। ছাত্রশক্তি, শুভ বুদ্ধি আর পরিশ্রমের ত্রিপাক্ষিক মেলবন্ধন ঘটাতে পারলে উন্নতি আসতে বাধ্য।'

'চুপ কর।' ত্রয়ণ ধমক দিল, 'এমন জানলে কলকাতার কাজ সেরে ফিরে যেতাম বাড়িতে। তোর কথামতো এখানে আসতাম না।'

'কেন, কী ভুল বললাম?' গুন্ডা দূরে একটা বাদামওয়ালাকে হাত দিয়ে ডেকে ত্রয়ণকে প্রশ্ন করল।

ত্রয়ণ আবার সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানে তিনটে দল কনটেস্ট করবে। আজ তিনজনেই এজেন্ডা, অবজেক্টিভ, ভিশন ইত্যাদি নিয়ে গালভরা সব ভাষণ দিল। কিন্তু তাতে নতুন কিছু বলল কি? যে যার পার্টির দাদা-কাকাদের বুলিগুলো গড়গড় করে বলে দিল। বক্তৃতা জুড়ে শুধু পার্টি হেড কোয়ার্টারের ইস্তেহারগুলো কে কত ভাল মুখস্থ করেছে তার পরীক্ষা যেন! যখন সব শিয়াল এক স্বরে ডাকে তখন বুঝতে হবে অবস্থা খারাপ হতে বাকি নেই কিছু। শোন, যে-রাজনীতিতে এত রিজিডিটি চলে আসে, সেটা ব্রেনওয়াশের যন্ত্র হয়ে যায়। আর বরফির মগজ প্রক্ষালন যন্ত্রের ফলে কী হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই তোমাদের আলাদা করে বলে দিতে হবে না। স্টুডেন্টদের তো কাজ, সিস্টেমকে প্রশ্ন করা। পুরনো ভুলগুলো শোধরানো। তা না করে তোমরা কী করছ? মান্ধাতার আমলের কয়েকজন নেতার ইগোসমৃদ্ধ, একগুঁয়ে কিছু বুলি আউড়ে চলেছ, আর অন্য পার্টি ক'টা খুন করল, ক'টা রেপ করল, সেই হিসেব দিয়ে নিজেদের ভুলগুলো জাস্টিফাই করার চেষ্টা করছ। আর বলছ খারাপ সময় আসছে? ওয়েকআপ বাডি। খারাপ সময় চলছে এখন। ছাত্র রাজনীতি হল যাত্রপালার বিবেকের মতো। দ্য ভয়েস অব দ্য সোল। কিন্তু সেই বিবেক যখন ক্ষমতার ওকালতি করে জানবে এমন দুঃসময় আর নেই!'

জয় বলল, 'কিন্তু মূল্যহীন বলছেন কেন? আমাদের এই ইয়ে মানে...চেষ্টা আর ভোট...মানে আমি বলছি যে...'

'চুপ কর,' গুন্ডা ধমক দিল, 'সব বিষয়ে শুধু লাফিয়েই পড়ে, কিছুই বলতে পারে না। তবু কথা বলা চাই। না?' তারপর ত্রয়ণকে বলল, 'তুমিও তো সক্রিয় রাজনীতি করো। এখানে বসে যা বলছ তা তোমাদের ওই উত্তর চব্বিশ পরগনার কেষ্টবিষ্টুদের সামনে বলতে পারবে?'

ত্রয়ণ হাসল, 'বলি তো। আমি তো বলিই। বারাসতে একটা হাউজিং নিয়ে দীর্ঘদিন ঝামেলা চলছে। যে-গ্রুপ প্রোমোটিং করছে তারা তো টাকাপয়সা দিয়ে প্রায় ম্যানেজ করে ফেলেছিল সব নেতানেত্রীকে। ভেবেছিল তাতে হয়তো পার্কের জন্য জায়গাটা না ছাড়লেও চলবে। কিন্তু আমি তো তা হতে দিইনি। লোকাল মানুষকে বুঝিয়েছি। ব্যস, ক্রাউড আমার সঙ্গে। তারাও নাছোড় হয়ে গেছে। অবস্থা খারাপ বুঝে নেতানেত্রীরাও ডিগবাজি খেয়ে এখন আমাদের দাবি সমর্থন করছে। আরে বাবা পাবলিকের বিরুদ্ধে কে যাবে? তাছাড়া চাপাডাঙাতে একটা গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। সেখানেও বারাসতের পার্টিটাই মিনারেল ওয়াটার প্লাস জুসের ফ্যাক্টরি খুলতে চায়, কিন্তু সেটা জমি দখল করে। একটা গণ্ডগোল হবে। আমি দেখব যাতে জমির গায়ে আঁচড় না পড়ে।'

দিঘির মাথা বোঁ-বোঁ করছে। কী কথা থেকে টেনে নিয়ে কত কথা বলে গেল ছেলেটা! বাব্বা, সারাটা সময় চুপ করে থাকাটা যেন উশুল করে নিল। দিঘিও মানুষের জন্য কিছু একটা করতে চায়, কিন্তু রাজনীতির জার্সি চাপিয়ে নয়। আসলে রাজনীতিটা কোনওদিনই বোঝে না দিঘি। আর সত্যি কথা বলতে কী, বুঝতেও চায় না। নেহাত গুন্ডা ওদের বন্ধু তাই ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এই ত্রয়ণ যে এত কিছু বলে দেবে এটা জানলে তেমন কিছু বলতই না দিঘি। এরকম আর্ট ফিল্মের হিরো মার্কা, গায়ে সস্তা সিগারেটের গন্ধওয়ালা ছেলেদের চিরকাল অসহ্য লাগে দিঘির। তবে, কী আর করবে! উঠে চলে যাওয়াটা বড্ড মোটা দাগের হয়ে যাবে। তার ওপর গুন্ডার কাজিন হোমিদির চেনাশুনো এই ত্রয়ণ। ফলে গুন্ডার জন্যই খানিকটা সহ্য করছে ছেলেটাকে।

দিঘি দেখল স্নেহা বড় বড় চোখ করে কথাগুলো শুনলেও, রূপ একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে, পাত্তা দিচ্ছে না। দিঘি ভাবল দিদি এসে পড়লে ও বেঁচে যায়।

ত্রয়ণের কথার ফাঁকেই বাদামওয়ালার থেকে বাদাম কেনা হয়েছিল। সবাই খেয়ে নিলেও রূপ ধরেইনি প্যাকেটটা। গুন্ডা সেটা তুলে নিয়ে বলল, 'যাই বলো ত্রয়ণদা, পার্টির যারা মাথা, তাদের কথা শুনব না?'

'শুনবি না কেন? কিন্তু শুনলেই কি মানতে হবে? কেউ মাথার দিব্যি দিয়েছে? প্রশ্ন করবি না পালটা? বাজিয়ে দেখবি না যা বলছে ঠিক বলছে কি না! জানবি, ছাত্র রাজনীতি হল সমাজের ল্যাবরেটরি।'

জয় বলল, 'তা ঠিক। তবে শুধু রাজনীতি করেই ইয়ে...মানে কাজ করতে ইয়ে...দরকার কী রাজনীতি? মানে আমি বলতে চাইছি যে...'

'বুঝেছি,' ত্রয়ণ আবার ঢিলে ঘড়িটা ঠিক করল, 'না, মানুষের জন্য কাজ করতে গেলে রাজনীতির দরকার নেই। তোমরা যদি চাও, এমনিও করতে পারো। তবে তার জন্য কনভিকশন লাগবে। দেখবে রাজনীতির লোকজন সেখানেও খোঁচা দিচ্ছে। তবে তাতে তোমাদের থামলে চলবে না।'

গুন্ডা বলল, 'হোমিদির "হেল্প আর্থ" তো এমনই একটা সংস্থা।'

'হ্যাঁ, সেখানে তোমরা এসো। এই যে, বলছিলে না, যে, গরম বাড়ছে। এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে কমানোর জন্যই তো হোমিরা কাজ করছে। ইউ পিপল ক্যান জয়েন।' ত্রয়ণ আবার ঘড়ি ঠিক করল।

'এই আমি উঠি,' রূপ আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল, 'মাথা ব্যথা করছে।'

'কেন?' স্নেহা উদ্বিগ্ন হল। স্নেহার শরীর খারাপ নিয়ে একটা ভয় কাজ করে সবসময়।

'না, কিছু নয়, এমনি।'

ত্রয়ণ হাসল, 'ইনডিফারেন্স হল বুর্জোয়াদের লক্ষণ।'

রূপ পাত্তা দিল না। গুন্ডার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার চারটে সিডি নিয়েছিলি। কবে ফেরত দিবি?'

'আরে ডিভিডি প্লেয়ারটা মা ধরতে দিচ্ছে না। আর দু'-চারদিন সময় দে, দিয়ে দেব। তুই রাগ করিস না।'

রূপ ঠোঁটের কোণে পুরনো দিনের হিন্দি ছবির ভিলেনদের মতো করে সিগারেট ঝুলিয়ে চোখ ছোট করে বলল, 'রাগ করব কেন? সময়মতো দিয়ে দিস তাহলেই হবে। আমি আসি, বাই।' রূপ ত্রয়ণের দিকে একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি দিয়ে কলেজ স্কোয়ারের ছোট গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

—

দিঘির অস্বস্তি লাগল খুব। রূপ মাঝে মাঝে এত রুড হয়ে যায় না! খুব খারাপ লাগে দিঘির: আসলে রূপ একটু পাগলাটে ধরনের। যেটা খারাপ লাগে দুম করে বলে দেয়।

রূপ চলে যাওয়াতে স্নেহাও উসখুস শুরু করল। স্নেহার অস্থির হওয়ার লক্ষণই হল শাড়ির আঁচল নিয়ে হাত দিয়ে পাট পাট করা। দিঘি আড়চোখে দেখল স্নেহা আঁচলটা নিয়ে নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছে। জয়, ত্রয়ণ আর গুন্ডা নিজেদের মধ্যে কীসব কথা বলছে এখন। দিঘি স্নেহার দিকে ঝুঁকে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে রে?'

স্নেহা বলল, 'আমাকেও যেতে হবে এবার। বাড়িতে লোকজন আসবে। দেরি হলে মা বকবে খুব! আমায় যেতেই হবে রে।'

দিঘি বলল, 'কেন?'

স্নেহা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'রূপ চলে গেল। আমিও যাই। রিধিমাটা চলে যাওয়ায় আমাদের গ্রুপটা কেমন যেন হয়ে গেছে! কে রিধিমাকে বলেছিল দিল্লি চলে যেতে?'

দিঘি হাসল, 'ও, মায়ের বকাটা তাহলে চপ?'

স্নেহা কিছু না বলে হ্যাঁ আর না-এর মাঝামাঝি মাথা নাড়াল। ত্রয়ণের থেকে মুখ ফিরিয়ে এবার দিঘিদের দিকে তাকিয়ে গুন্ডা বলল, 'শোন, ত্রয়ণদা বলল যে, সামনে "হেল্প আর্থ"-এর একটা

ডেমনস্ট্রেশন আছে। কলকাতা থেকে লোকজন গেলে গুরুত্ব আরও বাড়বে। তোরা যাবি?'

স্নেহা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যেতে হবে?'

'ওই হাবড়া অঞ্চলে।'

'সেটা কোথায়?' স্নেহা আবার প্রশ্ন করল।

'ক্যালানের মতো কথা বলিস না। ওটা নর্থ চব্বিশ পরগনায়।' গুন্ডা বিরক্ত হল এবার।

'ওরে বাবা!' স্নেহার মুখটা লাল হয়ে গেল, 'মা অত দূর যেতেই দেবে না। আমি যাব না বাবা।'

'ন্যাকা খুকি আমার।' গুন্ডা ঝাঁঝিয়ে বলল, 'তোর বিয়ের সময় কী হবে রে? বাপ-মা ঘরজামাই রাখবে?'

সবার সামনে এমন বলছে দেখে স্নেহা রেগে গেল, 'হ্যাঁ, রাখবে, তাতে তোর কী রে মোটা?'

'রাখবে!' গুন্ডা হঠাৎ অমন বিশাল শরীরটা নিয়ে ধপ করে বসে পড়ল স্নেহার পায়ের কাছে। বলল, 'তাহলে আমায় রাখতে বলবি? বাজারহাট সব করে দেব। হাত-পা টিপে দেব। তোদের সবার ব্রা-প্যান্টি-জাঙ্গিয়াও কেচে দেব। আমায় প্লিজ বিয়ে করে ঘরজামাই রাখবি? মাইরি বাড়ির সবার মুখঝামটা আর রুটি-আলুর চোখা খেতে খেতে পেটে চর পড়ে গেল। এই

স্নেহা, মাইরি আমায় বিয়ে করবি? বিদ্যা বলছি, তোর ইচ্ছে না করলে তোর সঙ্গে ইয়েও করব না।'

'মানে?' স্নেহা আঁতকে উঠল, 'ওঠ বলছি, মাটি থেকে ওঠ। এমন সিন ক্রিয়েট করছিস কেন? এমন চিপ ইয়ার্কি মারবি না।'

গুন্ডা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ত্রয়ণ আর তা বলতে দিল না। বরং গম্ভীর গলায় বলল, 'গুন্ডা তুই চুপ কর। ছ্যাবলামি করিস না। শোনো তোমরা, হাবড়া খুব একটা দূরে নয়। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে দেড় ঘণ্টার মতো। সকালে যাবে, বিকেলে চলে আসবে। কলকাতার বাইরের কথাও তো ভাবতে হবে তোমাদের। শুধু কলকাতা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত নয়। এই যে দিদি তুমি গরম কমছে না বলছিলে, আমাদের এই ডেমনস্ট্রেশনটা গাছ কাটার বিরুদ্ধে। ন্যাশনাল হাইওয়েকে চওড়া করার জন্য দু'পাশের মোটা মোটা গাছ কাটা হবে। এটা বন্ধ করা জরুরি। বহু বহু দিন ধরে তিল তিল করে ওই গাছগুলো বেড়েছে। আর কিছু দালাল টাইপের লোক, উন্নয়নের নামে দামি-দামি গাছ কেটে পকেট ভরবে, তা হতে দেওয়া যায় না! তোমরা এসো। আসল পশ্চিমবঙ্গকে সামনে থেকে দেখো। কতগুলো শপিং মল, ফ্লাইওভার আর ফাস্টফুড সেন্টার দিয়ে কিন্তু আসল পশ্চিমবঙ্গ তৈরি নয়। আসল পশ্চিমবঙ্গ আরও অনেক জটিল, কঠিন এক জায়গা। যেখানে প্রতিদিন মানুষকে রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে বেঁচে থাকতে

হয়। কলেজ স্কোয়্যারের থেকে বেরিয়ে এবার আসল পৃথিবীর সামনে দাঁড়ানোর সময় এল। বুঝেছ?'

ত্রয়ণের কথা শেষ হওয়ার পর গুন্ডা গর্ব গর্ব চোখ নিয়ে তাকাল সবার দিকে। একটু সময় দিল কথাগুলোকে ওদের মাথার ভেতরে ঘুরতে দেওয়ার। মনের ভেতর নামতে দেওয়ার। তারপর বলল, 'তো, যাবি তো তোরা?'

'কোথায় রে?' হঠাৎ পাশের ছোট গেট দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে উদয় হল আর্য, 'কোথায় যেতে হবে রে গুন্ডা?'

গুন্ডা নির্লিপ্ত মুখে আর্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সামনের মাঘে দিঘির বিয়ে। তাই সবাইকে জিজ্ঞেস করছিলাম কনেযাত্রী যাবে কিনা! তা, তুই যাবি তো আর্য?'

'কী?' আর্যর ক্লান্ত ফরসা মুখটা আরও লাল হয়ে উঠল। ও দিঘির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী বলছে ওরা? তোমার বিয়ে? আঠারো বছর বয়সে বিয়ে? মানে?'

দিঘিকে কিছু বলতে না দিয়ে গুন্ডা বলল, 'হ্যাঁ, কিগানের সঙ্গে ওর বিয়ে। আর আমরা কনেযাত্রী। তুই যাবি না?'

'কী?' আর্য ওর পিঠের ব্যাগটা একটা ঝটকায় খুলে ফেলল।

'আঃ গুন্ডা।' দিঘি ধমক দিল এবার। গুন্ডার মুখে কোনও ট্যাক্স নেই। ত্রয়ণ বাইরের লোক। তার সামনে এসব কথা বলছে! দিঘি একবার চট করে ত্রয়ণকে দেখে নিল। নাঃ, শোনেনি! এই বালখিল্য ব্যাপার-স্যাপার না দেখে একটু সরে গিয়ে কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলছে। ভাগ্যিস! না হলে এসব শুনে ফেলত। কী ভাবত কে জানে!

আর্য এবার সরু চোখ করে গুন্ডাকে দেখল। তারপর আচমকা লাথি চালাল, 'শালা, জলহস্তীর বাচ্চা, একদম ভাট বকবি না. শোন, দিঘির কনেযাত্রী যাবি তোরা, কিন্তু সেটা আমাদের বাড়িতে। কোনও বুড়ো পার্ভার্টের বাড়িতে নয়। বুঝেছিস?'

পনেরো বছরের বড়। তার মানে কি বুড়ো? দিঘির এই 'বুড়ো' শব্দটা খট করে কানে লাগল। ওর মনে পড়ে গেল, কিগানও ওকে এমন বলেছিল না?

ফোনটা শেষ করে ত্রয়ণ এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আমি তাহলে এখন আসি। শোনো, আমি যা বলার বললাম। তোমরা নাগরিক হিসেবে ঠিক করবে, কী করা উচিত। কেমন?'

ত্রয়ণ চলে গেলে আর্য বলল, 'এই গম্ভীর ধরনের লোকটা কে রে? মনে হচ্ছিল খুব কঠিন কিছু বলছিল!'

গুন্ডা বলল, 'এই ব্যাপারটা তুই ঠিক বুঝবি না। হিউম্যানিটিজের ব্যাপার তো। তোর মতো মিস্ত্রি বুঝবে না।'

'মিস্ত্রি মানে?'

'আরে ইঞ্জিনিয়ার আর মিস্ত্রি মানে এক।' গুন্ডা খিকখিক করে হাসল।

দিঘির ভাল লাগছে না এসব কথাবার্তা। দিদি এলে বেঁচে যায় ও। আজ বাড়িতে যাবে দিদি। মা রাতে খেতে বলেছে দিদিকে। বাবার একটা ভাল প্রোমোশন হয়েছে। তাই সেলিব্রেট করা হবে।

দিঘি মোবাইলটা বের করল পকেট থেকে। দিদিকে একটা ফোন করতে হবে। কাজে থাকলে দিদির হুঁশ থাকে না। এদিকে মা যখন নেমন্তন্ন করেছিল, তখন বলেছিল যে, বিকেল-বিকেল পৌঁছে যাবে। এখনই পাঁচটা বাজে। আর কখন আসবে দিদি?

ফোনটা করতে গিয়েও করতে পারল না দিঘি। আর্য গুন্ডার সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করে বসল দিঘির পাশে। বলল, 'বলো না, কোথায় যাবে তোমরা?'

'আরে ওই ত্রয়ণ বলে যে-লোকটা এসেছিল, সে আমাদের যেতে বলেছে একটা ডেমনস্ট্রেশনে। "হেল্প আর্থ" বলে একটা সংস্থা আছে। তারা গাছ কাটার বিরুদ্ধে নামবে পথে। তাই আমাদেরও হাবড়ায় গিয়ে যোগ দিতে বলল ওদের কাজে।'

'ডেমনস্ট্রেশন?' আর্য তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, 'সে তো খুব ঝামেলার ব্যাপার।

'কেন, ঝামেলা কেন?' দিঘি অবাক হল।

'বোকার মতো প্রশ্ন কোরো না। ডেমনস্ট্রেশন মানে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যাওয়া। সেখানে পুলিশ থাকবে। ভুলভাল লোকজন থাকবে। একটু এদিক-ওদিক হলেই লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস। সেখানে যাবে তুমি? পাগল নাকি? রোম্যান্টিসিজমের একটা মাত্রা থাকবে তো! এ তোমার ওই কথায়-কথায় মোমবাতি জ্বালিয়ে 'রং দে বাসন্তী'-র মতো মার্চ নয়। তাছাড়া কলকাতা থেকে অত দূরে গিয়ে, জানাশোনা নেই কীসব সংস্থা, তাদের হয়ে গলা ফাটাবে কেন?'

'ওরে বাবা।' গুন্ডা অবাক হয়ে তাকাল আর্যর দিকে, 'তুই তো ফাটিয়ে দিলি একদম। দিঘি তোর সম্পত্তি নাকি যে, এমন করে টার্মস ঠিক করে দিচ্ছিস?' কথাটা শেষ করে গুন্ডা খুচ করে চোখ টিপল দিঘিকে লক্ষ্য করে।

দিঘি বুঝল আর্যকে তাতানোর জন্য এমন গলা কাঁপিয়ে একটু যাত্রা করে নিল গুন্ডা। আসলে আর্য এসব বোঝে না। সেন্স অফ হিউমার ব্যাপারটাই ওর নেই। সবসময় শুধু পড়া, কেরিয়ার আর দিঘি। এর বাইরে ও কিচ্ছু ভাবে না। এই ক'দিনেই আর্যকে বড্ড ক্লান্তিকর লাগে দিঘির। মনে হয় এ কোন ছেলের সঙ্গে ভাব করল? ভাবে, সত্যিই ভাব আছে তো? কারণ, আর্যর জন্য ওর মনে বিশেষ জায়গা থাকলে কেন সেই পনেরো বছরের বড় মানুষটাকে ভুলতে পারে না ও? কেন ভুলতে পারে না তার গিটারকে? তার এলোমেলো চুলকে? কেন বারবার মনে পড়ে ওই নীল দুটো চোখ?

আর্য গুন্ডার চোখ টেপাটা খেয়াল করেনি। ও তড়বড় করে উঠল আবার ঝগড়া করবে বলে, কিন্তু তার আগেই দিঘির হাতের মোবাইলটা বেজে উঠল।

'হ্যালো, দিদি? কোথায় তুই?'

মহুল বলল, 'আমি বেনিয়াটোলা লেনের ক্রসিংয়ের সামনে ওয়েট করছি। তাড়াতাড়ি আয় তোরা। দেরি করিস না কিন্তু। রাস্তাটা সরু। এখানে গাড়ি পার্ক করা কিন্তু খুব অশান্তির কাজ। বুঝলি?'

বাঁচা গেল। মনে মনে ভাবল দিঘি। ভাগ্যিস দিদি ফোন করে ডাকল, না হলে আর্য আরও গার্জেনগিরি ফলাত। এসব ক্রমশ অসহ্য লাগছে দিঘির। মনে হচ্ছে একটা ফাঁস ক্রমশ চেপে বসছে ওর গলায়। আর্য বড্ড রুটিন যেন। বড্ড সিরিয়াস। স্বার্থপর। ইঞ্জিনিয়ারিং করে ও ম্যানেজমেন্ট করতে বিদেশে যাবে। ওর ইচ্ছে তার আগে দিঘির সঙ্গে এনগেজমেন্ট করে রাখবে। দিঘির এসব বিরক্ত লাগে। কত বয়স যে, এখনই বিয়ে-বিয়ে করে পাগল করে? সবসময় একটা বেঁধে রাখার প্রবণতা। আটকে রাখার প্রবণতা। যেন জোর করে আটকে রাখলেই মানুষ আটকে থাকে। ইস্, কী যে ভুল হয়েছিল মাথা গরম করে সুবর্ণর ক'ছে ওই সব কথা বলে! ব্যাটা সব লাগিয়ে দিয়েছে। আর তার ফলেই তো... মনটা তেতো হয়ে গেল দিঘির।

'কী রে দিঘি? আবার সমাধিস্থ হয়ে গেলি নাকি? মাইরি এত চাপ নিস কেন তুই? আজকাল প্রায়ই দেখছি কেমন হয়ে যাচ্ছিস। কী রে আশ্রম-ফাশ্রম খুলবি নাকি?' গুন্ডা হিঃ হিঃ করে হাসল।

দিঘি উঠল, 'চল, দিদি এসে গেছে। আর লেট করা যাবে না। মেন রোডের ওপর গাড়িতে অপেক্ষা করছে।'

জয় আর স্নেহাকে নেমন্তন্ন করেছিল দিঘি। কিন্তু কাজ আছে বলে ওরা যাবে না। রূপ বলেছিল যে, সন্ধে নাগাদ ও পৌঁছে যাবে বাড়িতে। গুন্ডা তো যাবেই। আর সেটাও দিঘির সঙ্গে।

পাড়ায় সুবর্ণকে নেমন্তন্ন করেছে মা। আর কাউকে বলেনি। আসলে কিগান আর দিঘিকে নিয়ে যে-গন্ডগোলটা হয়েছে সেটা স্পষ্টভাবে পাড়ায় কেউ না জানলেও কাজের লোকদের মুখে মুখে দু'-এক লাইন খবর পৌঁছেছে এর-ওর কানে। সুবর্ণ ব্যাপারটা পাঁচকান করেনি। কিগানের কাকাও যা বলার কিগানকেই বলেছে, আর কাউকে বিশেষ জড়ায়নি এর ভেতরে। তবু, আজকাল পাড়ায় ঢুকলেই অস্বস্তি লাগে দিঘির। কেউ না তাকালেও মনে হয় জোড়ায়-জোড়ায় চোখ লক্ষ করছে ওকে। মনে হয় ভুতুড়ে মানুষজন নিশ্বাস ফেলছে ওর ঘাড়ের কাছে।

গুন্ডা বলল, 'আবার স্ট্যাচু হয়ে গেছে! কী কেস বল তো দিঘি? মাদাম তুসোয় ভর্তি করে দেব? চল না। সেই আধঘণ্টা থেকে না খেয়ে, না খেয়ে কেমন রোগা হয়ে গেলাম দেখছিস না? আচ্ছা, এখন গেলে মোগলাই

পরোটা-ফরোটা খাওয়াবে নিশ্চয়ই?'

'তুইও যাবি?' আর্য রাগ-রাগ চোখে তাকাল গুন্ডার দিকে।

'হ্যাঁ, যাব। কাকিমা নিজে আমায় ফোন করেছিল। তোর আপত্তি আছে?'

আর্য পিঠে ব্যাগটা নিয়ে বলল, 'তুই সামনে দিদির সঙ্গে বসবি। আমি আর দিঘি পিছনে বসব।'

'খুব শখ না? সামনে দিদি, তবু পিছনে বসে অসভ্যতা করার ইচ্ছে!'

'চল তো,' দিঘি এবার ধমক দিয়ে গেটের দিকে হাঁটা দিল।

পিছন পিছন যেতে যেতে গুন্ডা বলল, 'আর্য, মাইরি তুই এমন করিস না যেন আমি তোর পয়সায় খাচ্ছি। দেখ, গরিব ব্রাহ্মণ সন্তান আমি। পৈতে ছিঁড়ে গেছে, তবু ইমাজিনারি পৈতে হাতে নিয়ে এই তোকে অভিশাপ দিচ্ছি যে, তুই যা চাস তা কোনওদিন পাবি না। দিঘি কেন, কোনও নালাও তোর জুটবে না।'

'ব্রাহ্মণ সন্তান মানে! তুই আবার ব্রাহ্মণ হলি কবে থেকে রে?' আর্য খেঁকিয়ে উঠল।

সূর্যটা খসে পড়ে গেছে আকাশ থেকে। তার জায়গায় ছাই মাখা নীল প্লাস্টিক কে যেন ভাসিয়ে দিয়েছে মাথার ওপর। পৃথিবীর সমস্ত বাস ট্রাম আর ট্যাক্সি বোধহয় প্রেসিডেন্সি কলেজের এই সামনেটায় এসে জড়ো হয় শেষ বিকেলে। আর তাদের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে রয়েছে ভ্যান, ঠেলা আর প্রচুর উৎকট সবুজ রঙের অটো। গোটা শহরটার রাস্তাই যেন ক্লিপ'স পাজল। সবাই যেন টুকরোগুলো সাজিয়ে নিজের মতো তৈরি করতে চাইছে শহরটাকে। কিন্তু পারছে না। উল্টে জট পাকিয়ে দিচ্ছে আরও।

শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটকে বাঁদিকে রেখে দিঘি সোজা হাঁটা দিল। ভিড়ের মধ্যে এগনো যথেষ্ট কঠিন। তবু চেষ্টায় যে সব কিছু হয় তা ওরা বুঝতে পারল, যখন বড় রাস্তায় এসে উল্টোদিকের ফুটপাথে দেখল ইলেকট্রিক ব্লু রঙের ছোট্ট গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ির কাচ তোলা। দিঘি বুঝল এসি চলছে। দিদির ডাস্টস্মোকে সমস্যা হয়। তাই গাড়িতে সবসময় এসি চলে। ও দেখল গাড়ির স্টিয়ারিঙের ওপর দু'হাত দিয়ে তাল ঠুকে অল্প মাথা নাড়ছে মহুল। গান শুনছে। মনটা তাহলে ভালই আছে। যাক, বাড়িতে গিয়ে তাহলে বাবা-মায়ের সঙ্গে সামান্য কারণ নিয়ে ঝামেলা করবে না।

'হাই দিদি,' গাড়ির কাচে ঠকঠক করল দিঘি।

মহুল হেসে গাড়ির চাবিটা ঘোরাল। খটখট শব্দে লকগুলো খুলে গেল। মহুল আর্যকে বলল, 'এই আমার পাশে বস। আর দিঘির সঙ্গে গুন্ডা পিছনে বসবে।'

'সামনে বসব!' আর্যর মুখটা শুকিয়ে গেল।

'হ্যাঁ। আমি কি দিঘির চেয়ে কম সুন্দরী? তাছাড়া একটা সুন্দর ছেলে আমার পাশে বসলে গাড়ি চালাতে আরও ভাল লাগবে। চল, ওঠ।'

আর্য ব্যাজার মুখে গাড়ির সামনে বসল। পিছনে দিঘির পর সারা গাড়ি কাঁপিয়ে গুন্ডাও উঠল। আর্য শুধু গায়ের জ্বালা মেটাতে বলল, 'পুলিশ তোমায় ফাইন করবে মহুলদি। প্রাইভেট গাড়িতে লরির মাল তুলছ তো। এক্সট্রা ওজনের জন্য চার্জ নেবে।'

গুন্ডা হইহই করে বলল, 'তাও যদি পুলিশ জানত আসল মালটা কে!'

কলেজ স্ট্রিট থেকে সুকিয়া স্ট্রিট একটুখানি রাস্তা। কোনও কোনও দিন দিঘি হেঁটেই ফেরে, কিন্তু আজ মহুলের সঙ্গে যাবে বলেই অপেক্ষা করছিল। দিঘি গাড়িতে উঠে বুঝল যে, হাঁটাই সবচেয়ে ভাল অপশন। কারণ এই জ্যাম, জট কাটিয়ে এগোয় কার সাধ্য! তাও বলতে হবে মহুলের হাত খুব ভাল। এই ক'মাসেই একদম পাকা ড্রাইভার হয়ে উঠেছে। তবু ঠোক্কর খেতে বিচ্ছিরি লাগছে দিঘির। জানলা দিয়ে বাইরের কলকাতাটাকে কেমন যেন কালো আর নোংরা লাগছে। হলুদ, জন্ডিস রোগীর চোখের মতো আলো। ফুটপাথে প্লাস্টিকের তৈরি রোগা রোগা মানুষজন। উপচে পড়া ময়লা। টেরা-বেঁকা চায়ের দোকান। ক্লান্ত দোকানি। শীতের আমেজ-বঞ্চিত একটা শহর। দিঘির খুব বাজে লাগছে। হঠাৎই বাজে লাগছে। পুরনো একটা হিন্দি গান খুব আস্তে চালিয়েছে দিদি। খুব মনখারাপ করা একটা সুর। কথাগুলো কিছু মাথায় ঢুকছে না দিঘির। শুধু মনখারাপ করা সুরটা কী করে যেন লেপ্টে যাচ্ছে ঘষা কাচের মতো কলকাতার সঙ্গে।

'হ্যাঁ রে দিঘি, ওই মর্কটটা তোকে ফোন করে আর?' আচমকাই প্রশ্নটা করল মহুল।

'মর্কট, মানে?' একটু হকচকিয়ে গেল দিঘি।

'কে বুঝতে পারছিস না? পৃথিবীতে মর্কট তো একটাই আছে। ওই মিথ্যেবাদী, জাল, জোচ্চোর—তোর শমীদা।'

দিঘি ঠোঁট কামড়াল। দিদির কাণ্ডজ্ঞান নেই একদম। সবার সামনে বাড়ির ঝামেলা এমনভাবে হাট করার মানে আছে কোনও? যদিও বন্ধুরা সবই জানে। তবু, সবাই সব কিছু জানলে কি আর সবার সামনে বলতে আছে? এটাই দিদি বোঝে না। মাঝে মাঝে খুব এমব্যারাসিং লাগে দিঘির। ও আড়চোখে দেখল এতক্ষণ গানের তালে মাথা নাড়ানো গুন্ডা, এই প্রসঙ্গটা উঠতেই জানলা দিয়ে যেন বাইরের প্যারিস শহর দেখতে লাগল!

'কী রে বললি না, মালটা আর ফোন করে?'

'না, শমীদা কলকাতায় নেই। সিঙ্গাপুর গেছে। কাদের সঙ্গে যেন মোল্ডেড উডের ফার্নিচারের জন্য কোলাবোরেশন করবে। প্রায় পনেরো দিন থাকবে।'

'মোল্ডেড উডের ফার্নিচার!' মহুলের গলায় একটা অদ্ভুত বিস্ময় দেখতে পেল দিঘি।

মহুল আবার বলল, 'গেছে তো বাপের পয়সায়। একটা ফ্রড, মিথ্যেবাদী! আমায় সেদিন বলল প্রপোজালটার একটা ড্রাফ্‌ট ওকে দিতে। ও ওর বাবাকে দেখাবে। কিন্তু করল কিছু? সেই আগস্টে ওর জন্মদিনের থেকে এখন নভেম্বরের প্রায় শেষ। বলে কিনা ওর কাছে ফিরে যেতে। কে যাবে ফিরে অমন একটা মিথ্যেবাদীর কাছে? রাতের পর রাত শুধু ওর দাপাদাপি সহ্য করার জন্য? এর চেয়ে কনভ অনেক ভাল ছিল। এখন ভাবছি ওকে পাত্তা দিলেই হত। কিন্তু তারও তো উপায় নেই। সেও তো বিদেশে পালিয়েছে।'

'দিদি!' দিঘি রাগের গলায় বলল, 'শোন, বাজে কথা রাখ। তোকে ছাড়া শমীদা কষ্টে থাকে। তাই তোকে ওর কাছে গিয়ে থাকতে বলে। সেদিন রেস্তরাঁয় তোকে সত্যিই বলেছিল। কিন্তু শমীদার বাবা দু'মাস হল লন্ডনে গেছেন। নিজের কাছে তোকে নিতে চায় বলেই শমীদা চেষ্টা করে। কিন্তু হয়তো পারে না। তা বলে এমন করে বলিস না। সবাই তো আর ভালবাসা এক্সপ্রেস করতে পারে না। কেউ হয়তো শমীদার মতো করে। আবার কেউ হয়তো অন্যভাবে করে। হয়তো চুপ করে...'

নিজেকে অনেক কষ্টে সামলাল দিঘি। কীসব বলে ফেলছিল ও! আজকাল এই হচ্ছে বিপদ। সব কথাই কেমন যেন বেঁকে যাচ্ছে দিঘির। আর চলে যাচ্ছে সেই এক লক্ষ্যে!

'কিন্তু আমি অমন নই। আমি দিঘিকে ভালবাসি আর খোলাখুলি বলি, না?' আর্য পিছন ঘুরে সামনের দুটো সিটের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিঘির হাত দুটো ধরার চেষ্টা করল।

'আবার আলু... মানে ইয়ে শুরু করেছিস?' গুন্ডা মহুলের কথা ভেবেই নিজেকে সংযত করে নিল।

ঝগড়াটা আরও বাড়ত। যদি না বাড়িতে পৌঁছে যেত ওরা। মহুল গাড়িটা পার্ক করে, নেমে বলল, 'বাকি ঝগড়াটা বাড়িতে গিয়ে হবে। আর আর্য যখন-তখন আমার বোনের গায়ে হাত দিয়ে আলুবাজি করবি না, বুঝেছিস?'

আর্যর থতমত মুখের ওপর সারা শরীর কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠল গুন্ডা।

আর্যর মুখটা দেখে কষ্ট হল দিঘির। ও ধমক দিল গুন্ডাকে, 'আঃ, থামবি তুই? দশেরার রাবণের মতো লাগছে। চল ঘরে।'

দু'পা এগিয়ে ওদের বাড়ির সিঁড়িতে উঠতে গিয়েও থমকে গেল মহুল, দিঘি আর বাকিরা। মহুল বলে উঠল, 'আরে আদি! আজ বিকেলে হঠাৎ পাড়ায়?'

দিঘি ঘুরে দেখল আদিত্যকে। ওর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। ক্ষণিকের জন্য মনে হল তাহলে সেও কী... না, তা কী করে সম্ভব? সে তো চলে গেছে পাড়া থেকে। কোথায় গেছে কে জানে!

আদি চিরকালীন গম্ভীর। আজ যেন আরও গম্ভীর লাগল। বলল, 'এমনি। কিছু বলবে?'

মহুল অপ্রস্তুত হল সামান্য। তবু স্মার্টনেস দেখিয়ে বলল, 'আচ্ছা, তোর সেই পিডোফিল দাদাটি কই?'

'মানে?' আদির চোয়াল শক্ত হয়ে গেল হঠাৎ, 'দাদাভাই পিডোফিল নয়, বাজে কথা বোলো না মহুল।'

'তাই?' আদির এমন মুখটা দেখেই বোধহয় একটু থমকে গেল মহুল। তারপর লাইট করার জন্য বলল, 'আরে জাস্ট পুলিং ইওর লেগ্‌স। তা কোথায় কিগানদা?'

আদি চোয়াল শক্ত করে দিঘির দিকে তাকাল একবার। তারপর অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, 'জানি না। দাদাভাই কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না আর।'

কলকাতা একটা ঘষা কাচের শহর। এখানে প্লাস্টিকের মানুষজন থাকে। ময়লা পাতিলেবুর মতো চাঁদ ওঠে এখানকার আকাশে, উত্তর থেকে আঁশটে গন্ধ নিয়ে আসে শীতের না-আসা হাওয়া। এখানে এ ওর গায়ের মাংস খুঁজতে বের হয় মানুষের মতো দেখতে জন্তুরা। বড় বড় ঠোঁট ঝুলিয়ে ব্রিজের মাথায় বসে থাকে চিল। এখানে বকুল ফুলের থেকে মরা ইঁদুরের গন্ধ আসে। দিঘি জানে এখানের ওই দোতলার দক্ষিণের জানলায় আর আলো জ্বলে না। মাস্কের মন-কেমন করা গন্ধ আর আসে না এ পাড়ায়।

দিঘি জানে ওর কাছ থেকে সারা জীবনের মতো চলে গেছে কিগান।

৯

পিঠের ব্যাগটা ঠিক করে নিয়ে একবার ঘড়িটা দেখল আদি। প্রায় সওয়া পাঁচটা বাজে। গাড়ি এখনও এল না। এই ড্রাইভারটা নতুন। সপ্তাহখানেক হল জয়েন করেছে ওদের কোম্পানিতে। এমনিতে ছেলেটা ভালই। কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন হয়ে যায়। নাম মল্লার। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স। গোবেচারা ধরনের। গোল মুখ। ফরসা। একটা ভালমানুষ ব্যাপার আছে চেহারায়। আর বই পড়ে খুব। তাও ইংরেজি বই-ই বেশি।

এ মাস থেকে একটা গাড়ি দেওয়া হয়েছে আদিকে। অবশ্য শুধু আদিকেই নয়, মালিনীকেও। আর সেই গাড়িটাই চালায় মল্লার।

আজ ওদের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের থার্ড প্লেস নির্ধারণ ম্যাচ ছিল। ম্যাচটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার টিমটা জিতে গেছে। ভাল খেলাই হয়েছে। চিফ গেস্ট হিসেবে বাংলার একজন প্রাক্তন রঞ্জি ক্রিকেটারকে আনা হয়েছিল। তিনি যে-গাড়িটায় এসেছিলেন, সেটা ব্রেক ডাউন হয়ে গেছে। তাই অন্য কোনও গাড়ি না থাকায় আদি মল্লারকে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়েছে ভদ্রলোককে বাড়িতে পৌঁছে দিতে। তাও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেল। কোথায় গেল ছেলেটা? বিরক্ত লাগছে আদির। আজ এরপর দুটো কাজ আছে। গৌরের গুরুসদয় রোডের বাড়িতে যেতে হবে আর তারপর সেখান থেকে যেতে হবে দমদম এয়ারপোর্টে। পরশু ওদের এই টোয়েন্টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের ফাইনাল। সেখানে প্রাইজ দিতে মুম্বইয়ের একজন স্টার আসবেন।

এই নায়কটি নতুন। এখনও এর স্টারগিরির সামনে 'সুপার' শব্দটি বসেনি। কলকাতায় এই ছেলেটির শুটিং আছে। তার ফাঁকে প্রাইজ দিয়ে যাবে। আজ গৌর বলে দিয়েছে যে, আদি আর মালিনী যেন ওকে রিসিভ করে এয়ারপোর্ট থেকে। তারপর যেন হোটেল অবধি দিয়ে আসে। ফলে কাজ আছে আদির। কিন্তু মল্লার যদি বুঝত! নতুন ছেলেদের নিয়ে এই এক প্রবলেম। তারা কাজের গুরুত্ব বোঝে না।

আদির মনটা একটু খিঁচড়ে আছে। অকারণে রাগ করতে ইচ্ছে করছে। চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে মল্লারকে ধরে আচ্ছা করে পেটায়। ও আসছে না বলেই তো এখান থেকে বেরোতে পারছে না। যেতে পারছে না পরের কাজে। ও আসছে না বলেই তো মালিনী এখনও ওই দূরে দাঁড়িয়ে অপদার্থটার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে।

ব্যাড, ভেরি ব্যাড। মনে মনে একটা গালাগালি দিল আদি। মেয়েটাকে কত বোঝায়, এমন করে যার তার সঙ্গে কথা বলতে নেই। কিন্তু কিছুতেই বোঝে না মালিনী। বলে, 'অত বাছাবাছি করে আমি মিশি না। যাকে আমার ভাল মনে হয়, তার সঙ্গেই কথা বলি। বুঝেছ?'

বুঝেছে। মালিনী সিংহ কেমন মেয়ে তা এই ক'মাসে যথেষ্ট বুঝেছে আদি। প্রথম দর্শনে যে কোনও মেয়ে এখনকার আদিকে এমন নাড়িয়ে দিতে পারে, তা আদি ভাবতেও পারেনি। স্যামের চেম্বারে মালিনীকে দেখে একদম বোবা হয়ে গিয়েছিল আদি। নিজের সেই ভিতু পনেরো বছরে ফিরে গিয়েছিল যেন। হাঁটু কাঁপছিল ওর। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

সেদিন স্যামের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর স্যামের সেক্রেটারি রায়না বলেছিল, 'লুক আউট ব্যানার্জি। ডোন্ট ট্রাই ইওর ট্রিক্‌স।'

ট্রিক্‌স? না, সেসব তো মাথাতেও আসেনি আদির। সত্যি মাথায় আসেনি। যে-আদি পছন্দসই মেয়ে দেখলেই তাকে জামাকাপড় ছাড়া কেমন লাগবে বিছানায় চিন্তা করে নিত, সে কিনা সেসব ভাবেইনি একদম! আর সেখানে রায়না বলছিল যে, ও যেন ওর ট্রিক্‌স না দেখায়! আশ্চর্য!

স্যামের চেম্বারের বাইরে মালিনীর সঙ্গে প্রথম কথা হয়েছিল টি-কাউন্টারের সামনে। না, আদি খুব একটা চা খায় না। কিন্তু সেদিন যেই দেখেছিল যে, মালিনী কাউন্টারের সামনে গিয়ে চা নিচ্ছে, ও-ও এগিয়ে গিয়েছিল।

'হাই!' মালিনীই প্রথম কথা বলেছিল।

'হ্যালো।' আদি নিজেই বুঝতে পারছিল যে, ওকে খুব বোকা বোকা লাগছে।

'ইউ ওয়ান্ট মি টু পোর সাম টি ফর ইউ?' মালিনী হেসে জিজ্ঞেস করেছিল।

'দ্যাট উইল বি নাইস।'

'এখানের চা বেশ ভাল।' মালিনী যেন কতকটা নিজের মনেই বলেছিল।

'তা ঠিক।' মাথা নেড়ে আদি ভাবছিল, কী বলা যায়, 'তোমার বাংলা তো খুব ভাল। এত ভাল বাংলা শিখলে কোথায়?'

মালিনী হেসেছিল আবার। হালকা বাদামি চোখ, গভীর দুটো টোল আর চকচকে বিজ্ঞাপনের মতো দাঁত। আদি একটু বেশিক্ষণই তাকিয়ে ফেলেছিল।

মালিনী চোখে দুষ্টুমি এনে বলেছিল, 'আমার মা বাঙালি। শান্তিনিকেতনে পড়েছেন। আমি নিজেও রবীন্দ্রসংগীত গাই। আমার বাবা সিকিমের লোক। তাই হয়তো আমায় দেখলে বোঝা যায় না। কেন, দ্য গ্রেট আদিত্য ব্যানার্জির হঠাৎ আমার অরিজিন নিয়ে চিন্তা কেন?'

'মানে?' আদি ভুরু কুঁচকেছিল।

মালিনী হেসেছিল, 'তোমার যা সুখ্যাতি অফিসে! তুমি নাকি লেডি কিলার। রায়না ওয়াজ অল প্রেয়জ ফর ইউ। তাই বলছিলাম।'

'ও,' রাগ হয়েছিল আদির। মালিনীর কান ভাঙানো হয়ে গেছে তাহলে! রায়না তো হেভি খিটকেল। আচ্ছা, অমন ভারী বুক নিয়ে, বিপজ্জনক কাটের ড্রেস পরে আসার পরও যদি কোনও ছেলে সেই দিকে না তাকায়, তাহলে সে কি ছেলে? আর রায়নাকে কি কিছু বলেছে আদি? কিছু করেছে? তাহলে? তাহলে কেন ও মালিনীর কান ভাঙাতে গিয়েছে?

আদি দ্রুত চায়ে চুমুক দিয়ে চা-টা শেষ করে পেপার কাপটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে সরে এসেছিল কাউন্টার থেকে। মালিনী বুঝেছিল ব্যাপারটা। দ্রুত এসে দাঁড়িয়েছিল আদির সামনে। বলেছিল, 'আরে তুমি তো রাগ করলে দেখছি! আই ওয়াজ জোকিং। দেখো তো, ইয়ার্কি মারতে গিয়ে তোমার সঙ্গে প্রথমেই একটা বাজে সম্পর্ক হয়ে গেল!'

আদি তাকিয়েছিল মালিনীর দিকে। সুন্দর মুখটায় বিব্রত ভাব দেখতে ভাল লাগছিল না ওর। নিজের স্বভাববিরুদ্ধভাবে ও বলেছিল, 'না না, ঠিক আছে। আসলে, নিজের সম্বন্ধে এমন কথা শুনতে কার ভাল লাগে বলো তো? তাছাড়া রায়না এ কথা বলে কী করে? আমি কোনওদিন কিছু করেছি বা বলেছি ওকে? অমন ওয়ার্কপ্লেস-এ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট যারা করে তারা ঘৃণ্য প্রাণী। আমি তাদের দলে নই।'

'আরে আরে, ডোন্ট গেট এক্সাইটেড।' মালিনী আলতো করে আদির কাঁধে হাত রেখেই সরিয়ে নিয়েছিল, 'শোনো না, আমাদের এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। লোকে যতই বলুক যে, কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে আমরা রাইভ্যাল, আমরা কিন্তু তা হব না। বরং অন দ্য কন্ট্রারি, উই উইল বি ফ্রেন্ড্‌স। কেমন?'

কোনও সুন্দরী মেয়ে, যাকে তোমার পছন্দ, সে যদি এমন মসৃণভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলে, 'ফ্রেন্ড্স' বলে হাত বাড়ায়, তাহলে জেনো তোমার ভাগ্য হিন্দি ছবির হিরোর বন্ধুর মতো হবে। জেনো, শুরুর আগেই তোমার গল্প শেষ। এসব আদি খুব ভাল জানে। তাই মালিনীর বাড়ানো বন্ধুত্বের হাত দেখে মনের ভেতর দমকলের ঘণ্টা শুনেছিল ও। বুঝেছিল 'বন্ধু' বলে আদেখলার মতো হাতটা ধরলে আদির আর ভবিষ্যতে কোনও চান্স থাকবে না।

ও মালিনীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'হ্যাঁ, আমরা রাইভ্যাল নই, ঠিকই। কিন্তু ফ্রেন্ড্স কিনা সেটা ভাবতে হবে। মালিনী, আমার খুব একটা বন্ধুর দরকার হয় না।'

'কী রে শালা, এখনও যাসনি?' আবেশের আচমকা গলায় ঘোরটা কাটল আদির।

'কী বলছিস?' আদি দেখল একটা প্যাকেট থেকে কিছু খেতে খেতে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আবেশ।

'বলছি, এখনও যাসনি?'

'না, এবার যাব। দেখ না, মল্লার গাড়িটা নিয়ে গেছে ওই ক্রিকেটার ভদ্রলোককে পৌঁছে দিতে কিন্তু এখনও ফিরছে না। এদিকে ব্যাটার মোবাইলও নেই যে, ধরব। নাঃ, অফিস থেকে ওকে একটা মোবাইলের বন্দোবস্ত করে দিতেই হবে।' আদি কথা বলতে বলতে আবেশের ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছনে দাঁড়ানো মালিনীকে দেখল আবার। এখনও ওই অপদার্থটার সঙ্গে কথা বলেই যাচ্ছে। কী কথা আছে অমন একটা লুজারের সঙ্গে? তাও এতক্ষণ ধরে! বুকের ভেতর যে-কাঁকড়াবিছেটা এতক্ষণ হুল ফোটাবে বলে হুমকি দিচ্ছিল, সে এবার হুলটা ফুটিয়েই দিল।

আবেশ বলল, 'শালা, তোরা এমন কিপটে না! দেখ, খাবারের যে-প্যাকেট করেছিস, তার সিঙাড়াটায় গন্ধ। এত বড় একটা কোম্পানি তোদের, সেখানে এমন জঘন্য খাবার মানুষকে কেউ দেয়?'

আদি বিরক্ত গলায় বলল, 'ওই শালা রুহানটাকে সাউথ কলকাতার টিমে তোকে কে ঢোকাতে বলেছিল বল তো?'

আবেশ একটা মিষ্টির অর্ধেক কামড়াতে গিয়েও স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল আদির দিকে। তারপর খুব ধীরে ধীরে হাসি ফুটল ওর মুখে, 'ওরে কাকা! এই কেস!'

'মানে?' আদি ভুরু কুঁচকে তাকাল।

আবেশ মিষ্টিটা পুরো মুখে ঢুকিয়ে বলল, 'মানেটা কি তোকে ডিকশনারি দেখে বোঝাতে হবে? শোন, রুহানও তো আমার বন্ধু। ওর টাকার দরকার। ক্রিকেটটাও একসময় ভাল খেলত। তাই ভাবলাম ওকে প্রস্তাব দিই। কেন, তোর ভাল লাগেনি? ও তোর বন্ধু নয়?'

'দেখ। রুহান ইজ ফিনিশ্ড। প্রথম ম্যাচটাতে ঝুলিয়ে লাট করল। তারপর তো আর চান্সই পেল না। শুধু মাঠে আসে আর যায়। দেখ না, আজও এসেছে। খেলা নেই ওদের, তবু এসেছে। মালটা পুরো ফ্রাস্টেটেড, হি ইজ

নট মাই ফ্রেন্ড এনি মোর।'

আবেশ খাওয়া শেষ করে কায়দা করে প্যাকেটটা একটু দূরে রাখা বিন-এ ফেলে বলল, 'শালা, চিরকাল স্বার্থপর রয়ে গেলি। নিজেরটা ছাড়া আর কিছু বুঝিস না, না? মালিনীকে তোর ভাল লাগে আর সেই মেয়েটা রুহানের সঙ্গে গল্প করছে দেখে তোর জ্বলছে। মালিনীকে নতুন ছক করছিস নাকি? সাবধান কিন্তু। দেখিস, এ তোর ওইসব মেয়েদের মতো নয় কিন্তু।'

'আঃ,' বিরক্ত লাগল আদির, 'সব সময় নোংরামো না তোর? আমি মোটেই ওভাবে দেখি না মালিনীকে। বাজে কথা বলবি না।'

'তাই?' আবেশ হাসল, 'বিড়াল বলে, মাছ খাব না। শোন, রুহানকে তো চিনিস। আতা ক্যালানে টাইপ। ওর যে প্রেমিকা ছিল না? সেই যে রে নন্দা। তাকেও শালা কোনওদিন কিছু করেনি। তাই হয়তো মেয়েটা ওকে লাথ মেরে বের করে দিয়েছিল জীবন থেকে। ওকে যখনই এই নিয়ে জিজ্ঞেস করি মালটা চুপ করে যায়। শোন না, তুই টেনশন করিস না। আর দেখ না, পরশুর ম্যাচটার পর কোথায় রুহান, কোথায় মালিনী। দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ইওরস ব্রাদার।'

আদি কিছু না বলে শুধু শব্দ করল মুখ দিয়ে। হুঁঃ, পৃথিবী নাকি ওর?

আবেশ এবার কাছে এল আরও। চাপা গলায় বলল, 'শোন না, একটা মেয়ে আছে। একটু গরিব বাড়ির। কিন্তু ভাল। মাসাজ পার্লারে কাজ করে। টাকার দরকার। প্রাইভেটেও মাসাজ করতে রাজি। তুই দেখবি একবার?'

আদি হাত দিয়ে আলতো ধাক্কায় সরিয়ে দিল আবেশকে, 'সবসময় ফালতু কথা বলবি না। মটকা গরম আছে. মনে রাখিস এই কাজটা কিন্তু তুই আমার জন্যই পেয়েছিস। ফারদার নোংরামো করবি তো...'

আবেশ খিকখিক করে হাসল, 'বাব্বা, কাকা যে পুরো খেপে গিয়ে লাল হয়ে গেছে! এর আগে এমন মেয়েদের সঙ্গে তোর যোগাযোগ করিয়ে দিইনি? যাক গে, তোর যখন ইচ্ছে নয় তখন বাদ দে। আর হ্যাঁ, মাইরি এই টুর্নামেন্ট তো শেষ। এরপর কী করব বল তো? ওই গৌর স্যারকে বলে তার একটা কিছু করে দে না ভাই, না হলে খুব বাজেভাবে কেস খেয়ে যাব। জানিসই তো, মামার বাড়িতে অমানুষ আমি। মামি মালটা খুব বিষাক্ত। ভাতের সঙ্গে এমন এমন খিস্তি দেয় না যে, আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। ভাই, এর পর কিছু একটা করে দিস প্লিজ।'

আদির অবাক লাগে মাঝে মাঝে। এ ছেলেটা সত্যিই খুব অদ্ভুত। গালাগালি করো, মারো, বকো, কিছুতেই রাগ করে না। ভুলভাল কাজের সঙ্গে সমানভাবে ইয়ার্কি ফাজলামো করে যায়। কোনও কিছুতেই যেন গা করে না।

'স্যার, এই যে, আমি এসে গেছি।' এই ডিসেম্বরেও ঘেমে স্নান করে এসে মল্লার দাঁড়াল সামনে। আদি দেখেই বুঝল খুব নার্ভাস হয়ে আছে ছেলেটা। রীতিমতো টেনশনে কাঁপছে ও। ফরসা মুখটা লাল হয়ে আছে একদম। ভেতরে ভেতরে রাগ হলেও আদি এখন ওকে দেখে আর তেমন রাগ করতে পারল না। তবু, সাব-অর্ডিনেটদের চাপে রাখতে হয় সবসময়। কর্পোরেট জগতের এটাই হল প্রথম পাঠ।

আদি গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমার এত দেরি হল কেন?'

'সরি স্যার... আমি ইয়ে...' মল্লার তোতলাতে লাগল ভীষণভাবে।

'আমি কী? জানো না আমার কাজ আছে? ক'দিন হল কাজে জয়েন করেছ? এরই মধ্যে এসব শুরু করে দিয়েছ?' আদি গলার স্বরটা রুক্ষ করল আরও।

'আই সোয়্যার স্যার। আমি ইচ্ছে করে করিনি। পুলিশ ধরেছিল আমায়।'

'পুলিশ?' আদি অবাক হল।

'আমার সিট বেল্ট বাঁধা ছিল না তাই... আমার লাইসেন্স রেখে দিয়েছে স্যার।' মল্লার কাঁচুমাচু গলায় বলল।

'এত বেখেয়াল কেন তুমি? আননেসেসারি আমার দেরি হয়ে গেল। গৌর স্যার জিজ্ঞেস করলে কি বলব যে, তুমি ইনএফিশিয়েন্ট বলে এমন হল?' আদি গলার রুক্ষতা বজায় রেখে বলল।

'না স্যার, প্লিজ স্যার এমন করবেন না। প্লিজ।' মল্লার কেঁদে ফেলল প্রায়।

'ঠিক আছে যাও। গাড়িতে গিয়ে বোসো।'

মল্লার মাথা নিচু করে চলে যাওয়াতে মনে মনে হাসল আদি। ছেলেটা খুব নার্ভাস। বকা খেলে আরও নার্ভাস হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে একটু বোকাও আছে। গৌর রওশান দিওয়ান ডাইরেক্টর। সে একটা ড্রাইভার কী করল না করল তা নিয়ে মাথা ঘামাবে? পাগল নাকি?

মল্লার চলে যেতে আবেশ অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এ কে রে? কোত্থেকে জোগাড় করেছিস? এ তো বার্নার্ড শ'! এমন ইংরেজি বলা ড্রাইভার বাপের জন্মে দেখিনি। ও গাড়ি চালাচ্ছে কেন?'

আদি বলল, 'তা আমি জানব কেমন করে? নিশ্চয়ই কোনও গল্প আছে।'

'তা জিজ্ঞেস করিসনি?'

'অত কৌতূহল আমার নেই। ড্রাইভারের হাল হকিকত জিজ্ঞেস করব! একটা ক্লাস বলেও তো ব্যাপার আছে। নাকি?'

'আরে, তোদের গাড়ি চালায়। ভদ্র, শিক্ষিত ছেলে, তাকে জিজ্ঞেস করলে দোষ কোথায়? ড্রাইভার বলে কি মানুষ নয়?'

'ওসব ফালতু ভাষণ রাখ।' আদি আর একবার দূরে তাকাল। এখনও কথা বলে যাচ্ছে ওরা! কী আশ্চর্য! মালিনী কেন করছে এমন?

আবেশ আর কথা বাড়াল না। বলল, 'আমার ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখিস। আবার কুকুর ধরতে যেতে পারব না ভাই। কেমন? ঠিক আছে, তোরা এগো। আমি কাটি।'

আবেশ চলে যেতেই মালিনীও এগিয়ে এল এবার। আর ওর সঙ্গে সঙ্গে এল রুহান। আদি চোয়াল শক্ত করল। এতক্ষণ খোশগল্প করেও শখ মেটেনি? আচ্ছা বেহায়া তো রুহানটা।

মালিনী কাছে আসতেই আদি কড়া গলায় বলল, 'এতক্ষণ ওয়েট করছি। কী করছিলে কী? স্যার তো এবার আমায় ঝাড় দেবেন।'

মালিনী ওর টোল পড়া হাসিটা হাসল। বলল, 'বাহ্ রে, তুমিই তো এতক্ষণ আবেশের সঙ্গে গল্প করছিলে দেখছিলাম। তাই তো আমি রুহানকে আমাদের ওল্ড এজ হোমটার কথা বলছিলাম। রুহান আমায় বলল যে, এবার থেকে ও-ও আমার সঙ্গে রোববার করে যাবে হোম-এ।'

আদি রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোদের ফাইনাল তো পরশুদিন। আজ কী করছিস এখানে? অফিস-কাছারি নেই? শুনলাম কোন একটা চাকরি পেয়েছিস নাকি? তা, চাকরি রাখার ইচ্ছে আছে তোর!'

রুহান এমন আচমকা আক্রমণে থতমত খেল সামান্য। তবু যথাসম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে হাসিমুখে বলল, 'না, আমার তো তেমন কাজ থাকে না। তাই, কাছেই বাড়ি বলে চলে আসি। তোকে মাঝেমধ্যে দেখি। কিন্তু এত ব্যস্ত থাকিস বলে কথা হয় না।'

মালিনী বলল, 'আদি সব সময় ব্যস্ত। তবে সব ম্যাচে তো আর আসতে পারে না। আজ থার্ড পজিশনের খেলা বলে আমরা এসেছি।'

রুহান বলল, 'সেই তো বলছি। তা কেমন আছিস রে আদি? কাকু-কাকিমা কেমন আছেন? বহুদিন খবর পাই না।'

'কেন? খবর পাস না কেন? দাদভাইয়ের সঙ্গে তো তোর যোগাযোগ ছিল।'

'তা ছিল। তবে সেটাও প্রায় মাস চারেক হয়ে গেল। তুই জানিস কিগানদা কোথায় গেছে?'

'কেন, তোর কাছে দাদাভাইয়ের মোবাইল নম্বর নেই? ফোন করে খবর নিতে পারিস না? সবসময় এমন প্রশ্ন করে, তুই যে কনসার্ন তা বোঝাতে চাস কেন? তোর এই ভড়ংবাজি অনেক দেখেছি। যারা দেখেনি তাদের দেখা।' আদি গুলি করার মতো করে কথাগুলো বলে দিল।

রুহান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

মালিনী চট করে বলল, 'ও কে রুহান, তোমার মোবাইল নম্বর তো নিয়ে নিলাম। শনিবার তোমায় ফোন করে রোববার কখন যাব সেটা ঠিক করে নেব, কেমন? তুমি কিন্তু রোববারটা ফ্রি রেখো। আমরা এবার আসি।'

প্রিয়া সিনেমার সামনে গাড়িটা রাখা ছিল। আদি আর মালিনীকে দেখে মল্লার চটপট দরজাটা খুলে দিল।

গাড়িটা ছোট হলেও নতুন। খুবই আরামদায়ক। প্রথমে মালিনী উঠে

বসল। তারপর আদি উঠে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। মল্লারকে বলল, 'গুরুসদয় দত্ত রোড চলো। স্যারের বাড়ি।' তারপর জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

সন্ধে হয়ে গেছে এখন। ছ'টার শোয়ের ভিড়ে থিকথিক করছে জায়গাটা। গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে যেতে মল্লার বেগ পেল বেশ। তারপর মনোহরপুকুর দিয়ে হাজরা রোডের দিকে গাড়ি ছোটাল ও। আদি একবারও তাকাল না মালিনীর দিকে। ও বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আর তার মাঝেই শুনল মালিনী ফোন বের করে ডায়াল করল। কারও সঙ্গে কথা বলবে। আদি আরও বিরক্ত হল। ও যে রাগ করেছে, সেটা কেন বুঝতে পারছে না মালিনী?

'হ্যালো জিয়ানাদি, হাউ আর ইউ?'

মালিনীর গলায় নামটা শুনে নড়েচড়ে বসল আদি। আরে, জিয়ানা বোসের সঙ্গে মালিনীর কী কথা থাকতে পারে? প্রোজেকশন কর্পে, ভাল পদেই আছে জিয়ানা। তিরিশের ওপর বয়স ভদ্রমহিলার। সামান্য মোটার দিকে। দেখলে বোঝা যায় যে, এককালে বেশ সুন্দরী ছিল।

প্রোজেকশন কর্প, চাপাডাঙায় ওদের যে নতুন ফ্রুট জুস আর মিনারেল ওয়াটারের প্রোজেক্ট আসছে তার জন্য কোট করছে। তাই জিয়ানা ওদের অফিসে মাঝে মাঝেই আসে। একটা নামি কনসালটেন্সি ফার্মকে এই কাজটার টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট হিসেবে রেখেছে গৌর। কনসালটেন্সি ফার্মটার ঠিক করে দেওয়া টেকনিক্যাল লাইন ধরে সবাইকে কোট করতে হবে।

কাজটার জন্য সারা ভারত থেকে ছ'টা কোম্পানি এসেছে। তাদের মধ্যে জিয়ানা বোসদের প্রোজেকশন কর্পও রয়েছে। আসলে প্রোজেকশন কর্পের বেশ কিছু সিনিয়র সেল্‌স ইঞ্জিনিয়ার একসঙ্গে রিজাইন করে ওয়াটার বার্ড কোম্পানিতে জয়েন করেছে। এই ওয়াটার বার্ড চেন্নাইয়ের কোম্পানি। এখন ইস্টার্ন ইন্ডিয়ায় ব্যবসা করতে চাইছে। জীবনদীপের কাছে অফিসও নিয়েছে ওরা। এই চাপাডাঙার কাজটা পাওয়ার চেষ্টা ওয়াটার বার্ডও করছে।

আদির কাছে সব পার্টিই সমান। ওর কাজ হল এইসব কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কাজ নিয়ে যা কথাবার্তা হয়, তা যাতে মসৃণভাবে হয়, তা দেখা। মার্চেন্ট মাল্টিপলসের ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন আর পারচেজের সঙ্গে এইসব পার্টির কোঅর্ডিনেশন বজায় রাখতে গিয়ে আদি সবসময় নিজেকে নিরপেক্ষ রাখার চেষ্টা করে। ও জানে যে, এখানে একটা টাকাপয়সা খাওয়ার জায়গা নেই। কারণ, ওর হাতে কিছুই নেই। তাই পক্ষপাতহীন অবস্থান নিতে ওর সুবিধে হয় খুব।

মালিনীরও তো তাই অবস্থান হওয়া উচিত। ওর তো জিয়ানাকে মিসেস বোস বলে একটা বিক্রিয়াহীন দূরত্বে রাখা উচিত। কিন্তু কাউকে এমনভাবে ফার্স্ট নেম-এ দিদি বলে ডাকাটা খুব অপেশাদারী হয়ে যাচ্ছে না? গৌর শুনলে কিন্তু বেশ রেগে যাবে!

আদি জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেও কানটা রাখল মালিনীর দিকে। ও শুনল, মালিনী সেই ওল্ড-এজ হোম নিয়েই কথা বলছে। সামনের রোববার জিয়ানাকেও যেতে বলছে।

ভুরু কুঁচকে গেল আদির। মালিনী তো কোনওদিন আদিকে বলে না কিছু এই নিয়ে। কেন বলে না? আর এসব ওল্ড-এজ হোম-টোম করে কী হয়? যত সব ফালতু কাজকম্ম!

ফোনটা রেখে মালিনী ব্যাগ থেকে একটা চকোলেট বের করে আলতো খোঁচা দিল আদির হাতে, 'খাবে?'

'কী?' আদি মুখ ফিরিয়ে বলল।

মালিনী বলল, 'চকোলেট। খাও না?'

'না।' ছোট্ট করে জবাব দিল আদি।

'কেন?' মালিনী অবাক হল।

আদি দেখল বাঁ দিকে শিশুমঙ্গল হাসপাতাল আর তার সামনের সিগনালে গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনে পিছনে অসংখ্য গাড়ির লাল-হলুদ আলো পিটপিট করছে। আদির এক মুহূর্তের জন্য মনে হল মানুষের চেয়ে কি এখন গাড়ির সংখ্যা বেশি এ শহরে? এত গাড়ি রাত হলে কোন সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়ে? তখন তো রাস্তা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকে একদম। আচ্ছা, অতিরিক্ত ব্যবহারের পর কি সব কিছুই এমন পরিত্যক্ত হয়ে যায়? তাই কি মালিনীদের ওল্ড এজ হোমের কথা বলতে হয়?

মালিনী আবার বলল, 'কী হল? খাবে না?'

'হঠাৎ? আমায় খেতে বলছ!' আদি গোমড়া মুখে জিজ্ঞেস করল।

'হঠাৎ নয়,' মালিনী ওর বিপজ্জনক হাসিটা দিল, 'আই হ্যাভ সামথিং টু আস্ক ইউ। আ ফেভার। করবে?'

'তার জন্য চকোলেট দিতে হবে?'

'না, রায়না বলেছে যে, তুমি নাকি ক্যাশ বা কাইন্ডসের প্রতি দুর্বল।' মালিনী হাসিটা বাড়িয়ে দিল কয়েক ঘর।

'মানে?' আদি প্রায় ছিটকে গিয়ে ঘুরে বসল, 'রায়না বলেছে যে, আমি ঘুষ খাই? তুমি জানো ও গৌর স্যারের সঙ্গে কখন কখন, কোথায় কোথায়...'

মালিনী আচমকা আদির হাতে চিমটি কেটে থামিয়ে দিল ওকে। আদি দেখল গাড়ির আবছা অন্ধকারের ভেতর মালিনী চোখ দিয়ে ইশারা করে সামনে বসা মল্লারকে দেখাল।

আদি সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল একদম। সত্যি রাগের মাথায় ও একটা ভুল করতে যাচ্ছিল। ও ঠোঁট কামড়ে বাইরের দিকে তাকাল আবার।

মালিনী বলল, 'আমি কলকাতায় গ্র্যানির সঙ্গে থাকি। সি ইজ সিক। আই নিড টু অ্যাটেন্ড হার ফ্রম সেভেন ও'ক্লক। আমাদের সন্ধের আয়াটা আসবে না আজ। তাই বলছিলাম যে, গৌর স্যারের বাড়িতে যদি আমি না যাই, তুমি স্যারকে একটু ম্যানেজ করে নিতে পারবে না?'

'তোমার গ্র্যানি অসুস্থ?' কথাটা বলেই নিজের কানে খট করে লাগল আদির। একটু বেশি কনসার্ন দেখিয়ে ফেলছে কি?

'হ্যাঁ। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। সকালের আয়া আজ সাতটায় চলে যাবে। তাই বলছিলাম আর কী?'

'ঠিক আছে,' আদি বলল, 'তা কোথায় নামাব তোমায়?'

'একটু যদি কষ্ট করে বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে ড্রপ করে দাও।' মালিনী দ্বিধার সঙ্গে বলল।

'এতে কষ্টের কী আছে?' আদি ঘুরে বসল, 'বলো না তোমার বাড়ি অবধি দিয়ে আসব। কোনও অসুবিধে হবে না।'

'না না,' মালিনী যেন গুটিয়ে গেল একটু, 'বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে ওই ধাবার সামনে নামিয়ে দিও, তাহলেই হবে। আমি হেঁটে চলে যাব।'

'ভয় পাচ্ছ?' আদি সামান্য ব্যঙ্গের গলায় বলল, 'তোমার বাড়ি চিনতে দেবে না? আমি যদি খারাপ কিছু করি, তাই না?'

'না না,' মালিনী অপ্রস্তুত হল, 'আরে আমার বাড়ি ভিতর দিকে। তোমার ফালতু টাইম ওয়েস্ট হবে। স্যার রাগ করবেন। তার চেয়ে এই ভাল।'

আদি গম্ভীর গলায় বলল, 'ঠিক আছে। যেমন তোমার ইচ্ছে।'

বালিগঞ্জ ফাঁড়িটা এখান থেকে কাছে। কিন্তু সেখানেও প্রচুর জ্যাম। এই সন্ধের দিকে কি হঠাৎ করে গাড়ি বেড়ে যায় বাইরে? এই রাস্তার মোড়টা কাটাকুটির মতো। প্রচুর গাড়ি। প্রচুর হর্ন। তার আলো, হইচই, সব মিলিয়ে মানুষের নিজেরই হারিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। মালিনী সিগনালে গাড়ি থামামাত্র নেমে ওই পাঁচমিশেলি ভিড়ে মিলিয়ে গেল। আদি অবাক হয়ে দেখল, মেয়েটা পিছনে ফিরে তাকাল না পর্যন্ত!

বুকের ভেতরে কে যেন খুব জোরে গিঁট বাঁধল একটা। আদির অবিকল সেই যাজ্ঞসেনী আইয়ারের সময়কার মতো মনে হল নিজেকে। বহু বহু দিন পরে আবার তেমন কষ্ট হল ওর। মনে হল পৃথিবীর কেউ ওর কথা চিন্তা করে না।

প্রয়োজন নেই। চিন্তা করার প্রয়োজন নেই একদম। আদি দাঁত চেপে সংযত করল নিজেকে। মেয়েরা চিরকাল এমন হয়। নিষ্ঠুর একটা ফাঁদের মতো, ভেঙে যাওয়া বৃষ্টির স্বপ্নের মতো, হারিয়ে যাওয়া রুবিগুলির মতো। মেয়েরা কোনওদিন নিজেদের বাদ দিয়ে কিছু দেখতে পায় না। আদি অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে এখন। শীত শীত করছে আদির। সকালে তেমন ঠান্ডা ছিল না বলে স্রেফ একটা ফুলহাতা শার্ট পরে বেরিয়েছিল। কিন্তু এখন ঠান্ডা লাগছে অল্প। ও রাস্তার পাশের বড় বড় গাছগুলো দেখল। নেড়া। কঙ্কালের মতো। আর তার ফাঁক দিয়ে এক ফালি পাতিলেবুর মতো চাঁদ পড়ে রয়েছে আকাশে।

আর ঠিক তখনই গাড়িটাকে দেখল আদি। অফ হোয়াইট রঙের। নিচু। সোনালি প্লেটিঙে লেখা নাম। হালকা নীলচে কাচ। আর সেই গাড়ির সামনের সিটে বসে রয়েছে দিঘি!

সোজা হয়ে বসল আদি। এমন একটা গাড়িতে কার সঙ্গে বসে রয়েছে দিঘি? ওর সেই বয়ফ্রেন্ডটার সঙ্গে কি?

ছেলেটাকে একবার দু'বারই দেখেছে আদি। পাড়াতেই দেখেছে। লম্বা, ফরসা। আলুভাতে মার্কা। নামধাম কিচ্ছু জানে না। তবে দেখলেই বোঝা যায় যে, পয়সাওয়ালা বাপের ছেলে। মনে মনে হাসল আদি। ভালই পাকড়েছে দিঘি। দাদাভাইয়ের মাথা খেয়ে, বদনাম করে এখন ভালই ঘুরে বেড়াচ্ছে দামি গাড়ি চেপে। সত্যিই মেয়েরা পারে বটে। আদির কষ্ট হল দাদাভাইয়ের জন্য। এই মেয়েটার জন্য কী না শুনতে হয়েছে দাদাভাইকে। ওর বাবা-মা তো যা নয় তাই বলেছে। বাবা তো নিজের জুতো ছুঁড়ে মেরেছে পর্যন্ত দাদাভাইকে। তবু দাদাভাই দিঘির বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। সব কিছু সহ্য করে গেছে মুখ বুজে। টুঁ শব্দ পর্যন্ত করেনি। দাদাভাই তো বলতেই পারত। অনেক কথাই বলতে পারত। কিন্তু না, বলেনি। কিচ্ছু বলেনি। সব মুখ বুজে সহ্য করে গেছে। যেন সব দায় ওর। সব দোষ ওর। কলঙ্ক, পুলিশে দেওয়ার ভয়, সব মাথায় নিয়ে চলে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। কেন গিয়েছিল দাদাভাই? কেন মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটাও করেনি? কার জন্য চুপ করে ছিল ও?

দাদাভাই বরাবরই এরকম। জ্ঞান হওয়ার থেকে দাদাভাইকে অমন ভাবেই দেখে এসেছে। আদি ছোটবেলায় দুষ্টুমি করত আর দোষ চাপাত

দাদাভাইয়ের ওপর। সে পাশের বাড়ির কাচ ভাঙা থেকে শুরু করে ফ্রিজ খুলে মিষ্টি চুরি, সবেতেই দাদাভাইয়ের নামটা সামনে এগিয়ে দিত আদি। বাবা আর মা বেদম বকত দাদাভাইকে। ঠাকুরমা সামনে না থাকলে তো চড়চাপ্পড়ও লাগিয়ে দিত। কিন্তু তবু দাদাভাই কিছু বলত না। শুধু মার খাওয়ার পর চিলেকোঠার ঘরে চলে যেত একা। আর আদি দূর থেকে দেখত চিলেকোঠার জানলা দিয়ে দূরে, বহু দূরে তাকিয়ে রয়েছে দাদাভাই। কী দেখত দাদাভাই? বাইরে থেকে তো শুধু আকাশ দেখা যেত। তাহলে আকাশে কি কিছু খুঁজত দাদাভাই? কাকে খুঁজত আকাশে? চিলেকোঠার ঘরটা খুব প্রিয় ছিল দাদাভাইয়ের। সারা ঘরে স্তূপ করা ভাঙা ফার্নিচার, ধুলো-ঢাকা রেডিয়োগ্রাম, পোর্সেলিনের বাসনপত্তর, হরিণের শিং, বহু পুরনো কালো কম্বল ঢাকা ক্যামেরার সরঞ্জাম আর হাজারও কৌটা-কাটির ভেতর নিজের মতো করে একটুখানি জায়গা করে নিয়েছিল দাদাভাই। মনখারাপ হলেই চিলেকোঠায় গিয়ে ওই জায়গাটায় বসে থাকত।

বছরখানেক হল চিলেকোঠা ভেঙে নতুন করে একটা বড় ঘর তৈরি করা হয়েছে। দাদাভাই মৃদু আপত্তি করেছিল। বাবা পাত্তা দেয়নি। আচ্ছা, তাই এবার কি কষ্ট পাওয়ার পর আর চিলেকোঠায় ওই জায়গাটা না পেয়ে একদম বাড়ি ছেড়েই চলে গেছে দাদাভাই?

আদি সন্ধের কলকাতার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আজকাল এত দাদাভাইয়ের কথা মনে পড়ে কেন ওর? যে-মানুষটার সঙ্গে স্কুলজীবন অবধি অত সখ্য ছিল তার থেকে তো স্বেচ্ছায় নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল আদি। তাহলে, এখন দাদাভাই চলে যাওয়ার এতদিন পরে কেন এমন মনখারাপ হচ্ছে আদির? এমন চূড়ান্তভাবে কেন মনে পড়ছে ওই মানুষটাকে? তাহলে কি চলে গিয়েই মানুষ প্রকৃতপক্ষে একদম সরে আসে কাছে? তাহলে কি হারিয়ে ফেলার পরই বোঝা যায় জীবনের আসল গুরুত্ব? মানুষের আসল গুরুত্ব?

ছোটবেলায় না বুঝলেও এইট-নাইন থেকেই আদি বুঝত কেন বাবা-মা পছন্দ করে না দাদাভাইকে। সম্পত্তি। সমস্ত কিছুর মূল ছিল সম্পত্তি। এই বিরাট দোতলা বাড়ি। লোহার যন্ত্রপাতি তৈরির বিশাল কারখানা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবনের কাছে প্রচুর জমিজায়গা। ওই সবই ছিল দাদাভাইয়ের প্রতি বাবা-মায়ের খারাপ ব্যবহারের উৎস। ঠাকুরমার সামনে বাবা-মা কিছু বলতে পারত না দাদাভাইকে। কিন্তু আড়ালে খুব খারাপ-খারাপ কথা বলত বাবা। বাবার মুখ খুব খারাপ। মাঝে মাঝেই বেজন্মা বলে গাল দিত দাদাভাইকে। অবশ্য শুধু দাদাভাইকেই নয়। বাবা রেগে গেলে সবাইকেই এমন অশ্রাব্য গালাগালি করত। তবে দাদাভাইকে খারাপ কথা বলার সময় মাঝে মাঝে মা-ও যোগ দিত। খুব খারাপ লাগত আদির। দাদাভাইয়ের কষ্টের মুখটা দেখলে মনে-মনে দমে যেত ও। তবু মা ভাল রান্না করলে লুকিয়ে লুকিয়ে দাদাভাইকে এনে দিত আদি। দাদাভাই দিতে বারণ করত। বলত, 'অশান্তি হবে, তুই যা আদি।' তবু আদি শুনত না। ছোট থেকেই আদি জেদি, বাবা-মায়ের বকা বা মারের পরোয়া করত না বিন্দুমাত্র।

বাবা মাঝে মাঝে ঠাকুরমার কাছে গিয়েও দরবার করত। বলত, 'এই ছেলেটাকে তুমি পুষছ কেন? একে কোনও হস্টেলে বা অরফ্যানেজে দিয়ে দাও।'

ঠাকুরমা বলত, 'কেন? ও তোদের কী অসুবিধে করছে?'

বাবা গম্ভীরভাবে বলত, 'দাদা যখন মেম বিয়ে করল, তোমার মনে নেই দাদা কী বলেছিল? বলেছিল, ও আর কোনওদিন এ বাড়িতে আসবে না।'

'তো? ও তো আসেওনি!'

'কিন্তু ওর ছেলেকে তুমি নিয়ে এসেছ কেন? আমাদের বংশের মর্যাদা নেই?'

'বংশমর্যাদার কথা তোকে ভাবতে হবে না। এই যে রাত করে মদ খেয়ে ফিরিস, ঘোড়ার লেজে টাকা বাঁধিস, এতে কি বংশের মর্যাদা বাড়ে ভেবেছিস? বেশি সতীপনা দেখাস না। একটা বাচ্চা ছেলে, বাবা-মা নেই, কোথায় তাকে আগলে রাখবি! না, তার সঙ্গে এমন শত্রুতা করিস সবসময়! তোর গায়ে মানুষের রক্ত নেই?'

বাবা তবু গজগজ করত। বলত, 'কোথাকার কে! উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। ম্লেচ্ছ রক্ত গায়ে। এটা তুমি ঠিক করছ না মা।'

'শোন,' ঠাকুরমা তখন সবচেয়ে রাগী গলাটা বের করে আনত। বলত, 'তোকে বেশি দালালি করতে হবে না। তোর তো সম্পত্তির ভাগ নিয়ে চিন্তা! সব ঠিকমতোই ভাগ করে দেব আমি। আর এ নিয়ে একটা কথা বেশি বললে ফুটো পয়সাও পাবি না, বুঝলি? এখন দূর হ এখান থেকে।'

বাবা দূর হলেও, নিজের অ্যাজেন্ডা থেকে সরত না। হয় কী নয় হেনস্থা করত দাদাভাইকে। খারাপ কথা বলত। অপমান করত। আর সামান্য সুযোগ পেলে তো রীতিমতো মারত। এ সবকিছুই মুখ বুজে সহ্য করত দাদাভাই।

গুরুসদয় দত্ত রোডের গৌরের বাড়িটা দুর্গের মতো। একটা বড় গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার পর, আর-একটা বড় গেট। তাতে আবার দু'জন দারোয়ান। গৌর নিজে হাসিখুশি হলেও দারোয়ানগুলো হাসলে বোধহয়

মাইনে কেটে নেয়। গাড়িটা বাড়ির গেট দিয়ে ঢোকার পর আদির সংবিৎ ফিরল।

আদি এর আগেও এই বাড়িতে এসেছে। দারোয়ানগুলো চেনা। আদি গাড়িটাকে বাইরে রেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সামনে। আর ঠিক তখনই ওকে পিছন থেকে ডাকল মল্লার, 'স্যার।'

বিরক্ত হল আদি। ওর আবার কী দরকার? ও তবু ঘুরল, 'কী হয়েছে?'

'স্যার, আপনি ডাইরেক্টর সাহেবকে বলবেন না তো?'

'কী বলব না?'

'এই স্যার গাড়িটার লেট হওয়া, আমায় পুলিশে ধরার ব্যাপারটা! বলবেন না তো?'

আদির এই প্রথম হাসি পেল। মল্লারের ফরসা গোলগাল মুখটা দেখে খারাপ লাগল হঠাৎ। মনে হল, এমন একটা ছেলে এরকম একটা কাজ করে কেন? না, কোনও কাজই ছোট নয়। তবু সমাজের একটা প্রচলিত মাপ তো আছে। সেই মাপে ওর তো অন্যরকম কাজ করার কথা।

আদি তবু হাসল না। ওই সেই ব্যাপার। সাব-অর্ডিনেটকে কখনও চাপমুক্ত করবে না। একটা অদৃশ্য সুতো তোমার নিজের হাতে রাখতেই হবে। ও বলল, 'দেখি। আর আমি কী করব আর করব না তা নিশ্চয়ই তোমায় বলব না।'

'তবু, স্যার... প্লিজ...' মল্লার মুখটা কাঁদো-কাঁদো করল।

আদি আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকে গেল।

বাড়ি নয়, আসলে এটা তিনতলা বাংলো। সামনে খুব সুন্দর লন। তার চারধারে কালো বোল্ডার বসানো রাস্তা। আর রাস্তার একদম শেষে শিল্পীদের প্যালেটের আকারের সুইমিং পুল। এ ছাড়া, গোটা কম্পাউন্ডটাতেই নানারকম গাছ লাগানো। সব কিছুই খুব ভালভাবে মেনটেন্ড। নেপালবাবু

বলে একজন গোটা বাড়ির মেনটেনেন্সটা দেখেন।

কম্পাউন্ডে ঢুকতেই আদি নেপালবাবুর মুখোমুখি হল। লোকটা রোগা। প্রায় সবসময়ই খয়েরি আর হলুদের চেক শার্ট পরে থাকে। টেনশন করা নেপালবাবুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আদিকে দেখেই বলল, 'আরে, সাহেব কখন থেকে ওয়েট করছেন। শরীর তো ঠিক নেই, তাই নানা লোকে আসছে দেখা করতে। আপনার জন্য সামান্য সময় বরাদ্দ করেছেন। তাড়াতাড়ি যান, না হলে বেজায় রেগে যাবেন। এমনিতেই মুড খারাপ।'

মুড খারাপ? আদি একটু দমে গেল। মালিনীরও এখানে আসার কথা ছিল। কিন্তু ও না আসার জন্য যে-ঝাড়টা হবে, সেটা আদিকে একাই খেতে হবে। নিজের ওপরই বিরক্ত হল আদি। কী দরকার ছিল মালিনীর কাজের জন্য ওকে ছেড়ে দেওয়ার? মালিনী কি জানতে পারবে যে, ওর জন্য কত লাঞ্ছনা সহ্য করছে আদি?

দোতলার বৈঠকখানায় বসেছিল গৌর। সাদা কুর্তা পাজামার ওপর শাল জড়ানো। নিখুঁতভাবে দাড়িগোঁফ কামানো। দেখলে মনেই হচ্ছে না যে, অসুস্থ।

আদিকে দেখে গৌর আজ হাসল না। গম্ভীরভাবে উল্টোদিকের সোফাটা দেখিয়ে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'মালিনী কোথায়? আয়ি কিঁউ নেহি?'

'স্যার, হার গ্র্যান্ডমাদার ইজ ভেরি সিক। সো...'

'ও,' গৌর চোয়াল শক্ত করল, 'পেটি অজুহাত। ডিসগাস্টিং। তো, তু কব যা রাহা হ্যায় এয়ারপোর্টমে উস মুম্বই কে হিরোকো লানে?'

'রাতের ফ্লাইট স্যার।'

'হুম,' গৌর ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, 'বারাসতের হাউজিং কমপ্লেক্সের চারজন টাকা ফেরত চেয়েছে। বলছে, এই ডোলড্রামসে সব গন্ডগোল হয়ে যাবে। ওরা ফ্ল্যাট পাবে না। ভেরি ব্যাড সাইন আদি আজ চারজন চাইল। কাল চল্লিশজন চাইবে। তু ক্যায়া উখাড় রাহা হ্যায় বৈঠকে?'

গৌরের রাগ দেখে আদি থতমত খেল, 'স্যার, আমরা লেভেল বেস্ট চেষ্টা করছি। বাট...'

'ইওর বেস্ট ইজ নট গুড এনাফ। আমার ওই হাউজিংটা ঝুলে গেল। চাপাডাঙার ফ্রুট জুস ফ্যাক্টরির জন্য এক্সট্রা জমি নেওয়াটাও ঝুলে গেল। তু ইয়ার ঝক মার রাহা হ্যায় ক্যায়া? সব বহেন...'

'স্যার, পলিটিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে।'

'আই নো। একজনই সবাইকে খেপাচ্ছে। ত্রয়ণ। শালেকা নাম দেখ। তু উসসে মিল।'

'স্যার আমি দেখা করেছি।'

'ঘুটনো মে হ্যায় তেরা দিমাগ? ইনফরমালি মিল। মাল-শাল খাওয়া। ভাল বিছানায় শুইয়ে আন। শরীর গরম, পকেট গরম, ব্যস দেখবি কাম হো গয়া।'

'কিন্তু স্যার...'

'চোপ শালা,' গৌরের মুখ লাল হয়ে উঠেছে, 'কিন্তু কী বে? না পারলে চাকরি ছেড়ে দে। আই উইল নট লিসন এনি এক্সকিউজেজ এনি মোর। পারলে কর, না হলে ইউ নো দ্য ওয়ে আউট। রাইট?'

আদি মাথা নামাল। গৌর প্যাঁচ দিচ্ছে। চাপ দিচ্ছে। কোনায় ঠেলছে ওকে। আদি যেন দেখতে পেল ওর ভেতরেও একটা মল্লার রয়েছে। দেখতে পেল সে টেনশন আর ভয়ে ঘামছে একা। তার মাথার ওপর চাপ বাড়ছে। কর্পোরেট চাপ। যা বস-রা দেয় সাব-অর্ডিনেটদের। আদি বুঝল এই পৃথিবীতে জায়গা খুব দ্রুত বদলে যায়। নিজেকে ওর মল্লারের চেয়ে বেশি কিছু মনে হল না। আদি বুঝল, সামনে বেশ কঠিন সময় আসছে।

১০

গতকাল থেকে ঠান্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। কলকাতায় এমন ঠান্ডা আশা করেনি রাহি। বহুদিন পর কলকাতায় এল ও। স্কুল, বাড়ি আর চাপাডাঙার এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতেই সময় কেটে যায় রাহির। কলকাতায় আসার কথা মনে পড়ে না। বা আরও ভাল করে বললে, ইচ্ছেও হয় না।

আসলে পিছনে বনগাঁ আর সামনে বারাসত। এর বাইরে যেতে হয় না রাহিকে। আর কলকাতার কথা মনে পড়লেই কালো ধোঁয়া, প্যাঁচানো ফ্লাইওভার, অটোর গুঁতোগুতি আর নাক, গলা জ্বালা-পোড়ার কথাই মনে পড়ে ওর। তাই ইচ্ছেই করে না। বাবা-মা বললেও তাই বারবার এড়িয়ে যায়। আর গত কয়েক বছরে যে-ক'বার ঘুরতে গেছে, তখন প্লেনেই গেছে। দমদম থেকে। তাই কলকাতার পেটের মধ্যে আর ঢুকতে হয়নি।

এইবারও কলকাতায় আসার তেমন ইচ্ছে ছিল না ওর। কিন্তু তবু এসেছে দুটো কারণে। এক, হোমি বারবার বলেছে; আর দুই, ত্রয়ণ। ওই ছেলেটা দু'দিন এসে নাকি থাকবে ওদের বাড়িতে। তাই ওকে এড়ানোর জন্যই হোমির কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল রাহি।

বাবা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল খুব। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিল খানিকক্ষণ, তারপর হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তা হঠাৎ, এমন ইচ্ছে হল তোর?'

ত্রয়ণের কথা তো আর বলা যায় না। তাই হোমির কথাই বলেছিল বাবাকে। বলেছিল, 'ওই হোমিটা অনেকদিন থেকে মাথা খাচ্ছে। এবার ক্রিসমাসে ওর মামাতো ভাইয়ের বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে। তাই নাছোড় হয়ে বলছে যে, আমাকেও যেতে হবে। কতবার বললাম যাব না। তবু...'

বাবা বলেছিল, 'কেন যাবি না? অবশ্যই যাবি। আর স্কুলও ছুটি থাকবে। শোন, আনোয়ার শাহ রোডের ওপর আমাদের নতুন ফ্ল্যাটে থাকবি। কাজের লোকজন সব আছে আর চব্বিশ ঘণ্টা গাড়ির বন্দোবস্তও করে দেব। একটু ঘুরে আয়। দেখবি ভাল লাগবে। তুই তো বেরোতেই চাস না একদম।'

সত্যিই, বাড়ি থেকে একটু দূরে কোথাও যেতে হলেই আলস্য লাগে রাহির। কেমন যেন ভয়ও করে। কীসের ভয়, কেন আলস্য, এসব বোঝে না ও। কিন্তু হয়, ঠিক এমনটাই মনে হয় ওর। আর এখন তো আরও একটা কারণ হয়েছে। কিগান। বাড়ি থেকে চলে গেলে তো আর কিগানকে দেখতে পাবে না।

শুধু ত্রয়ণ। ওর জন্যই ও যাচ্ছে। অমন রোগা, সিরিয়াস দেখতে ছেলেটা যে কেমন তা একমাত্র রাহি জানে। ইস, নিজের সেই বছর তিনেক আগের ভুলটার জন্য সারা জীবন ছেলেটার সামনে ওকে গুটিয়ে থাকতে হবে। মানুষের একটা ভুল যে জীবনে তাকে কতটা অসহায় করে দেয়!

রাহি কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় যাবে শুনে দীপার মুখটা একটু কালো হয়ে গিয়েছিল। আসলে দীপার তো রাহি ছাড়া আর কোনও বন্ধু নেই। বাড়িতে এমনিতেই চমকের ব্যবহারের জন্য দীপা গুটিয়ে থাকে। এ নিয়ে দীপাকে হাজারবার বুঝিয়েছে রাহি, তবু দীপা বোঝেনি। রাহি বলেছে, 'তুই এমন গুটিয়ে থাকিস কেন রে দীপা? দাদা যা করে তার দায় দাদার। তোর নয়। তাহলে এমন ভয় পেয়ে থাকিস কেন?'

'না রে, অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে হলে হয়তো তোর দাদা এমন থাকত না।'

'হোয়াট রাবিশ!' রাহি রাগ করে বলেছিল, 'বোকার মতো কথা বলিস না। দাদা তোকে প্রায় জোর করে তুলে এনে বিয়ে করেছে। আর অন্য মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে কিছু হত না, বলাটা খুব পাতি শোনাচ্ছে।'

'না রে রাহি, স্ত্রীদের তো একটা গুণ থাকে। আমার বোধহয় সেটা নেই। কিন্তু দেখ, আমি তো চেষ্টা করি। ওর সব কথা শুনি, সাধ্যমতো যা চায়, যেমনভাবে চায় তাই দিই। তবু আমি ওকে শোধরাতে পারি না। আমি খুব খারাপ!'

রাহি আর কিছু বলেনি। কোনও কোনও মানুষ, নিজের জীবনের কন্ট্রোল নিজে না নিয়ে, শুধু 'আমি খুব খারাপ' এই কথাটা ভেবে একটা বর্ম তৈরি করে আর কষ্টের বিলাস দেখায়। দীপার মধ্যে খারাপ গুণ বলতে শুধু এটুকু। তবে এটুকুও যে দীপা বলে তা কেবল রাহিকেই। বাবা, মা বা দাদার সামনে তো প্রায় কথাই বলে না।

দীপা যখন শুনেছিল যে, রাহি কলকাতা চলে যাচ্ছে, তখন খুব ধীর গলায় বলেছিল, 'তুই চলে যাবি? ঘুরতে?'

রাহি দেখেছিল যে, দীপার চোখ দুটো ছলছল করছে। রাহি হেসে বলেছিল, 'আরে, তাতে তুই এমন আপসেট হচ্ছিস কেন? জাস্ট চার-পাঁচ দিন তো!'

'না, মানে...' দীপা চুপ করে গিয়েছিল। তারপর সামান্য দ্বিধার সঙ্গে বলেছিল, 'দেখ, ত্রয়ণকে আমি আসতে বারণই করেছিলাম। কিন্তু ও এমন নাছোড়বান্দা...'

'মানে?' রাহি সচকিত হয়ে উঠেছিল।

'না না,' দীপা বুঝেছিল যে, কথাটা রাহির ভাল লাগেনি। ও বলেছিল, 'আসলে আমি জানি যে, তুই ওকে পছন্দ করিস না। আমিও করি না। সবসময় বড় বড় কথা! একদম ভাল লাগে না। সত্যি-মানুষটাকে লুকিয়ে ও নিজের যে-ইমেজটা প্রোজেক্ট করে তার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। তবু, কী করব বল? আত্মীয়রাই তো বিষ হয়!'

রাহি পরিস্থিতিটা সহজ করার জন্য বলেছিল, 'আরে ছাড় তো। খালি বাজে কথা ভাবিস না।'

'দেখ, হয়তো ও তোকে পছন্দ করে। কিন্তু, সে তো তোকে অনেকেই পছন্দ করে। তাই ওকে আজ বলেওছি। আর ও বলে...'

'বলেছিস মানে?' আঁতকে উঠেছিল রাহি। ত্রয়ণকে দীপা এসব বলেছে? উল্টে ত্রয়ণ আবার সব বলে দেয়নি তো? ত্রয়ণের কাছে যে ওর গোপন চাবিটা রয়েছে।

দীপা বলেছিল, 'ও বলে, আমি নাকি ভুল ভাবছি। ওর তোর প্রতি ইন্টারেস্ট নেই। ও নাকি দেশের কাজের জন্য নিজেকে তৈরি করছে। ওর জীবনে নাকি প্রেমের কোনও জায়গা নেই।'

'তাই!' ভুরু তুলে বলেছিল রাহি।

'আরও বলেছে যে, তুই নাকি ওর টাইপ নোস। তুই বড্ড শ্যালো। তাই...'

'শ্যালো!' রাহি ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল। শয়তান ছেলে! সবার সামনে এমন করছে যেন কত সাধুপুরুষ! একবার যদি বাবাকে বলে দেয় না যে, ত্রয়ণ কী করতে চায় ওর সঙ্গে, তাহলে ত্রয়ণের বারোটা বাজতে সময় লাগবে না একটুও। আর ও বুঝবে কত ধানে কত চাল!

কিন্তু এক মুহূর্তেই এই চিন্তাটা মাথা থেকে চলে গিয়েছিল রাহির। কারণ ত্রয়ণের বারোটা বাজাতে গেলে ত্রয়ণও ওর বারোটা বাজিয়ে দেবে। রাহি যে ত্রয়ণের কাছে বদ্ধ! তাই তো ত্রয়ণ বলেছিল, 'তুমি আমারই থাকবে। তবে আমি জোর করব না। যেদিন তুমি রেডি হবে, সেদিনই আমি রাজি।'

শয়তান একটা! আস্ত শয়তান। রাজি! কীসের জন্য রাজি? আর রাজি না হলে কি সবাইকে দেখিয়ে দেবে সব? রাহি মাঝে মাঝে বোঝে না কী করবে! কোথায় যাবে! কার কাছে গেলে এই শাপমুক্তি হবে! একটা ভুলের জন্য কি ওকে সারা জীবন কষ্ট পেতে হবে? ভীষণ দমবন্ধ লাগে রাহির। মনে হয় যেন অক্টোপাস আটকে ধরেছে ওকে। কোথায় গেলে যে নিস্তার পাবে ও!

দীপা বলেছিল, 'ছাড় তো ওর কথা। তুই চলে গেলে আমার এত খালিখালি লাগে!'

রাহি হেসে বলেছিল, 'তাহলে তুইও চল আমার সঙ্গে। থাকবি, ঘুরবি। খুব মজা হবে।'

'আমি!' মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল দীপার।

নিজের ভুলটা চট করে বুঝতে পেরেছিল রাহি। তাই তো! দীপা যাবে কী করে? মা তো যেতেই দেয় না কোথাও দীপাকে! এই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না রাহি। ওর শান্ত, নিরীহ, ভালমানুষ মা কেন যে দীপার বাইরে যাওয়া নিয়ে এতটা পজেসিভ হয়ে ওঠে, তার কোনও ব্যাখ্যা পায় না ও। শুধু দেখে যে, দীপার বাইরে যাওয়ার কথা উঠলেই মা গোমড়া হয়ে যায়। বলে, 'ঠিক আছে। যাক, ঘুরে আসুক। ঝিগিরি করার জন্য বাড়িতে তো আমি রইলামই।'

ঝিগিরি! মায়ের কথা শুনে অবাক হয় রাহি। মা কিন্তু বাড়িতে কুটো ভেঙে দুটো করতে দেয় না দীপাকে। সবসময় আগলে রাখে। বলে, 'ঠাকুর, চাকর আছে কী করতে?' বলে, 'হাতের এত সুন্দর গড়নটা নষ্ট হয়ে যাবে যে!'

সেই মা-ই যখন দীপা বেরোবে বললে এমন বলে, তখন খুব অবাক হয়ে যায় রাহি। কেন এমন করে মা? দীপা বাপের বাড়িতেও যেতে পারে না তেমন। গেলেও এক রাতের বেশি থাকতে পারে না। কোনও কেনাকাটা করতে গেলে মা নিয়ে যায় সঙ্গে করে। এমনকী বারাসতের বিউটি পার্লার থেকে লোককে গাড়ি করে নিয়ে আসা হয়, দীপার যখন দরকার পড়ে তখন।

দীপার অমন কালো হয়ে যাওয়া মুখটা দেখে খুব কষ্ট লেগেছিল রাহির। ও ব্যাপারটাকে সহজ করতে বলেছিল, 'অবশ্য বোরও হয়ে যেতে পারিস তুই। আমি আর হোমি থাকব। "হেল্প আর্থ"-এর জন্য ব্রোশিওরের ডিজাইন দেখতে হবে। তারপর হোমির কাজিন গুন্ডার বাড়িতে ক্রিসমাসের নেমন্তন্ন আছে। তোর ভাল লাগবে না।'

দীপা বিষণ্ণ গলায় বলেছিল, 'জানি, আমি বোর হয়ে যাব। যখন তোর বিয়ে হবে, দেখবি তখন তোকেও কত জিনিসে বাধ্য হয়ে বোর হতে হচ্ছে।'

বিয়ে! চিন্তা করলেই গায়ে জ্বর আসে রাহির। বুকে কষ্ট হয়। মনে হয় বিয়ে তো করতেই পারে। কিন্তু যাকে ইচ্ছে তাকে কি বিয়ে করতে পারবে? সে তো পাত্তাই দেয় না!

কিগান এত চুপচাপ থাকে যে, মনে হয় নিজেকে যেন লোহার পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রেখেছে। একটা মানুষ এতটা একা থাকতে পারে দেখে মাঝে মাঝে অবাক লাগে রাহির। না, একা মানে একক নয়। ফ্যাক্টরি আর চাপাডাঙার অনেক মানুষই ঘিরে থাকে কিগানকে। তবু, তার ভেতরেও কোথায় যেন মানুষটাকে একা লাগে রাহির। মনে হয়, সবাই যেন ছেড়ে চলে গেছে কিগানকে। মনে হয় জীবনের থেকে বোধহয় আর কিছু পাওয়ার নেই ওর।

রাহি নিজে নিজেই কিগানের কাছে, ওর ঘরে যায়। প্রথম প্রথম কিগান সামান্য আপত্তি করলেও, পরে বুঝেছে যে, রাহিকে বলে লাভ নেই। তখন বলেছে, 'তুই এত পাগলি কেন রে রাহি?'

'সে আমি কী জানি? আর তুমি এত একাচোরা কেন? আমি কি তোমায় টিমটি কাটছি যে, বিরক্ত হচ্ছ? মনে রেখো, যে-ফ্যাক্টরিতে চাকরি করো, সেটা কিন্তু আমাদের জমিতেই তৈরি!'

উত্তরে কিগান আর কথা বাড়ায়নি। শুধু হেসেছে।

কিগানের ঘরে গিয়ে ওর বই নাড়াচাড়া করে রাহি। মিউজিক সিস্টেমে গান শোনে। টুকটাক এটা-ওটা গুছিয়ে দেয়। কখনও বাড়িতে নতুন কিছু রান্না হলে গিয়ে দিয়ে আসে।

মাঝে মাঝে রাহি ভাবে যে, কিগান ওকে পছন্দ করে। কিন্তু তারপর হঠাৎই আবার কোনও কোনও সময় এমন চুপ করে যায়, এমন নির্লিপ্ত হয়ে যায় যে, রাহি ঘাবড়ে যায়। মনে হয় কিগান যেন ওকে বহু দূরে ঠেলে দিচ্ছে। যেন কিগান ওকে চেনেই না।

একবার তো রাহি সাহস করে জিজ্ঞেসও করেছিল কিগানকে। বলেছিল, 'আচ্ছা, মাঝে মাঝে তোমার কী হয় গো কিগানদা? এমন চুপ করে যাও কেন? কোনও কথা বলো না কেন? বোঝো না যে, তোমার আশপাশের মানুষেরা এতে কষ্ট পায়? অপমানিত বোধ করে!'

কিগান বিহ্বল হয়ে বলেছিল, 'আমি কথা না বললে লোকে কষ্ট পায়? অপমান বোধ করে? কেন রে? আমি কে এমন মানুষ?'

'তুমি? তুমি...' রাহির রাগ হয়েছিল খুব। মনে হয়েছিল কিগানের চুলগুলোকে দু'হাতের মধ্যে ধরে নিয়ে খুব করে ঝাঁকায়। ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে একদম টেনে নেয় বুকের মধ্যে। দাঁতের দাগ বসিয়ে দেয় ঠোঁটে। ওর বুকের ওই তিনটে লাল তিলে। মনে হয়েছিল এমন করে শাস্তি দেয়, যেন আর কোনওদিন ওর প্রতি অমনোযোগী না হতে পারে কিগান।

কিগান হেসে বলেছিল, 'দুর পাগলি। স্কুলে পড়াতে পড়াতে তুই সবাইকে নিজের ছাত্র ভাবিস, না? শোন, আমি তোর চেয়ে অনেক বড়। প্রায় বুড়ো। আর বুড়োরা একটু একাই থাকে। বুঝেছিস?'

'এঃ, বুড়ো! তুমি তো থার্টি প্লি,' রাগ দেখিয়েছিল রাহি, 'জানো আমি কত? আমার বয়স কত ধারণা আছে তোমার?'

কিগান মুচকি হেসে বলেছিল, 'কত হবে? পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন!'

'কী? আমায় অমন লাগে? আমি অত বুড়ি?'

কিগান বলেছিল, 'যা পাকা পাকা কথা বলছিস তাতে তো আরও বেশি বলা উচিত ছিল। আমি তো কমই বললাম।'

'আমি চব্বিশ। তোমার চেয়ে মাত্র ন' বছরের ছোট।'

'তুই আমার বয়স জানলি কোথা থেকে রে?'

'তোমার একটা বইয়ের ভেতরে লেখা আছে। নাম আর বছর। জানো, নয় বছরটা কোনও ডিফারেন্সই নয়। জানো আমার বাবা-মায়ের ডিফারেন্স একুশ বছর। তাই বলছিলাম আমাদের ন' বছরটা...'

কিগান আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। আর রাহি বুঝেছিল যে, নিজের অজান্তেই ও অন্য একটা জায়গায় পা দিয়ে ফেলেছে।

এরপর বেশ কিছুদিন যায়নি ও কিগানের বাড়িতে। ভেতরে ভেতরে একটা লজ্জা আর সঙ্কোচ একদম আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল ওকে।

কিন্তু কিগানই তারপর রাহিকে রাস্তায় ধরেছিল একদিন। বলেছিল, 'কী দিদিমণি, তোদের বাড়িতে কি আর ভাল রান্নাবান্না হচ্ছে না? নাকি আমায় দিলে তোর ভাগে কম পড়ে যাবে?'

রাহি বলেছিল, 'কম যে পড়বে না তা তোমার চেয়ে ভাল আর কে জানে!'

কিগান হেসেছিল। তারপর বলেছিল, 'মেয়েরা বড্ড রাগ করে, তাই না রে?'

রাহি গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'আর ছেলেরা? সবার মাথায় বরফের ফ্যাক্টরি আছে, না? অসহ্য। ছেলেগুলো সব অসহ্য!'

কিগান হেসে বলেছিল, 'দাঁড়া, তোর বিয়ের সময় তোর বরকে বলব এই কথাটা।'

রাহির ইচ্ছে হয়েছিল বলতে যে, 'বললাম তো', আমিই বললাম তো আমার বরকে।' কিন্তু বলেনি। বরং গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'বিয়ে নিয়ে ইয়ার্কি মারাটা উনিশশো ষাটের পর একটু ডেটেড হয়ে গেছে, বুঝলে?'

তারপর থেকে কিগানের সঙ্গে আবার সহজ হয়ে গিয়েছে সম্পর্কটা। এই তো কলকাতায় আসবে শুনে কিগান ওকে বলেছিল গিটারের জন্য চার সেট তার কিনে আনতে। টাকাও দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তখন টাকাটা নিলেও এখান থেকে গিয়ে সেটা ফেরত দিয়ে দেবে ও। এটা ও নিজেই কিনে দিতে পারে।

'কী রে? এমনভাবে কী ভাবছিস তুই?' হোমির প্রশ্নে ফিরে তাকাল রাহি।

এই ঠান্ডাতেও সন্ধের মুখে স্নান করেছে হোমি। জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে গেলেও মাথার চুলগুলো ভিজে ভিজে লাগছে। যতই গরম জলে স্নান করুক, তবু হঠাৎ করে নতুন জায়গায় এমন করে স্নান করাটা ঠিক নয়। বলেওছিল কথাটা হোমিকে। কিন্তু মেয়েটা শুনলে তো!

রাহি বলল, 'দেখ, স্নানটা সেই করলি! জ্বর হলে কিন্তু কেলেঙ্কারি হবে।'

'দূর,' হোমি সামনের কাচের টেবিলের ওপর থেকে কফির কাপটা তুলে নিয়ে হাসল। তারপর চুমুক দিয়ে বলল, 'তোদের এই রান্নার লোকটা কিন্তু ব্যাপক কফি বানায়। তা এমন বিরহিণী রাধিকা হয়ে জানলা দিয়ে কী দেখছিস?'

'বিরহিণী!' রাহি হাসল, 'এত উঁচু থেকে শহরটাকে কী অদ্ভুত লাগে, দেখ! মনে হচ্ছে অসংখ্য জোনাকি নেমে এসেছে মাটিতে!'

'দেখ রাহি, কেস কী বল তো? ছেলেটা কে?'

'মানে?' রাহি জানলার পাশের চেয়ারটা থেকে উঠল, 'কী যা তা বলছিস।'

হোমি হাসল, 'প্রেমে পড়লে সবাই এত সাবজেক্টিভলি পৃথিবীকে দেখে যে, মনে হয় আর্ট ফিল্মের ডায়ালগ শুনছি!'

'ওফ, তুই থামবি?'

'থামব, তবে যদি তাড়াতাড়ি ড্রেস করে নিস, গুন্ডার বাড়িতে সাতটার ভেতর পৌঁছতে হবে। তাড়াতাড়ি কর না।'

'ওকে, জাস্ট পাঁচ মিনিট লাগবে। কোনও প্রবলেম নেই।' রাহি ভিতরের ঘরের দিকে চলে গেল। সাজগোজ করতে সত্যি রাহির খুব একটা সময় লাগে না।

রাহির ছোটবেলা থেকেই উঁচু বাড়িতে থাকার খুব ইচ্ছে ছিল। তাই ওর কথামতোই আনোয়ার শাহ রোডের ওপর এই এত্ত উঁচুতে ফ্ল্যাটটা কিনেছে বাবা। সবাই বারণ করেছিল বাবাকে। বলেছিল, 'অত দূরে কেন ফ্ল্যাট কিনছেন?'

কিন্তু বাবা কারও বারণ শোনেনি। বরং বলেছিল, 'রাহির ইচ্ছে হয়েছে, সেটাই তো বড়। আর ইনভেস্টমেন্টও হয়ে থাকল। সমস্যা কোথায়?'

ফ্ল্যাটটা দেখেই ভাল লেগে গিয়েছিল রাহির। চব্বিশ তলার ওপর। জানলা খুললে মনে হয় কে যেন কলকাতাকে সামনে মাদুরের মতো বিছিয়ে রেখেছে। শহিদ মিনারটাও আবছা দেখা যায়! এত হাওয়া যে, বেডরুমে দেওয়াল জোড়া জানলাটা খুলে ওর মনে হচ্ছিল ছোট্ট এক কুচি কাগজের মতো ও হয়তো ভেসেই যাবে কোথাও।

রাহিকে আর কিছু বলতে হয়নি। বাবা বলেছিল, 'এই নে। এই তোর চাবি।'

কী যে আনন্দ হয়েছিল রাহির! কী যে মুগ্ধ হয়েছিল ও! মনে হয়েছিল মাসের অর্ধেকটা এখানেই এসে থাকবে। আর মনের সুখে কলকাতায় ঘুরবে। কিন্তু এই কিগান এসেই তো সব গন্ডগোলটা বাধাল!

কলকাতায় যে আর আসতেই ইচ্ছে করে না ওর। চাপাডাঙা ছেড়ে যে নড়তেই ইচ্ছে করে না। কেবল মনে হয় কলকাতায় চলে গেলে তো আর কিগানকে দেখতে পাবে না।

বাবা তো একদিন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেছিল, 'তুই যে বললি কখনও কখনও ওই ফ্ল্যাটটায় গিয়ে থাকবি। যাস না তো!'

রাহি আদুরে গলায় বলেছিল, 'তুমি চাও আমি চলে যাই?'

'আরে, না না,' বাবা অপ্রস্তুত হয়েছিল, 'তাই বললাম নাকি? আসলে তোর পছন্দ হয়েছিল তো, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

মা পাশ থেকে বলেছিল, 'তোমার কোনও বিবেচনা নেই। পাগলি মেয়েটার কি আর মাথার ঠিক আছে? ওর কথায় নেচে কেউ কি অত টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কেনে? এই তোমার বুদ্ধি!'

বাবা বলেছিল, 'মেয়ের ইচ্ছেটার চেয়ে কি টাকা দামি?'

'মেয়েকে নিয়ে তোমার চিরটাকাল আদিখ্যেতার স্বভাব।' মা পান সাজতে সাজতে বলেছিল।

বাবা সামান্য হেসে বলেছিল, 'হবে না? মেয়েটা যে আমার।'

শোওয়ার ঘরের বড় আয়নায় জামাকাপড় পাল্টানোর মাঝে নিজেকে একবার দেখল রাহি। শরীরে কি মেদ কিছুটা কমেছে? খুব চেষ্টা করছে আজকাল যাতে একটু হালকা হয় ও। কিন্তু তবু হচ্ছে না। জল খেলেও যেন ওর ওজন বেড়ে যায়! মা বলে, এমন ফরসা, গোলগালই নাকি ভাল। কিন্তু নিজেকে রাহির মাঝে মাঝে তুলোর বস্তার মতো লাগে। এতটা গোলগাল হওয়াটাও কাজের কথা নয়। টিভিতে বিকিনি পরা মেয়েদের দুর্গম খাঁজওয়ালা শরীর দেখলে বড্ড কষ্ট হয় রাহির। আর তার চেয়েও কষ্ট হয় যখন মনে মনে ও নিজেকে কিগানের পাশে কল্পনা করে। অমন সাঁতারুর মতো একটা মানুষের পাশে নিজেকে খুব বেমানান লাগে ওর। মনে হয় এমন ফিগারের জন্যই কি কিগান ওর দিকে ফিরে তাকায় না?

আজকাল ডায়েট করার চেষ্টা করছে রাহি। কম খায়। হাঁটে। এমনকী ঘরের ভেতর স্কিপিংও করে। কিন্তু তিন-চারদিন করার পরই কেমন যেন একটা দুর্বোধ্য টানে গুচ্ছের কাজুবাদাম, নারকেল, ঘিয়ে ভাজা লুচি খেয়ে ফেলে, আর সমস্ত কিছুই আবার যেমন ছিল তেমন হয়ে যায়। প্রবৃত্তি! প্রবৃত্তিকে সামলানো যে কী কঠিন তা বুঝতে পারে রাহি।

আজও শুধু ব্রা আর প্যান্টি পরে সামান্য সময় নিয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। নাহ্, ফ্যাট, প্রোটিনের বাড়াবাড়ি একটুও কমেনি। থাইতে স্ট্রেচমার্কস এসেছে। জঘন্য। একদম জঘন্য। নিজের ওপর খুব রাগ হল রাহির। একটুও সংযম নেই ওর। থাকলে এমন দুর্ভিক্ষের কারণ ধরনের চেহারা হত না!

নিজেকে দেখলে আরও কষ্ট বাড়বে। তাই চটপট একটা জিন্‌স, টি-শার্ট আর জ্যাকেট চাপিয়ে নিল রাহি। একটু ঢিলেঢালা কাপড় পরলে মোটা ব্যাপারটা একটু কম চোখে পড়ে।

কলকাতায় এলে জিন্‌স, টি-শার্ট পরতে পারে রাহি। চাপাডাঙায় পারে না। বা বলা ভাল, মা পরতে দেয় না। বলে, লোকে কী বলবে! মায়ের খুব লোকেদের কথার ভয়। হ্যাঁ, সামান্য গ্রাম্য জায়গায়, এ ওর হাঁড়ির খোঁজখবর বেশি নেয়। নিন্দামন্দও বেশি হয়। তা বলে মানুষ, যা পরতে ইচ্ছে হয়, তা পরবে না? আর টি-শার্ট, প্যান্ট তো খুব ভদ্র পোশাক। কিন্তু মাকে কে বোঝাবে! শাড়ির প্রতি এই অন্ধ আনুগত্যের কোনও ব্যাখ্যা ঠিক খুঁজে পায় না রাহি। তবে এই নিয়ে বিশেষ ঝঞ্ঝাট করে না। মায়ের কথামতোই শাড়ি পরে। আর ইচ্ছে হলে বড়জোর চুড়িদার পরে।

রাহি ঘর থেকে বেরোতেই ছটফট করে উঠল হোমি, 'এই তোর পাঁচ মিনিট হল? রাহি, কাকিমা বহুত রাগ করছে, বলছে, আর আসতে হবে না। এখানেই রাতের খাবারটা গুন্ডাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে।'

'সরি সরি,' রাহি ব্যাগটা সোফার ওপর থেকে তুলে বলল, 'চল, চল। তবে যাদবপুর তো, খুব একটা সময় লাগবে না।'

'নাঃ, তোকে বলেছে! আজ পঁচিশে ডিসেম্বর। সামনেই বিশাল মল। তার জ্যাম, যাদবপুর থানার জ্যাম, এইট বি-র জ্যাম। পুরো ঝাড় কেস একদম। তুই এত লেট করলি না!'

রাহি বলল, 'আমি দেরি করলাম? না, স্নান করতে গিয়ে তুই দেরি করলি?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, চল।' হোমি প্রায় ধাক্কিয়ে রাহিকে বের করে আনল ঘর থেকে।

কলকাতায়, বাবার এক বন্ধু, নিজের একটা গাড়ি চব্বিশ ঘণ্টা ব্যবহারের জন্য দিয়ে রেখেছে রাহিকে। তাই রাস্তা থেকে ট্যাক্সি ধরার ঝামেলা নেই।

গাড়িতে বসে রাহি বলল, 'কোথাও থেকে মিষ্টি কিনে নিতে হবে। প্রথমবার তোর কাকুর বাড়ি যাচ্ছি তো!'

'ধুর, ফর্মালিটি বাদ দে তো!'

'না, ওটা ভদ্রতা। মিষ্টির দোকান দেখলে গাড়ি থামাস তো।'

'আমার কাকু-কাকিমা কিন্তু এমন কিছুতে বিশ্বাস করে না। ওরা শুধু আমরা গেলেই খুশি হবে। আজ ওই যিশুর জন্মদিনটা ওদের কাছে খুব আনন্দের। কাকু-কাকিমা সাধ্যমতো চেষ্টা করে এই ক্রিসমাসের সন্ধেটা ভাল করে কাটাতে। আমার কাকিমাকে জাস্ট একবার দেখবি। কাকুকে বিয়ে করলেও বছরের এই দিনটা এলেই কাকিমা বাচ্চা মেয়ের মতো ক্রিসমাস পালন করে।'

গুন্ডা বলে ছেলেটাকে দেখেছে রাহি। ইয়া মোটা চেহারা। দাড়িগোঁফ কামানো। আর খুব ঘামে। ছেলেটা প্রচুর কথাও বলে, যেগুলো আপাতপক্ষে রূঢ় শোনালেও আসলে ছেলেটা যে ভাল সেটাই প্রমাণ করে। কারণ, অমন সহজ-সরলভাবে কথা বলতে অনেকেই ভয় পায়, পাছে অন্যের কাছে নিজের ভাল মানুষের ছবিটা বদলে যায়! কিন্তু গুন্ডা অতশত কিছু ভাবে না। বরং নিজের ভাল-খারাপের তোয়াক্কা না করেই সত্যিগুলো স্পষ্ট করে বলে দেয়।

সারা বছর সাধারণভাবে কাটালেও এই পঁচিশে ডিসেম্বর দিনটায় ওরা আনন্দ করে। কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করে। কেক কাটে। গুন্ডার ভাই টমটম গিটার বাজিয়ে গানও গায়। তারপর সবাই রাতে ডিনার করে।

শুনেছে, এই সবই হোমির কাছে শুনেছে রাহি। হোমির বাবা-মা চায় না যে, হোমি ওর কাকার সঙ্গে সম্পর্ক রাখুক। হোমির কাকা খ্রিস্টান মেয়েকে বিয়ে করেছে বলেই ওরা এমন করে। কিন্তু হোমি কোনওদিন কারও কথা শোনে না, বিশেষ করে সেটাকে যদি অন্যায় মনে করে। আর এই স্বভাবের জন্যই তো 'হেল্প আর্থ'কে নিয়ে সব বাধা কাটিয়ে মুভ করতে পারে ও।

কাকাকে বাড়ি থেকে বের করা নিয়ে নিজের ঠাকুরদার সঙ্গে প্রায়ই তর্কাতর্কি করে হোমি। বলে এটা জঘন্য অন্যায়। তাই এটার একটা প্রতিকার ও নিজের মতো করে করবে। তবে শুধু অন্যায়ের প্রতিকারই নয়, গুন্ডাকেও খুব ভালবাসে হোমি। এমনকী বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রায় লড়াই করে গুন্ডাকে মাঝে মাঝে চাপাডাঙায় নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখে ও। হোমির বাবা-মাও, কেন কে জানে, গুন্ডাকে সরাতে পারে না।

গাড়িটা থেকে নামতে নামতে একটু অস্বস্তি লাগল রাহির। আসলে

কোনওদিন আসেনি তো। তার ওপর ওরা তো সরাসরি নেমন্তন্নও করেনি। কে জানে ওরাই নেমন্তন্ন করেছে, না হোমি নিজে আগ বাড়িয়ে ওকে নিয়ে আসবে বলেছে!

গলিটা সামান্য অন্ধকার। এখন কলকাতার অনেক জায়গাতেই বড় বড় সাদা রঙের আলো লাগানো হয়েছে। এ পাড়াতেও হয়েছে, কিন্তু কোনও কারণবশত এখানের দু'-একটা আলো জ্বলছে না।

গলির পাশ দিয়ে আরও একটা সরু গলি চলে গিয়েছে। হোমির পিছন পিছন সেটাতে ঢুকল ও। এই গলিটা যথেষ্ট স্যাঁতসেঁতে। পায়ের তলায় ইট পাতা। একটু এদিক-ওদিক হলেই কাঁধ ঘেঁষে যাচ্ছে পাশের দেওয়ালে। রাহির মনে হল, গুন্ডা এই গলি দিয়ে কীভাবে রোজ বাড়িতে ঢোকে আর বেরোয়?

গলিটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা কাঠের দরজা। তবে দরজাটা বেশ ভাঙাচোরা। আর তার গায়ে একটা দুর্বল লেটার বক্স ঝুলছে। দরজাটার মাথায় একটা চল্লিশ পাওয়ারের বাল্‌ব জন্ডিস রোগীর চোখের মতো জ্বলছে। ময়লা আলোয় জায়গাটাকে আরও যেন ময়লা লাগছে। এখানে হোমির কাকারা থাকে?

হোমি দরজার কড়া ধরে খুব জোরে নাড়া দিল। এই রে! দরজাসুদ্ধ খুলে পড়বে না তো! ভয় লাগল রাহির। দরজাটার যে খুব খারাপ অবস্থা!

গুন্ডাই দরজা খুলল। আর রাহি ওই দুর্বল আলোতেই দেখল গুন্ডা একটা পাতলা গোল গলার টি-শার্ট পরে রয়েছে। একটু হাঁফাচ্ছেও যেন।

হোমি ভেতরে ঢুকে বলল, 'কী রে গুন্ডা, তোর ঠান্ডা লাগছে না?'

'ঠান্ডা!' গুন্ডা এমন গলায় বলল যেন এখন জ্যৈষ্ঠের দুপুর।

'আজ তো দারুণ ঠান্ডা পড়েছে। তোর মালুম হচ্ছে না?'

'সত্যি দিদি, তুমি কী যে বলো না!' গুন্ডা সারা শরীর খেলিয়ে হাসল। তারপর নিজের পেটের ওপর চাপড় মেরে বলল, 'ঠান্ডার সাধ্য আছে আমার এই চাইনিজ ওয়ালকে টপকায়?'

বাইরেটা এমন অগোছালো হলেও ঘরের ভেতরে ঢুকে ভাল লাগল রাহির। ওই দরজা থেকে একটা ছোট্ট উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়েছে রাহিদের। উঠোনের এক পাশে ছেড়ে রাখা কিছু জুতোর পাশে ওরাও জুতো খুলেছিল। ঘরে ঢুকে সেইসব জুতোর মালিকদের দেখল ও।

বেশি নয়, ছ'জন। তিনটে মেয়ে আর দুটো ছেলে। আর ঘরের এক কোণে গিটার কোলে নিয়ে বসে রয়েছে একটা ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে। এটা নিশ্চয়ই টমটম।

হোমির গলা পেয়ে ঘরের পর্দা সরিয়ে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাও ঘরে ঢুকল। হোমি বলল, 'কাকু, এই দেখো কাকে এনেছি আমার সঙ্গে। রাহি। আয় রাহি, এই আমার কাকু জয়ন্ত রায় আর কাকিমা শিবানী এমিলিয়া রায়।'

শিবানীকে দেখে একটু অবাক হল রাহি। একদম ওর মায়ের মতো। শাড়ি, শাঁখা, সিঁদুর সব একরকম। তবে যে হোমি বলেছিল ক্রিশ্চিয়ান? নিজেকে সামলে নিল রাহি। ক্রিশ্চিয়ান মানেই কি আর বিদেশি? অনেক বাঙালি ক্রিশ্চিয়ানও তো থাকে। শিবানীকাকিমা নিশ্চয়ই তেমন একজন।

কাকিমা হেসে বলল, 'বোসো রাহি। হোমি এলেই তোমার কথা বলে। তাই ভাবলাম একবার নেমন্তন্ন করি তোমায়। না হলে তো আর আমাদের বাড়িতে তুমি আসবে না।'

'না না, তা কেন?' রাহি হাসল, 'আসলে অত দূরে থাকি তো তাই চট করে আসা হয় না। কিন্তু দেখুন, আমি এলাম তো!'

কাকু বলল, 'বাড়িতে অন্যরা আজ তেমন নেই। আমরাই ক'জন আছি। তো, তোমরা গল্প করো। আমরা বুড়ো-বুড়ি একটু পরে আসছি।'

কাকুরা চলে যেতেই গুন্ডা পুরনো কাঠের সোফাটায় খুব সুন্দর দেখতে একটা ছেলে আর সামান্য চাপা রঙের মেয়ের মধ্যে জোর করে গুঁজে দিল নিজেকে। তারপর রাহির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই রাহিদি, এরা সব আমার বন্ধু। ও হচ্ছে জয়। ওর পাশে স্নেহা, তার পাশে রূপ। আর আমার বাঁ দিকে এইজনের নাম দিঘি আর ডান দিকের এই কার্তিক ঠাকুরটি হল আর্য।'

সবাইকে দেখে ভাল লাগল রাহির। অল্পবয়সি সবাই। ওর চেয়ে সামান্য ছোট।

আর্য বলল, 'তোমার নামটা খুব আনকমন। রাহি। গ্রেট। গুন্ডার কাছে শুনেছি, তোমাদের নাকি র‍্যাঞ্চ আছে? তোমরা নাকি সেখানে থাকো?'

'র‍্যাঞ্চ!' হাসল রাহি, 'তেমন কিছু নয়।'

গুন্ডা বলল, 'না রে আর্য, গেলে দেখতে পাবি। ব্যাপক ব্যাপার!'

আর্য বলল, 'নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু তোর সঙ্গে নয়। তুই একটা মোটা অসভ্য।'

'মানে?' গুন্ডা এমন করে ঘুরল যে, দিঘি উফ করে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে পুরনো কাঠের সোফাটাও আর্তনাদ করল।

'মানে, আমার আর দিঘির মধ্যে তুই এমন অসভ্যের মতো ঢুকে পড়লি কেন?'

'অ্যাঁ, আমি অসভ্য?' গুন্ডা চোখ পাকাল, 'অসভ্য তো তুই। তোকে নেমন্তন্ন করেছি আজ যে, তুই এসেছিস?'

আর্য গলা তুলে বলল, 'বেশ করেছি এসেছি। তুই যে বিনা নেমন্তন্নে সব জায়গায় ঢুকে পড়িস! তখন মনে থাকে না? দেখ, তোর বাড়িতে অমনভাবে কেউ এলে কেমন লাগে।'

গুন্ডা বলল, 'তাও তো খালি হাতে এসেছিস! আর এটা আমার বাড়ি, আমি যেখানে খুশি বসব। ইচ্ছে হলে দিঘির কোলে বসব।'

আর্য উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তবে রে মোটা। মেরে তোর হাড় ভেঙে দেব।'

'হাড়?' খিকখিক করে হাসল রূপ, 'অমন চর্বি পেরিয়ে অত অবধি পৌঁছতে পারবি?'

রাহি দেখল, এত সবের মাঝে থেকেও দিঘি কেমন যেন অন্যমনস্ক। কেমন যেন চুপচাপ। মেয়েটা কি কোনও কষ্টে আছে? রাহি এমন মুখ চেনে।

দিঘি উঠে গিয়ে এবার টমটমের পাশের শোকেসটায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। আলতো গলায় বলল, 'টমটম একটা গান কর তো। এই পরিবেশটাকে একটু ঠিক কর।'

'ঠিক কর মানে?' গুন্ডা তেরিয়া হয়ে উঠল, 'আর্য দেখ, তোর দিঘি কী বলছে! শালা, আমরা কী...'

'আঃ,' এবার হোমি ধমক দিল, 'গুন্ডা, এত এক্সাইটেড কেন তুই? তখন থেকে আন-সান বকে যাচ্ছিস! চুপ করে বোস। একদম লাফাবি না।'

গুন্ডা কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

হোমি এবার টমটমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী রে গা। গান গা। দিঘি তো ঠিকই বলেছে। গিটার নিয়ে সঙের মতো বসে না থেকে একটা গান শোনা।'

টমটম গিটারটাকে ধরে চোখ বন্ধ করে বসল কিছুক্ষণ। তারপর গিটার স্ট্রাম করে ধরল,

'Tis true the rain that has no end
It's hard to find a faithful friend
And when you find one just and true
He's dropped the old one for the new

Bring back my blue eyed boy to me
Bring back my blue eyed boy to me
Bring back my blue eyed boy to me
That I may ever happy be...'

রাহি শুনল টমটম গানের শেষে 'Bring back my blue eyed boy to me' লাইনটা আরও কয়েকবার গাইল। ও দেখল, আর্য উঠে গিয়ে দাঁড়াল দিঘির সামনে। তারপর আলতো হাত ধরে টানল নাচের জন্য। কিন্তু দিঘি আচমকা এক ঝটকায় সরিয়ে দিল আর্যর হাত। আর্য অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল দিঘির দিকে। আর গুন্ডা সেই দেখে শব্দ করে হেসে বলল, 'কী রে আর্য, খেলি তো ঝাড়। দিঘির মনে হচ্ছে সেই ব্লু আইড বয়টিকে মনে পড়ছে। কী রে দিঘি, তাই তো?'

রাহি দেখল গুন্ডা হাসছে। স্নেহা আর জয় হাসছে। আর্য দাঁড়িয়ে আছে থতমত খেয়ে। রাহি দেখল দিঘির মুখে ঘন হচ্ছে মেঘ। যিশুর জন্মদিনে মনখারাপের একটা মেঘ যেন পাক খাচ্ছে শহরে। কোথাও কিছু নেই, তবু যেন মনখারাপ তার খয়েরি ডানাটায় ঢেকে ফেলছে মানুষকে। আর নীল চোখের তাকে হঠাৎ খুব মনে পড়ছে রাহির। খুব মনে পড়ছে। আচ্ছা, দিঘি গানটা শুনে এমন হয়ে গেল কেন? ও-ও কি কোনও নীল চোখের মানুষকে চেনে? ওরও কি কোনও নীল চোখের মানুষের জন্য মনখারাপ করে? হাজার হাজার বছর আগে বেথলেহেমের মাথায় যে-নীল রঙের তারাটি এসে স্থির হয়ে গিয়েছিল, এতদিন পরে এই যাদবপুরের ছোট্ট পাড়ার মাথায় সে কি ফিরে এল আবার? গান কি তাকে ফিরিয়ে আনল নতুন করে? নাকি সে ছিলই সারাজীবন? সমস্ত ভালবাসার মানুষদের মাথার ওপর সে জ্বলেই ছিল আজীবনকাল! শুধু আজ তাকে দেখা গেল স্পষ্ট করে!

রাহি দেখল দূরে ঝুলনের মতো সাজানো পুতুলদের মাঝে মেরির কোল আলো করে হাসছেন যিশু। যেন বলছেন, ভালবাসার দিন শুরু হল।

১১

চাপাডালির মোড়টায় আজ ভীষণ একটা জট লেগে আছে। বাস, সাইকেল, ভ্যান, রিকশা, অটো আর গাড়ির গিঁটের মধ্যে যেন আটকে আছে সন্ধেটা। ধোঁয়ায় রীতিমতো গলা-বুক জ্বলছে কিগানের। আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে! শশীবাবুর যদি কোনও একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকে!

গৌর ওকে নামিয়ে দিয়েছে এখানে প্রায় কুড়ি মিনিট আগে। শশীবাবু তখন বলেছিল যে, দশ মিনিটের ভেতরে আসছে। কিন্তু তার এখনও পাত্তা নেই। শশীবাবুর দশ মিনিট কত মিনিটে হয়?

সামনের চায়ের দোকানটা বন্ধ। এর বাইরে একটা ভাঙাচোরা সিমেন্টের বেদির মতো আছে। কাঁধের ছোট ব্যাগটা তার ওপর রেখে বসল কিগান। এমন ভোগাবে জানলে বাস ধরে বেরিয়ে যেত ও। অপেক্ষা করতে ভাল লাগছে না কিগানের। শরীরে একটা কষ্ট হচ্ছে। কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে ওর। মনে হচ্ছে যেন কয়েক লক্ষ বছর ঘুমোয়নি। আসলে তা কিন্তু নয়। মাত্র গতকাল রাতটা ঘুমোয়নি কিগান আর তাতেই মনে হচ্ছে যেন যুগ-যুগ ধরে জেগে রয়েছে ও।

কলকাতা, বহু মাস পরের কলকাতা ওকে নিশ্চিন্তে রাত কাটাতে দেয়নি। কেন জানে না কিগান, কিন্তু গতকাল সারাটা রাত ও এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়েছিল। তারপর শেষ রাতের দিকে ও গেস্ট হাউসের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল একা একা। অবিকল সেই কলকাতা ছেড়ে চাপাডাঙায় চলে আসার আগের রাতের মতো।

হেড অফিস থেকে প্রেসিডেন্ট সাহেব এসেছেন কলকাতায়। দু'দিনের টুর। যাকে বলে ঝটিকা সফর। শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন আর বীরভূমের দিকে জমিও দেখতে এসেছেন। ফ্যাক্টরি বানাতে চান।

গত পরশু সন্ধেবেলা গৌরের ফোন পেয়ে চমকে উঠেছিল কিগান। না, গৌর ফোন করে, কিন্তু এমনভাবে কলকাতায় ডেকে পাঠায় না।

কিগান অবাক গলায় বলেছিল, 'স্যার, আমায় কলকাতায় যেতে হবে?'

'কিঁউ, ও কেয়া চান্দ পে হ্যায়?' স্বভাবসিদ্ধ হালকা গলায় বলেছিল গৌর। তারপর যোগ করেছিল, 'জাস্ট একদিনের জন্য আসতে হবে তোকে। প্রেসিডেন্ট বুড্ঢা তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়। আই টোল্ড হিম অ্যাবাউট ইওর গুড জব। আর বলেছি যে, চাপাডাঙায় তোর ভালই রাজ চলে।'

'রাজ চলে?' অবাক গলায় জানতে চেয়েছিল কিগান, 'স্যার, রাজ চলে মানে?'

'মানে তুই ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারিস।'

'স্যার, কী বলছেন?' কিগানের অস্বস্তি হচ্ছিল খুব। কী বলছে গৌর? আর এমন বলছেই বা কেন?

'স্যার, আমি কি একদিনেই ফিরতে পারব?'

'না, ইউ হ্যাভ টু স্টে ফর দ্য ডে। রাতে তোর সঙ্গে মিট করবেন প্রেসিডেন্ট। তু ফিকর না করিও। পূর্ণদাস রোডে আমাদের গেস্ট হাউস আছে। সেখানে রাত কাটাতে পারিস। তবে তোর নিজের বাড়িও তো আছে।'

'না স্যার, পূর্ণদাস রোড উইল বি ফাইন।'

গৌর দু'-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেছিল, 'যেমন তোর ইচ্ছে। তবে কাল দেখা হচ্ছে। কেমন?'

ফোনটা রেখে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল কিগান। গেস্ট হাউসে থাকতে চায় বলায় গৌর হঠাৎ যেমন চুপ করে গিয়েছিল, তাতে তো ভয়ই পেয়েছিল। আসলে গৌর মানুষটা অন্যরকম। হঠাৎ হঠাৎ পার্সোনাল হয়ে যায়। আর একটু হলেই বাড়ি নিয়ে প্রশ্ন করে ফেলছিল আর কী!

বাড়ি! কথাটা চিন্তা করেই মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিগানের। প্রায় সারাটা জীবন যেখানে কাটাল সেখান থেকে এমনভাবে চলে আসতে হল ওকে? আর এমন একটা বদনাম মাথায় নিয়ে? দিঘি তো সব জানত, তবু একবারও কিচ্ছু বলল না?

দিঘি! কত বছরের ছোট ওর চেয়ে? পনেরো বছরের। দিঘি নিজেই বলেছিল। দিনটা এখনও মনে আছে কিগানের। দোল ছিল সেদিন। নিজের ঘরে বসে কবিতা পড়ছিল কিগান। মনখারাপ করা এক কবির লেখা। আর এতটাই মন দিয়ে পড়ছিল যে, রাস্তার আওয়াজ, হইহুল্লোড়, কিছুই কানে ঢুকছিল না। আর তাই হয়তো ওই আলতো পায়ের শব্দটাও শুনতে পায়নি।

'তোমায় একটু আবির দেব?' দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা শুনে মাথা তুলেছিল কিগান। ও একটু চমকে উঠে তাকিয়েছিল পিছন দিকে। দেখেছিল হাতে একটা ছোট প্লাস্টিক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দিঘি। পরনে কুর্তি আর প্যান্ট। গোটাটাই নানা রঙে রাঙানো। গালে আবির। হলুদ রঙের। আর তাতে যেন একদম অন্যরকম লাগছিল ওকে। সেই প্রথম ভাল করে দিঘিকে লক্ষ করেছিল কিগান। কেন করেছিল আজও জানে না।

কিগান চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিছু বলছ?'

দিঘি গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'জিজ্ঞেস করছিলাম রোবটরা কি দোল খেলে?'

'রোবটরা?' থতমত খেয়ে গিয়েছিল কিগান, 'অ্যাঁ? রোবটরা? মানে?'

'মানে, আমি কি তোমায় আবির দিতে পারি?'

'আমায়?' খুব কঠিন এক প্রশ্ন যেন। কিগান কী বলবে বুঝতে না পেরে তাকিয়েছিল ওর দিকে।

দিঘি ঠোঁট বেঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে বলেছিল, 'কী হল? দুটো প্রশ্ন করলাম, একটাও তো উত্তর দিলে না?'

কিগান যেন অন্য একটা দিঘিকে দেখছিল। গত সপ্তাহেও তো দেখেছিল, কিন্তু এমন তো লাগেনি। এই দিঘি যেন হঠাৎ হল মস্ত বড়! ও বলেছিল, 'আমায় তুমি রোবট বলছ?'

'তা নয় তো কী? দুর্গাপুজোয় দেখলাম, পুজো শুরুর আগে কাজ করলে, কিন্তু পুজোয় পাত্তা পাওয়া গেল না। কালীপুজোয় বারান্দায় পর্যন্ত এলে না! সরস্বতী পুজোতেও একই সিন! আর আজ দোল, সেখানে কিনা ঘরে বসে বই পড়ছ? রোবট হয়ে বাঁচতে ভাল লাগে?'

'রোবট?' হেসেছিল কিগান, 'না, রোবট কেন? আমার একা থাকতে ভাল লাগে খুব।'

'একা থাকতে ভাল লাগে?' দিঘি যেন প্রথম শুনছে এমন কথা। ও ঠোঁট কামড়ে তাকিয়েছিল কিগানের দিকে। তারপর বলেছিল, 'এটা তো একটা সাংঘাতিক সাইকোলজিকাল ডিসঅর্ডার।'

'তাই?' কিগান অবাক হয়েছিল, 'তুমি জানো কী ডিসঅর্ডার?'

দিঘি বলেছিল, 'তা জানি না। তবে হবে কিছু একটা জটিল রকমের, কমপ্লেক্স ডিসঅর্ডার ফর আ কমপ্লেক্স ম্যান।'

কিগান হেসে বলেছিল, 'দাও, রং দাও। তবে অল্প একটু। আমার রং-টং ভাল লাগে না।'

'তোমার গার্লফ্রেন্ড তোমায় কিছু বলে না?' আচমকা প্রশ্ন করেছিল দিঘি।

'গার্লফ্রেন্ড!' দিঘির মুখে এই প্রসঙ্গ শুনে আচমকা ধাক্কা খেয়েছিল কিগান, 'কীসব বলছ তুমি?'

'কেন? কীসব বলছি মানে?' দিঘি স্থিরভাবে চোখ রেখেছিল কিগানের চোখে।

'না, মানে...' কিগান চুপ করে গিয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিল, 'এসব ঠিক জিজ্ঞেস করতে নেই। তাছাড়া তুমি এখন অনেক ছোট।'

'ছোট! হ্যালো,' দিঘি ঠোঁট কামড়ে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল কিগানের দিকে, 'আমায় দেখে তোমার ছোট মনে হয়? আয়াম সিক্সটিন। আগেকার দিনে এই বয়সে মেয়েরা মা হয়ে যেত।'

কিগান ভীষণ বিব্রত হয়ে তাকিয়েছিল দিঘির দিকে। ও জানত যে, দিঘি চটপটে, কথাবার্তাতেও ভাল। কিন্তু ওর ভেতরে যে এমন একটা মেয়ে লুকিয়ে আছে সেটা বুঝতে পারেনি কিগান।

দিঘি আবার বলেছিল, 'তা, বললে না তো? তোমার গার্লফ্রেন্ড কিছু বলে না?'

কিগান সামান্য হেসে ওর চেয়ারে বসে পড়েছিল, 'না, বলে না।'

দিঘি ভুরুটা সামান্য কুঁচকে আবার সোজা করে নিয়েছিল। তারপর খুব সাধারণ গলায় বলেছিল, 'কেন? হ্যান্ডসাম বয়ফ্রেন্ডকে কিছু বলতে কষ্ট হয়?'

'না, কষ্ট হয় না।' কিগান ক্লান্তভাবে হেসেছিল সামান্য।

'তাহলে?' দিঘি যেন হঠাৎ অধৈর্য হয়ে উঠেছিল।

'কী তাহলে?' কিগান হাসছিল। টেবিলের পেপার ওয়েটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল একা একা।

'তুমি বলবে না?' দিঘির অধৈর্য গলাটা অভিমানের দিকে ঝাঁক নিচ্ছিল ক্রমশ।

'তুমি আমার চেয়ে অনেক অনেক ছোট দিঘি।'

'ও, কাম অন।' দিঘি এগিয়ে গিয়েছিল কিগানের দিকে, 'জাস্ট ফিফটিন ইয়ারস, এটা কোনও পার্থক্য হল!'

'পনেরো বছর অনেক সময়। আর আমি তো বুড়ো।' কিগান বইটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বলেছিল, 'এসব বাদ দাও দিঘি। মনে হচ্ছে দোল খেলতে তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

দিঘি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কিগানের দিকে, তারপর আচমকা প্রায় লাফিয়ে পড়ে হাতের মুঠোর আবির মাখিয়ে দিয়েছিল কিগানের চুলে, কপালে আর গালে।

কিগান আচমকা এমন ঘটনায় হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে চেয়ারসুদ্ধ উল্টে পড়েছিল মাটিতে। দিঘিও টাল সামলাতে না পেরে কিগানের বুকের ওপর পড়ে গিয়েছিল।

শব্দটা ভালই হয়েছিল। দূর থেকে আস্তে হলেও ঠাকুরমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল কিগান। শব্দ শুনে ঠাকুরমা আসছে! আর ও এমনভাবে পড়ে আছে মেঝেতে? প্রায় লাফিয়ে মেঝে থেকে উঠে পড়েছিল কিগান। দিঘিও নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে পড়েছিল।

ঠাকুরমা এসে একটু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল দরজায়, 'এ কী রে? এমন রং মেখে রয়েছিস যে! আর চেয়ারটা উল্টে গেল কী করে?'

কিগান আমতা আমতা করছে দেখে দিঘি চটপট বলেছিল, 'আরে, তোমার নাতি এত ভিতু। দেখো না, রং দেব বলে পালাতে গিয়ে চেয়ার নিয়ে পড়েছে। তবে আমি ছাড়িনি। তাও ভূত করে দিয়েছি একেবারে। হুঁ, খুব সাহেবিপনা দেখায়। ঠিক করিনি ঠাকুরমা? তুমি বলো, এমন হুঁকোমুখো হয়ে কেউ থাকে?'

ঠাকুরমা হেসে বলেছিলেন, 'ঠিক করেছিস। ও এমন বুড়োটে হয়ে থাকে না এই বয়সে!'

কিগান অপ্রস্তুত মুখ করে বলেছিল, 'আমি তো বুড়োই। দিঘির তুলনায় আমি যথেষ্ট বুড়ো। আমার এসব ভাল লাগে না।'

ঠাকুরমা দিঘির হাত ধরে টেনে বলেছিল, 'চল তো। ওকে অমন করে একাই থাকতে দে। তুই আমার সঙ্গে চল। আজ ভোগ দিয়েছি। বাড়িতে নিয়ে যাবি।'

দিঘি ঠাকুরমার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও একটু পরে আবার দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকেছিল। তারপর টেবিলের ওপর রাখা আবিরের প্যাকেটটা দেখিয়ে বলেছিল, 'এটা ফেলে গিয়েছিলাম। আর বাই দ্য ওয়ে,' দিঘি গলাটাকে হঠাৎ নামিয়ে বলেছিল, 'তোমার আফটার শেভটা দারুণ। একদিন দেখো, এটাকে আমি...'

জীবনে যা কিছু অর্ধেক হয়, অসমাপ্ত হয়, তার ভেতরেই নানা রকম সম্ভাবনা আর আশঙ্কা লুকিয়ে থাকে। দিঘির চলে যাওয়াটুকুর ভেতরে আশঙ্কাটাই দেখতে পেয়েছিল কিগান। আর অবাকও লেগেছিল। মেয়েটার হলটা কী? দিব্যি আসত পড়া দেখিয়ে নিতে। টুকটাক গল্পও করত। কিন্তু এ তো অন্যরকম হয়ে গেল পুরো! কিগানের মাথার ভেতর কেমন যেন জট লেগে যাচ্ছিল সব। বুকে কষ্ট হচ্ছিল। এমনিতেই নানা চিন্তা ঘিরে থাকে, তারপর আরও নতুন ঝামেলা হওয়ার আশঙ্কায় মুখটা বিস্বাদ লাগছিল।

সত্যিই কি শুধু বিস্বাদ লেগেছিল কিগানের? অমন ঘন বাদামি চুল থেকে ভেসে আসা গন্ধ। নরম স্পর্শ। মনোযোগ। শুধু কি আশঙ্কাই জাগিয়েছিল ওর বুকে? ভাললাগা কি জাগায়নি এতটুকুও?